# বাংলা

ভাষা • সাহিত্য • সমাজ • সংস্কৃতি

প্রথম সংখ্যা : ২০০৫-২০০৬

বাংলা বিভাগ

বিদ্যাভবন । বিশ্বভারতী । শান্তিনিকেতন

প্রথম সংখ্যা

২০০৫-২০০৬

পুষ্পিত পলাশ। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

সৌজন্য। চিত্রপরিস্ফুটন : শান্তশংকর দাশগুপ্ত

## ভাষা • সাহিত্য • সমাজ • সংস্কৃতি

প্রথম সংখ্যা : ২০০৫-২০০৬

বাংলা বিভাগ

বিদ্যাভবন । বিশ্বভারতী । শান্তিনিকেতন

বাংলা ২০০৫-০৬



প্রকাশ : ১৪১৩ বৈশাখ ২৫

প্রচ্ছদলিপি বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় -কৃত নামাক্ষর অবলম্বনে।

সম্পাদক
আলপনা রায়
প্রধান, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী

সহযোগী
সুদীপ বসু সুমিতা ভট্টাচার্য
অমল পাল অভ্র বসু

পঁচাত্তর টাকা

সুনীলকুমার সরকার, কর্মসচিব বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন কর্তৃক প্রকাশিত ও লেজার ইম্প্রেশন্‌স্‌, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৪ হইতে মুদ্রিত।

# সূচি

## চিত্রসূচি



## পাণ্ডুলিপিচিত্র

আচার্য
ডাঃ মনমোহন সিংহ
ACHARYA
DR. MANMOHAN SINGH
উপাচার্য
সুজিত কুমার বসু
UPACHARYA
SUJIT KUMAR BASU

# বিশ্বভারতী
# VISVA-BHARATI

সংস্থাপক
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
FOUNDED BY
RABINDRANATH TAGORE

শান্তিনিকেতন - 731 235
SANTINIKETAN - 731 235
পশ্চিম বঙ্গাল, ভারত
WEST BENGAL, INDIA
টেলীফোন/Telephone : (03463) 262-751 (6 lines)
ফ্যাক্স/Fax: 91-03463 262-672/261-156
E. MAIL : root @ vbharat.ernet.in

সং./No ভিসি/এম.৯

দিনাঙ্ক/Dated ০৭/০৪/০৬

## শুভেচ্ছাবার্তা

বিশ্বভারতী বাংলা বিভাগ তাঁদের পত্রিকার নাম দিয়েছেন 'বাংলা'। ছোটো একটি নাম, কিন্তু তার মধ্যে ধরা আছে যেন বিপুল এক বিশ্ব। হাজার বছরেরও বেশি তার চলা ইতিহাসের পথে, সমুদ্রতট থেকে শৈলশিখর পর্যন্ত তার ভৌগোলিক বিস্তার। বিভিন্ন ধর্মের সমবায়ে তৈরি তার সমাজ, রাজসভা থেকে ধর্মসভা, স্থলে জলে বনতলে তার সৃষ্টির আয়োজন। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নিরন্তর আদানপ্রদানে বোনা তার জীবন। সেই চলার ছন্দ থেকে উঠে আসে তার ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি। 'বাংলা' ধরতে চাইবে সেই সমগ্রতাকে।

আমি বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগের এই উদ্‌যোগকে স্বাগত শুভেচ্ছা জানাই।
ইতি ৭ এপ্রিল ২০০৬

(সুজিতকুমার বসু)

# আভাষ

বিশ্বভারতী বাংলা বিভাগের উদ্‌যোগে প্রকাশিত হচ্ছে ভাষা সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতির এই বার্ষিকপত্র। এর নাম দেওয়া হয়েছে *বাংলা*। বিশ্বের সঙ্গে যত যোগসূত্রে বাংলার বিহার, চিত্তাবিশ্বের যত অনুরণন জাগে বাংলার অণুবিশ্বে— তার ভাষায়-সমাজে, সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে, তার জীবনাদর্শ আর জীবনযাপনে— আমাদের সাধ্যমতো তারই প্রতিফলন হয়ে উঠবে *বাংলা*, এই আকাঙ্ক্ষা। এ-সাময়িকপত্র তাই সংকীর্ণ অর্থে বিভাগেরই নয়, অথচ এর কেন্দ্রে আছে বিভাগ : তারই সূত্রে *বাংলা*-য় ঐতিহ্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখি আমরা। ভবিষ্যতে সে-স্বপ্ন সত্য হবে কি না এই সূচনাদিন তার বিচারের সময় নয়, তবে এই মুহূর্তে সেই স্বপ্নসন্ধানের সাহস আমাদের সত্যসম্বল।

সম্ভবত সেই কারণেই, বিভাগের অধ্যাপক-অধ্যাপিকারাই নন শুধু, এ-সময়ের বহুমান্য গুণীরাও আমাদের উৎসাহিত করেছেন লেখা দিয়ে। আর্থিক দায়িত্ব নিয়ে আনুকূল্য করেছেন বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। বলতে ভালো লাগছে, এই সংখ্যা প্রকাশের সবরকম অনুপুঙ্খের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছেন বিভাগের প্রাক্তনী, পাঠভবনের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ দাস। এর বিন্যাস-সৌষ্ঠবের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তাঁর। এ-বিষয়ে তাঁর নিত্যসহযোগী ছিলেন বিভাগের তরুণ অধ্যাপক ড. অমল পাল। বিভাগের প্রতি আনুগত্যেই তাঁদের এই প্রেমের পরিশ্রম; তাহলেও সম্পাদকের সপ্রীতি কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁদের। নমস্কার জানাই বিশ্বভারতীর উপাচার্য শ্রীসুজিতকুমার বসুকে, ভাবুক লেখকদের ও শুভার্থী বিজ্ঞাপনদাতাদের।

*বাংলা*-র বর্তমান সংখ্যাটির বিষয়কেন্দ্র রবীন্দ্রনাথ। এ-সিদ্ধান্ত বিভাগের। তাঁকে ছুঁয়েই আমাদের পথ চলার শুরু, পথের শেষেও তিনি। সেই পথের সাথী, পান্থজনের সখাকে প্রণতি জানিয়েই আমাদের যাত্রা আরম্ভ।

আলপনা রায়
সম্পাদক

# ‘রাজর্ষিদের যাত্রা’ থেকে ‘তীর্থযাত্রী’ : রূপান্তরের পূর্ব-ইতিহাস

## Journey of the Magi
## (Thomas Stearns Eliot)

বিষ্ণু দে-কৃত প্রথম অনুবাদ

শীতরুক্ষ্ম যাত্রা আমাদের,
দূরদেশে। অত দীর্ঘ ভ্রমণের
একেবারে নয়কো সময় তা।
পথ অতি বন্ধুর দুর্গম, বায়ু ক্ষুরধার
খর তীব্র শীত।
উট্‌গুলি হয়রান ক্ষতপদ বিরক্ত বিমুখ
দ্রবমান তুষারে শয়ান।
তার উপরে হয়েছি পীড়িত
সানুতে নিদাঘকেলিমন্দির ও অলিন্দ দেখে
রেশ্‌মী যুবতী যারা সরবৎ বয়ে আনে দেখে।
তার উপরে উট্‌ওয়ালারা গাল দেয়,
গুম্‌রে’ গুম্‌রে’ ওঠে রাগে
কোথা যে পালিয়ে’ যায় মদ আর স্ত্রীলোকের অভাবে
উদ্দাম;
মশালের আলো নিভে’ যায়, মাথা রাখবার ঠাঁই
জোটে নাকো আর।
পথে যত নগরে বৈরিতা, পথে যত শহরে সন্দেহ,
আর যত গ্রাম ছিল জঘন্য নোংরা, অসম্ভব বেশি হাঁকে
সামান্যের দাম।

যাত্রা হল রুক্ষ্ম নিদারুণ।
অবশেষে করলাম স্থির
রাত্রেও চল্‌ব আমরা
মাঝে মাঝে একটু ঘুমিয়ে’—
দিব্যবাণী বাজবে যখন
কাণে কাণে [য] এই কথা বলে’—
এ যে সব মোহ ওরে, অজ্ঞান এ সবই।
তারপরে প্রভাতে আমরা
ঈষদুষ্ণ উপত্যকায় এক পড়লুম এসে
তুষার-রেখার নিচে, ভিজা হাওয়া আবাদের গন্ধ
রয়ে’ যায়,

রবীন্দ্রনাথ-কৃত প্রথম পরিমার্জনা

শীতরুক্ষ্ম আমাদের যাত্রা, ভ্রমণ দূরদেশের দিকে।
অত দীর্ঘ ভ্রমণের
সময় ত নয় একেবারেই।
পথ বন্ধুর দুর্গম, বাতাস ক্ষুরের মত শান দেওয়া,
কন্‌কনে শীত।
উট্‌গুলি হয়রান ক্ষত পদ বিরক্ত বিমুখ
গলে-পড়া বরফে শুয়ে শুয়ে পড়ে।
তার উপরে মনটা পীড়িত হচ্চে যতই দেখচি
পাহাড়তলীর আরামঘর আর চাতালগুলো,
আর রেশমী কাপড়পড়া যুবতী যত পেয়ালা হাতে।
তার উপরে উট্‌ওয়ালারা গাল দেয়,
গুম্‌রে’ গুম্‌রে’ ওঠে রাগে
কোথা যে পালিয়ে’ যায় মদ আর নারীর অভাবে
ক্ষেপে উঠে।
মশালের আলো নিভে’ যায়, মাথা রাখবার ঠাঁই
জোটে না।
যত চলি, নগরে নগরে বৈরিতা, পথে পথে সন্দেহ,
গ্রামগুলো জঘন্য নোংরা, তুচ্ছ জিনিষের দাম হাঁকে
অসম্ভব।

যাত্রা হল রুক্ষ্ম নিদারুণ।
অবশেষে স্থির হোলো
রাত্রেও চল্‌তে হবে
মাঝে মাঝে একটু ঘুমিয়ে’—
এই দিব্যবাণী বাজবে তখন
কানে কানে
এ সব মিথ্যা ওরে, এ সবই মোহ।
তারপরে প্রভাতে আমরা
পাহাড়ের এক খদে এলুম, সেখানে শীত কম,
সেটা বরফ সীমার নিচে, ভিজা হাওয়া আবাদের
গন্ধ বয়ে’ আনে,

বিষ্ণু দে-কৃত প্রথম অনুবাদ

খরস্রোত তটিনী জলযন্ত্র চক্রে এক অন্ধকারকে করে
করাঘাত;
দেখি আছে দাঁড়িয়ে তিনটী গাছ, স্থির অনুচ্চ আকাশে *
আর এক বৃদ্ধ শ্বেত অশ্ব দেখি ছুটে গেল মাঠে।
তারপরে
পৌঁছিলাম আমরা এক সরাইখানায়
দ্রাক্ষালতা সমাচ্ছন্ন দ্বারদারু তার
দ্বারে দেখি ছয় হাত পাশা খেলে রৌপ্যলোভাতুর

পায়ে ঠেলে' ঠেলে' ফেলে' দেয় শূন্য মদের মশক।
সেখানে পেলাম নাতো কোনো কিছু সংবাদ, আমাদের
যাত্রা হল পুনর্বার সুরু।
সন্ধ্যায় এলাম শেষে—
যা খুঁজে' খুঁজে' পাই নি আমরা
সেই লগ্নসময়ের মুহূর্ত্তেকও [য] আগে।
অবশেষে— (বল্‌তে চাও ত বলো)
পরিতৃপ্তি পেলাম।

এসব ঘটেছে বহু দীর্ঘকাল আগে— পড়ে মনে পড়ে
আবার ঘটুক্ এই আমি তাই চাই— কিন্তু লিখে' রাখো
এই রাখো লিখে'
এই দীর্ঘ যাত্রা আমাদের
সে হল কিসের জন্য
জন্মের সে কি অথবা মৃত্যুর?
জন্ম হয়েছিল এক, সুনিশ্চিত জানি
প্রমাণ পেয়েছি তার, সে বিষয়ে সন্দেহও নেই।
বহু জন্ম বহু মৃত্যু দেখেছি ত, আমি জানতাম
জন্ম আর মৃত্যু নয় এক, তবু এই জন্ম এল
নিদারুণ নিষ্ঠুর ক্লেশে আমাদের
এল সে যে মৃত্যুর, আমাদের মৃত্যুর মতন।
আমরা এলাম ফিরে নিজেদের দেশে দেশে,
রাজত্বে মোদের।
ফিরে' ত এলাম— কিন্তু স্বস্তি আর পাই নাকো
পুরাতন ব্যবস্থা বিধানে
অনাত্মীয় জনগণ আছে তারা আঁকড়ে' তাদের
দেবদেবী যত।
পরিতৃপ্ত হব যদি মৃত্যু সেই আসে পুনরায়।

রবীন্দ্রনাথ-কৃত প্রথম পরিমার্জনা

খরস্রোত নদী জলযন্ত্রের চাকায় আঁধারকে মারে
চাপড়,
দেখি আছে স্থির দাঁড়িয়ে তিনটী বেঁটে গাছ,
আর এক বুড়ো সাদা ঘোড়া ছুটে চলে যায় মাঠে।
তারপরে
পৌঁছিলাম এক সরাইখানায়
আঙুরলতায় জড়ানো তার কপাট।
দ্বারে দেখি ছ জন খেলোয়াড় পাশা খেলে টাকার
লোভে।
পায়ে ঠেলে' ঠেলে' ফেলে দেয় শূন্য মদের কুপো।
সেখানে পেলাম নাতো কোনো খবরই,
যাত্রা হল আবার সুরু।
সন্ধ্যায় এলাম শেষে—
যা খুঁজে' খুঁজে' পাই নি
লগ্নসময়ের মুহূর্ত্তেক আগেও।
অবশেষে— (বল্‌তে চাও ত বলো)
পরিতৃপ্তি পেলাম।

এসব ঘটেছে বহু দীর্ঘকাল আগে— মনে পড়ে
আবার ঘটুক্ এই চাই— কিন্তু লিখে' রাখো
এই রাখো লিখে'
এই দীর্ঘ যাত্রা আমাদের
সে হল কিসের জন্য
জন্মের জন্যে না মৃত্যুর?
একটা জন্ম হয়েছিল, সুনিশ্চিত জানি
প্রমাণ পেয়েছি তার, সে বিষয়ে সন্দেহও নেই।
বহু জন্ম বহু মৃত্যু দেখেছি ত, আমি জানতাম
জন্ম আর মৃত্যু নয় এক, তবু এই জন্ম এল
নিদারুণ নিষ্ঠুর ক্লেশে
এল সে যে মৃত্যুর মতন, আমাদের মৃত্যুর মতন।
আমরা এলাম ফিরে' যে যার নিজের দেশে
আমাদের আপন রাজত্বে।
ফিরে' ত এলাম— কিন্তু স্বস্তি আর পাই নাকো
পুরাতন ব্যবস্থা বিধানে
অনাত্মীয় জনগণ আছে তারা আঁকড়ে' তাদের
দেবদেবী যত।
পরিতৃপ্ত হতে পারি যদি সেই মৃত্যু আসে আবার।

* ভিন্ন পাঠ : তিনটী গাছ দেখি দাঁড়িয়ে আছে অনুচ্চ আকাশে।

রবীন্দ্রনাথ-কৃত দ্বিতীয় পরিমার্জনা

শ্রীবিষ্ণু দে
১০৯ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা

তোমার লেখাটা পদ্যে গদ্যে জড়িয়ে দুইয়ের বার হয়ে পড়েছিল, তাই সংশোধনের মুখে পদ্যের আবেশটাকে ঠেলা দিয়া কাটিয়ে দিয়েছি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শীতরুক্ষ্ম আমাদের যাত্রা,
ভ্রমণ দূর দেশের দিকে।
অত দীর্ঘ ভ্রমণের সময় এ তো নয় একেবারেই।
পথ দুর্গম, বাতাস ক্ষুরের মতো শান দেওয়া
কনকনে শীত।
উটগুলো হয়রান, পায়ে ক্ষত, বিরক্ত বিমুখ, তারা,
গলে-পড়া বরফে শুয়ে শুয়ে পড়ে।
তার উপরে মনটা যাচ্ছে বিগ্‌ড়ে।
যতই দেখচি পাহাড়তলীর আরামঘর আর চাতালগুলো,
আর রেশমি কাপড়পরা যুবতীর দল পেয়ালা হাতে।
তার উপরে উটওয়ালারা গাল দেয়,
গুম্‌রে গুম্‌রে ওঠে, রাগে,
কোথায় পালিয়ে যায় মদ আর নারীর অভাবে
ক্ষেপে উঠে।
মশালের আলো নিভে যায়,
মাথা রাখবার ঠাঁই জোটে না।
যত চলি, নগরে নগরে কেবল বৈরিতা,
পথে পথে সন্দেহ,
গ্রামগুলো জঘন্য নোংরা,
তুচ্ছ জিনিষের দাম হাঁকে অসম্ভব।

যাত্রা হোলো রূঢ় নিদারুণ।
অবশেষে স্থির হোলো
রাত্রেও চলতে হবে
মাঝে মাঝে একটু ঘুমিয়ে,—
এই দিব্যবাণী বাজবে তখন কানে কানে
এসব মিথ্যা ওরে, এ সবই মোহ।
তার পরে প্রভাতে আমরা

পাহাড়ের এক খদে এলুম,
বরফসীমার নীচে
সেখানে শীত কম;
ভিজে হাওয়া আবাদের গন্ধ বয়ে আনে,
খরস্রোত নদী আর জলযন্ত্রের চাকা
আঁধারকে মারে চাপড়।
দেখি স্থির দাঁড়িয়ে তিনটি বেঁটে গাছ,
আর মাঠে ছুটে চলেছে এক বুড়ো সাদা ঘোড়া।
তারপরে
পৌঁছলাম এক সোরাইখানায়
আঙুরলতায় জড়ানো তার কপাট।
দ্বারে দেখি ছ'জন খেলোয়াড় পাশা খেলে টাকার
লোভে।
পায়ে ঠেলে ঠেলে ফেলে দেয় শূন্য মদের কুপো।
সেখানে পেলাম না তো কোনোই খবর,
যাত্রা হোলো আবার সুরু।
সন্ধ্যায় এলাম শেষে—
খুঁজে খুঁজে পাইনি লগ্ন সময়ের মুহূর্ত্ত আগেও।
অবশেষে— বলতে চাও তো বলো—
পরিতৃপ্তি পেলাম।

এসব ঘটেছে বহু দীর্ঘকাল আগে— মনে পড়ে।
আবার ঘটুক্ এই চাই, কিন্তু লিখে রাখো,
এই লিখে রাখো—
এই দীর্ঘ যাত্রা আমাদের
সে হোলো কিসের জন্যে?
জন্মের জন্যে, না মৃত্যুর?
একটা জন্ম হয়েছিল, সুনিশ্চিত জানি,
প্রমাণ পেয়েছি তার, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।
বহু জন্ম বহু মৃত্যু দেখেছি তো,
আমি জানতাম জন্ম আর মৃত্যু নয় এক,
তবু এই জন্ম এলো নিদারুণ কঠোর ক্লেশে,
এলো সে যে মৃত্যুর মতন, আমাদের মৃত্যুর মতন।
আমরা এলাম ফিরে যে যার নিজের দেশে,
আমাদের আপন রাজত্বে।
ফিরে তো এলাম, কিন্তু স্বস্তি আর পাইনে
পুরাতন ব্যবস্থা বিধানে।
অনাত্মীয় জনগণ আছে তারা আঁকড়ে তাদের
দেবদেবী যত।
পরিতৃপ্ত হতে পারি যদি সেই মৃত্যু আসে আবার॥
৮।১০।৩২

# প্রাসঙ্গিক তথ্য

বিষ্ণু দে T. S. Eliot-এর *Ariel Poems* কাব্যের 'Journey of the Magi' কবিতার অনুবাদ করে ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের সম্ভবত কার্তিক মাসে রবীন্দ্রনাথের কাছে পরিমার্জনার জন্য পাঠিয়েছিলেন। এর অব্যবহিত পূর্বে ১৩৩৯-এর আশ্বিন মাসে রবীন্দ্রনাথের *পুনশ্চ* কাব্যের প্রকাশ। সদ্য প্রকাশিত *পুনশ্চ*-র ছন্দ বিষ্ণু দে-র প্রধান আকর্ষণ ছিল। অনুবাদটির সঙ্গে একটি চিঠিতে বিষ্ণু দে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, ' "পুনশ্চ" পড়েই চঞ্চল হয়েছি। তা ছাড়া সাহায্যও পাচ্ছি না আপাতত আর কারো কাছে। তাই কিছুমাত্র অধিকার না পেয়েও আপনাকেই লিখ্‌ছি। কিছুকাল ধরে' আমার অনেক পদ্যই মিলহীন হয়ে যায়। সেটা নিয়মছাড়া অমিত্রাক্ষর বা মুক্তছন্দ কি যে তা জানি না ...। তারপরে সমস্যা ছিল ছন্দময় [ছন্দোময়] গদ্য—"পুনশ্চ"তে ও "লিপিকা"তে তারও মুক্তছন্দের সমাধানের আশা পাচ্ছি।... আমার পক্ষে তাই নিজের লেখা রচনায় আপনার সংশোধন ও যথাস্থানে লাইন্‌স্থাপন দেখলে সুবিধা হয়। তাই আপনাকে সাহস করে একটী কবিতার অনুবাদ পাঠাচ্ছি। ...'

বিষ্ণু দে-র সেই অনুবাদ, সেইসঙ্গে অনুবাদের উপরে রবীন্দ্রনাথ যে পরিমার্জনা করেছিলেন, এখানে সে দুটিকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে পরপর দেখানো হল। এর পাশাপাশি পাণ্ডুলিপিচিত্র থাকায়, আশা করা যেতে পারে, পাঠকদের সুবিধা হবে। ইতিপূর্বে বিভিন্ন স্থলে বিষ্ণু দে-র যে অনুবাদটি প্রথম বলে চিহ্নিত হয়েছিল, বস্তুত সেটি দ্বিতীয় পরিমার্জিত পাঠ। অবশ্য এ-নিয়ে পূর্বেই সংশয় দেখা দিয়েছিল। আগ্রহী পাঠকবর্গ 'প্রাসঙ্গিক তথ্য'-এর শেষে উল্লিখিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলি দেখলে উপকৃত হবেন। প্রথম পরিমার্জিত কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তীকে, অনুমান করা যায়, তাঁর মতামত নেওয়ার জন্য দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় যে পরিমার্জনা করেন তারও একটি প্রতিলিপি অমিয় চক্রবর্তীর কাছে রক্ষিত ছিল। ওই প্রতিলিপির একটি জায়গায় সামান্য একটি প্রভেদ ছাড়া বাকি সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথ-কৃত পরিমার্জনার অনুরূপ। এ-ছাড়া অমিয় চক্রবর্তীর প্রতিলিপিতে, প্রথম পৃষ্ঠার বাঁ দিকে 'Journey of The Magi'-এর স্থলে Return of The Magi— এইরকম লেখা দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পরিমার্জনাটি (তারিখ ৮/১০/৩২) পরম্পরা অনুযায়ী এরপরই বিন্যস্ত হল।

৭ কার্তিক ১৩৩৯, রবীন্দ্রনাথ বিষ্ণু দে-র অনুবাদ ও তাঁর সংস্কার প্রসঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে যা জানিয়েছিলেন তার অংশবিশেষ সংকলিত হল, 'ইতিমধ্যে শ্রীবিষ্ণু দে "পুনশ্চ"-এর নকলে "এলিয়ট"-এর একটা তর্জ্জমা পাঠিয়েছিল, পড়ে দেখলুম। কম্‌লি ছোড়তি নেই— গদ্যের ঘাড়ে পদ্য কামড়ে ধরেচে। ... আমাকে শোধন করতে অনুরোধ করেছিল। সে প্রক্রিয়ায় তার দেহান্তর ঘটল। পুনর্জন্মের দুঃখ আছে সে দুঃখটা আমারি লেখনী বহন করলে। কিন্তু তার পরে রূপান্তরিত লেখাটার বিষ্ণুপ্রাপ্তির পরে শ্রী বিষ্ণু কোনো উচ্যবাচ্য [উচ্চবাচ্য] করলে না। হয়তো বা পরিচয়-এ বেরবে। কার পরিচয় নিয়ে? লোকে বলবে বিষ্ণুলোক রবিলোকের সাদৃশ্যলাভ করেচে। কিম্বা আমার বন্ধুরা বলতেও পারে, হাজার চেষ্টা করুক রবিবাবুর মতো করতে পারে নি, কাছ দিয়েও যায় নি।' রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের মধ্যে শ্লেষ প্রচ্ছন্ন থাকে নি। ধূর্জটিপ্রসাদকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি, অনুমান করা যেতে পারে বিষ্ণু দে পড়েছিলেন এবং স্বাভাবিক কারণেই *পরিচয়* বা অন্য কোনো পত্রিকায় পরিমার্জিত কবিতাটি প্রকাশ করেননি। অনেক পরে, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে *সাহিত্যপত্র* পত্রিকায় 'রাজর্ষিদের যাত্রা' নামে যে অনুবাদটি প্রকাশিত হয়, সেটি বিষ্ণু দে-র স্বতন্ত্র অনুবাদই বলা যায়। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে সিগনেট থেকে প্রকাশিত তাঁর *এলিয়টের কবিতা* অনুবাদ-সংকলনে কবিতাটি গৃহীত হয়। বিষ্ণু দে *রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা* (১৯৬৬) গ্রন্থে, রবীন্দ্রনাথকে তাঁর অনুবাদটি পাঠাবার যে উদ্দেশ্যের কথা পূর্বে লিখেছিলেন, এখানে তা একটু অন্যভাবে জানিয়ে লিখেছেন, '১৯৩০-৩১ নাগাদ এলিয়ট সায়েবের 'এরিয়েল' কবিতা পুস্তিকা কলকাতায় পাওয়া গিয়েছিল। তার আট নম্বর কবিতা 'জার্নি অব দি মেজাই', ষোল নম্বর হল 'এ সঙ ফর শিমেঅন' (সিমেঅনের গান)। তারপরে "পরিচয়" পত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ বেরোল, আধুনিক কাব্য বিষয়। সেই বিরোধী প্রবন্ধে তিনি এলিয়টের প্রথম দিককার কবিতা

# রবীন্দ্রনাথের জয়দেব

## অরুণকুমার বসু

ছাত্রাবস্থায় কিংবা তদবসানকালে, মাঝে মাঝে *গীতগোবিন্দ* পড়ার ভাঁজে, দু-একটি শ্লোকে 'অলক্তক' শব্দের ব্যবহারে আমার মন চকিতে রবীন্দ্রনাথের কোনো গানের একটি চরণে আনত হতে চাইত। *গীতগোবিন্দ*-এর অষ্টম সর্গের পঞ্চম শ্লোকে প্রভাতে আগত কৃষ্ণের উদ্দেশে খণ্ডিতা রাধার এই রোষবচন :

চরণকমলগলদলক্তকসিক্তমিদং তব হৃদয়মুদারম্
দর্শয়তীব বহির্মদনদ্রুমনবকিশলয়পরিবারম্॥[১]

যে যামিনী-সহচরীর অলক্তকে কৃষ্ণের শ্যামদেহ রক্তাঙ্কিত হয়েছে, এই শ্লোকে বর্ণিত সেই গৌরচরণের আলতার রং কৃষ্ণের বুকের মতো আমার মন থেকেও মুছে যায় নি। শুকনো আলতায় অত দাগ হয় না, 'অলক্তকসিক্তমিদং' অর্থাৎ তা ভিজে ছিল। *ঠিক* আগের শ্লোকে (চতুর্থ) 'মরকতশকলকলিতকলধৌতলিপেরিব রতিজয়লেখম্' অংশের 'ধৌত' শব্দটিও অলক্তককে অনুসরণ করছিল। *গীতগোবিন্দ*-এর দশম সর্গের সপ্তম শ্লোকে আবার পড়া গেল যে, কৃষ্ণ মানিনী রাধার পা দুটি নিয়ে তার সদ্য-লিপ্ত অলক্তক নিজের বুকে মাখাতে চাইছেন :

স্থলকমলগঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনম্ জনিতরতিরঙ্গপরভাগম্।
ভণ মসৃণবাণি করবাণি চরণদ্বয়ম্ সরসলসদলক্তকরাগম্॥ [২]

এই সেই বিখ্যাত শ্লোক যার পরবর্তী চরণ, 'স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারম্।'[৩] আমার অলক্ত-আবিষ্ট শ্রুতিতে কেন জানি না বারবার বাজত 'মধু-গন্ধেভরা মৃদুস্নিগ্ধছায়া' গানের পরবৃত্ত উচ্চারণগুলো :

ফিরে  রক্ত অলক্তক-ধৌত পায়ে
ধারা  -সিক্ত বায়ে
মেঘ  -মুক্ত সহাস্য চন্দ্রকলা
সিঁথি  -প্রান্তে জ্বলে।

এই আলতা-ধোয়া জলে পা-ভিজিয়ে-চলা অভিসারিণী যেন শ্যামের কান্তিতে কান্তিময়ী জয়দেবেরই রাধা, অবশ্যই তার সঙ্গে গোবিন্দদাসের রাধা কোথাও মিশে গেছে। রবীন্দ্ররচনায় জয়দেবের উল্লেখসূচিও রবীন্দ্রপাঠকের মতো আমার অগোচর ছিল না। ক্রমশ সেগুলি বিস্তারে পাওয়া গেল পম্পা মজুমদারের *ভারতীয় সংস্কৃতির রূপ ও উৎস* (জিজ্ঞাসা, ১৯৭২) এই আকরিক খণ্ডে। তদুপরি বিষয়টি নিয়ে সরসংমনো গবেষক কল্যাণীশঙ্কর ঘটক দু-একটি বাড়তি টীকা যুক্ত করেছেন *রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য* (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮০) গ্রন্থে।

*গীতগোবিন্দ*-এর প্রবল আকর্ষণেই কি রবীন্দ্রনাথ *গীতবিতান* নামকরণ করেছিলেন? নিশ্চয় নয়। তবে *গীতলিপি গীতলেখা গীতিবীথিকা* প্রভৃতি নামের আদিতে এই গীতিবাচক শব্দের প্রতি রবীন্দ্রনাথের একটি

সহজিয়া টান ছিলই। রবীন্দ্রসাহিত্যে জয়দেবের প্রতিভাস অবশ্যই কালিদাসেতর। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতের সিঁথিপ্রান্তে 'মেঘমুক্ত সহাস্য চন্দ্রকলা'র মতো জয়দেবীয় শব্দ-ভাষা-প্রয়োগকলা মাঝে মাঝেই জ্বলজ্বল করে ওঠে। জয়দেব-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সতর্কতার একটি বৃহদংশ অবশ্যই জয়দেবের ছন্দধ্বনি, যা কাব্যের স্রোতে রবীন্দ্রনাথকে 'কোন আদিকাল হতে' ভাসিয়ে এনেছে, এ-তথ্য পূর্বোক্ত দুই গবেষকই স্বীকার করেছেন। বহুপঠিত হলেও প্রসঙ্গের দাবিতে এখন তার অনেকটাই পুনরুদ্ধার্য হবে। *জীবনস্মৃতি*-র 'পিতৃদেব' অধ্যায় দিয়ে শুরু হোক :

> একবার বাল্যকালে পিতার সঙ্গে গঙ্গায় বোটে বেড়াইবার সময় তাঁহার বইগুলির মধ্যে একখানি অতি পুরাতন ফোর্ট উইলিয়মের প্রকাশিত গীতগোবিন্দ পাইয়াছিলাম। বাংলা অক্ষরে ছাপা; ছন্দ অনুসারে তাহার পদের ভাগ ছিল না; গদ্যের মতো এক লাইনের সঙ্গে আর-এক লাইন অবিচ্ছেদে জড়িত। আমি তখন সংস্কৃত কিছুই জানিতাম না। বাংলা ভালো জানিতাম বলিয়া অনেকগুলি শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিতাম। সেই গীতগোবিন্দখানা যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না। জয়দেব যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা কিছুই বুঝি নাই, কিন্তু ছন্দে ও কথায় মিলিয়া আমার মনের মধ্যে যে জিনিসটা গাঁথা হইতেছিল তাহা আমার পক্ষে সামান্য নহে। আমার মনে আছে, 'নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তং' এই লাইনটি আমার মনে ভারি একটি সৌন্দর্যের উদ্রেক করিত— ছন্দের ঝংকারের মুখে 'নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং' এই একটিমাত্র কথাই আমার পক্ষে প্রচুর ছিল। গদ্যরীতিতে সেই বইখানি ছাপানো ছিল বলিয়া জয়দেবের বিচিত্র ছন্দকে নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার করিয়া লইতে হইত— সেইটেই আমার বড়ো আনন্দের কাজ ছিল।
>
> যেদিন আমি 'অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণং / হরিবিরহদহনবহনেন বহুদূষণং'— এই পদটি ঠিকমতো যতি রাখিয়া পড়িতে পারিলাম, সেদিন কতই খুশি হইয়াছিলাম। জয়দেব সম্পূর্ণ তো বুঝিই নাই, অসম্পূর্ণ বোঝা বলিলে যাহা বোঝায় তাহাও নহে, তবু সৌন্দর্যে আমার মন এমন ভরিয়া উঠিয়াছিল যে, আগাগোড়া সমস্ত গীতগোবিন্দ একখানি খাতায় নকল করিয়া পাইয়াছিলাম।

কবির স্বহস্তে অনুলিখিত সেই *গীতগোবিন্দ*-এর পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া যায় নি। কিন্তু অনুমান হয়, কাব্যটি এইভাবে তাঁর বাল্য-কৈশোর-যৌবনের শ্রুতির নিত্যসঙ্গী ছিল। রবীন্দ্রছন্দপাঠের ছাত্রমাত্রেরই জানা আছে *কল্পনা* কাব্যের 'মদনভস্মের পর' ও 'মদনভস্মের পূর্বে' কবিতার

> একদা তুমি অঙ্গ ধরি ফিরিতে নব ভুবনে
> মরি মরি অনঙ্গ দেবতা...

এবং

> পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একী সন্ন্যাসী
> বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে...

ইত্যাদি স্তবকের ছন্দস্পন্দের উৎস *গীতগোবিন্দ*-এর দশম সর্গের 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্‌' এই সুপরিচিত চরণগুচ্ছ।[৪] অথচ ছন্দ জয়দেব থেকে গৃহীত হলেও কাব্য-বিষয়টি কালিদাসের *কুমারসম্ভব* থেকে উৎসারিত। এখানেও কিঞ্চিৎ স্মিতবিস্ময় রয়ে গেছে। জয়দেবের এই শ্লোকের গভীর প্রভাব রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র আত্মস্থ করেছেন। সে কথায় পরে আসা যাবে। তবে 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি' কিংবা 'অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণং'-এর পঞ্চমাত্রিক কলাবৃত্ত তো রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ছন্দরীতি। বিনা আয়াসে মনে পড়বে :

> আমারে করো তোমার বীণা লহো গো লহো তুলে
> উঠিবে বাজি তন্ত্রীরাজি মোহন অঙ্গুলে।...

বাহির পথে বিবাগি হিয়া কিসের খোঁজে গেলি
আয়রে ফিরে আয়
পুরানো ঘরে দুয়ার দিয়া ছেঁড়া আসন মেলি
বসিবি নিরালায়।...

বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।...

বিরস দিন বিরল কাজ, প্রবল বিদ্রোহে
এসেছ প্রেম, এসেছ আজ কী মহাসমারোহে।

কবিতা নয়, শুধু গানের এলাকা থেকেই তুলে-আনা উদাহরণ এগুলো।[৫] পূর্বালোচিত গবেষণায় উল্লেখিত হয়েছে, জয়দেবের ১৬ মাত্রার পাদাকুলক ছন্দ রবীন্দ্রনাথও ব্যবহার করেছেন। কল্যাণীশঙ্কর ঘটক দেখিয়েছেন, 'স্তনবিনিহিতমপি হার মুদারম্' রবীন্দ্রনাথের 'ওগো বধূ সুন্দরী তুমি মধু মঞ্জরী'রই যেন প্রাক্‌প্রকরণ। জয়দেবের ২৮ মাত্রার দীর্ঘ পাদাকুলক 'চল সখি কুঞ্জং সতিমির পুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলম্' রবীন্দ্রনাথের *ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী*-র এই শ্লোক মনে পড়াবেই :

সতিমির রজনী সচকিত সজনী শূন্য নিকুঞ্জ অরণ্য
কলয়িত মলয়ে, সুবিজন নিলয়ে বালা বিরহবিষণ্ণ।

আসলে ভানুসিংহের অধিকাংশ পদই এই অষ্টমাত্রিক পর্বধ্বনিতে গ্রথিত :

হৃদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে কণ্ঠে শুকাওল মালা
বিরহবিষে দহি বহি গল রয়নী, নহি নহি আওল কালা॥
বুঝনু বুঝনু সখি, বিফল বিফল সব, বিফল এ পীরিতি লেহা
বিফল রে এ মঝু জীবন যৌবন, বিফল রে এ মঝু দেহা॥
চল সখি গৃহে চল মুঞ্চ নয়নজল— চল সখি চল গৃহকাজে
মালতিমালা রাখহ বালা— ছি ছি সখি মরু মরু লাজে॥

পরপর আরও উল্লেখমালা স্মরণ করছি :

বসন্ত আওল রে!
মধুকর গুন গুন, অমুয়া মঞ্জরী কানন ছাওল রে।...

শ্যাম রে, নিপট কঠিন মন তোর।
বিরহ সাথি করি দুঃখিনী রাধা রজনী করত হি ভোর।...

হম সখি দারিদ নারী!
জনম অবধি হম পীরিতি করনু মোচনু লোচন-বারি।...

হম যব না রব সজনী.
নিভৃত বসন্ত-নিকুঞ্জ-বিতানে আসবে নির্মল রজনী,...

শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা নিশীথ যামিনী রে।
কুঞ্জপথে সখি. কৈসে যাওব অবলা কামিনী রে।...

'এসো এসো বসন্ত ধরাতলে' গানের দু-একটি ছত্রে এর প্রতিস্পন্দ পাওয়া যায় :

এসো বিকশিত উন্মুখ এসো চির-উৎসুক নন্দনপথচিরযাত্রী
এস স্পন্দিত নন্দিত চিত্তনিলয়ে গানে গানে প্রাণে প্রাণে।

*চিত্রাঙ্গদা*-র যুগল নৃত্যের এই গানটিতেও

কোন দেবতা সে কী পরিহাসে ভাসান্ মায়ার ভেলায়
স্বপ্নের সাথি এসো মোরা মাতি স্বর্গের কৌতুকখেলায়।...

২

জয়দেবের শব্দানুপ্রাস রবীন্দ্রনাথকে কতটা আন্দোলিত করেছিল তার উদাহরণ কবির রচনা থেকে অজস্র পাওয়া যাবে। জয়দেবের বাক্যবিন্যাসে ধ্বনিপ্রাসের একটি প্রিয় প্যাটার্ন আছে, যেমন

শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল।
কলিতললিতবনমাল। জয় জয়দেব হরে॥
দিনমণিমণ্ডলমণ্ডন ভবখণ্ডন।
মুনিজনমানসহংস। জয় জয়দেব হরে॥[৬]

নয়নকুরঙ্গতরঙ্গবিকাসনিরাসকরে শ্রুতিমণ্ডলে।
মনসিজপাশবিলাসধরে শুভবেশ নিবেশয় কুণ্ডলে॥
ভ্রমরচয়ং রচয়ন্তমুপরি রুচিরং সুচিরং মম সম্মুখে।
জিতকমলে বিমলে পরিকর্ময় নর্মজনকমলকং মুখে॥[৭]

একটি মহারাষ্ট্রীয় গানের সুরে কথা বসাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ জয়দেবকেই যেন স্মরণ করেছেন। গানটি 'বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে'। তার অংশবিশেষ :

অতি মঞ্জুল অতি মঞ্জুল শুনি মঞ্জুল গুঞ্জন কুঞ্জে
শুনি রে শুনি মর্মর পল্লবপুঞ্জে
পিককূজন পুষ্পবনে বিজনে
মৃদু বায়ুহিলোল বিলোল বিভোল বিশাল সরোবর মাঝে
কলগীত সুললিত বাজে...
হেরো ক্ষুব্ধ ভয়াল বিশাল নিরাল পিয়ালতমালবিতানে...
অতি নির্মল হাসবিকাশ আকাশ-নীলাম্বর মাঝে...

'পোহাল পোহাল বিভাবরী' গানের বাণীও এই কারণে প্রিয়তর হয় .

কম্পিত অংশুককেতন-অঞ্চল
আলসলালস পাসরি...

কুঞ্জকুটির, মঞ্জু-মঞ্জুল-বঞ্জুল, মঞ্জীর-গুঞ্জর এইজাতীয় ধ্বনিপুঞ্জ জয়দেবের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ অকৃপণভাবে নিয়েছেন। ভানুসিংহের গানে 'গহনকুসুমকুঞ্জ মাঝে', 'মঞ্জীর-রাব', 'মোদিত বিহ্বল চিত্তকুঞ্জতল', 'কুঞ্জ কুঞ্জ ফেরনু সখি' প্রভৃতির মঞ্জুব্যবহার দৃষ্টি এড়াবে কী করে? 'অনন্তের বাণী তুমি' গানে যেমন :

বঞ্জুল নিকুঞ্জতলে সঞ্চারিবে লীলাচ্ছলে
চঞ্চল অঞ্চলগন্ধে বনচ্ছায়া রোমাঞ্চিত হবে।...
মন্থর মঞ্জুল ছন্দে মঞ্জীরের গুঞ্জনকল্লোলে...

'বাসন্তী হে ভুবনমোহিনী' গানে

বিচলিত চিত উচ্ছলি উন্মাদনা
ঝনঝন ঝনিল মঞ্জীরে মঞ্জীরে।

'সে আসে ধীরে' গানটি জয়দেবীয় বাক্‌রীতি ও ধ্বনিমর্মরে বড়ো হৃদ্য হয়ে উঠেছে :

সে আসে ধীরে যায় লাজে ফিরে
রিনিকিঝিনিকি রিনিঝিনি মঞ্জু মঞ্জু মঞ্জীরে।
রিনিঝিনি ঝিন্নীরে।
বিকচ নীপকুঞ্জে নিবিড়তিমিরপুঞ্জে
কুন্তলফুলগন্ধ আসে অন্তর মন্দিরে
উন্মদ সমীরে।
শঙ্কিত চিত কম্পিত অতি অঞ্চল উড়ে চঞ্চল
পুষ্পিত তৃণবীথি, ঝংকৃত বনগীতি—
কোমলপদপল্লবতলচুম্বিত ধরণীরে
নিকঞ্জকুটিরে॥

'ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে' কালিদাসীয় অনুষঙ্গে পূর্ণ হলেও 'কুঞ্জকুটিরে' এই *গীতগোবিন্দ*-আশ্রিত শব্দটি সেখানে স্বচ্ছন্দে রয়ে গেছে। 'কেন পান্থ এ চঞ্চলতা' গানে 'ফুলগন্ধনিবেদন বেদনসুন্দর মালতী তব চরণে প্রণতা' গীতগোবিন্দের কুঞ্জ থেকে ভেসে-আসা বাতাসের মতো লাগে। 'ওগো বধূ সুন্দরী' গানের 'মঞ্জুল বল্লীর বঙ্কিম কঙ্কণ'ও তাই। 'রেখেছি কণকমন্দিরে কমলাসন পাতি', 'মুগ্ধ ললিত অশ্রুগলিত গীতে', 'মধুরবেদন বিধুর হৃদয়ে শরমনমিত নয়নে', 'লহ হৃদয়ের অভিনন্দন চন্দন-উপহার', 'বিপুল পুলক', 'সকলভুবন' এই জাতীয় শব্দ জননান্তর সৌহৃদানি বহন করে আনে।

৩

নৃত্যনাট্য *চিত্রাঙ্গদা*-য় চিত্রাঙ্গদার গানের এই প্রত্যাশাটি যেন জয়দেবীয় :

যৌবন পাক সম্মান
বাঞ্ছিত সম্মিলনে।

অনেককাল আগে *ক্ষণিকা*-র 'যুগল' কবিতায় তার স্বীকরণ ছিল :

ঠাকুর, তব পায়ে নমোনমঃ
পাপিষ্ঠ এই অক্ষমেরে ক্ষম,
আজ বসন্তে বিনয় রাখো মম—
বন্ধ করো শ্রীমদ্‌ভাগবত।
শাস্ত্র যদি নেহাৎ পড়তে হবে
গীতগোবিন্দ খোলা হোক না তবে।
শপথ মম, বোলো না এই ভবে
জীবনখানা শুধুই স্বপ্নবৎ।

বসন্ত চিরদিনই রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ঋতু। বর্ষার উদ্দীপনা যেমন সংকলন করেছেন তিনি *মেঘদূত* থেকে, তেমনি বসন্তের কি *গীতগোবিন্দ* থেকে? হয়তো অতিশয়োক্তি, তবু অস্বীকার করি কী করে? যদিও 'মেঘৈর্মেদুরম্বরং' দিয়ে *গীতগোবিন্দ*-এর শুরু। তবু অচিরেই বসন্তের বাতাস এসে মেঘকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে।

তারপর অনেকগুলি বাসন্তী স্তবক ফুলভারে অবনম্র হয়ে আছে : বসন্তে বাসন্তীকুসুমসুকুমারৈরবয়বৈর্ভ্রমন্তীং কান্তারে বহুবিহিত কৃষ্ণানুসরণাম্।[৮]

প্রথম সর্গের ২৭ শ্লোকটি 'বসন্তরাগেন গীয়তে' :

ললিতবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে।
মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে॥
বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে।
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে॥[৯]

উন্মদমদনমনোরথপথিকবধূজনজনিতবিলাপে।
অলিকুলসংকুলকুসুমসমূহনিরাকুলবকুলকলাপে॥
মৃগমদসৌরভরভসবংশবদনবদলমালতমালে।
যুবজনহৃদয়বিদারণমনসিজনখরুচিকিংশুকজালে॥[১০]

সুকুমার সেনের ভূমিকা সংবলিত একটি *শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্* গ্রন্থের শেষাংশে জনৈক রসময় দাস -কৃত যে পয়ার-অনুবাদ যুক্ত হয়েছে, তার থেকে উদ্‌ধৃত শ্লোকগুলির অনুবাদ তুলে দিচ্ছি :

শুন শুন প্রাণসখি বসন্ত-সময়
বৃন্দাবন সুখশোভা বর্ণন না হয়॥
তাহাতে রসিক কৃষ্ণ যুবজনসঙ্গে
বিহার করয়ে আর নৃত্য করে রঙ্গে॥
ছয় রস শৃঙ্গারে হয়েছে মূর্তিমান
তাহাতে সম্মিলন বসন্ত আগুয়ান॥
বসন্ত-সমীপে কৃষ্ণ করিছে বিহার
মূর্তিমান হইয়াছে সাক্ষাৎ শৃঙ্গার॥
ললিতা লবঙ্গলতা তাহার মিলনে
কোমল মলয়বায়ু বহে অনুক্ষণে॥
মধুকর-নিকর বেষ্টিত সব ঠাঞি
কোকিল-কূজিত কুঞ্জ কুটীরে সদাই॥
বিরহিণীজনে বহু দুরন্ত বিশেষ
বসন্ত সময় তাহে বৃন্দাবন দেশ॥
উন্মত্ত মদন মনোরথ সব স্থানে
প্রকাশিত বধূচিত্ত করয়ে ছেদনে॥[১১] ...

ভানুসিংহ-পদেও বসন্তের এই জয়দেবোচিত চিত্ররূপ রবীন্দ্ররচনায় বসন্তের প্রত্নগীত :

বসন্ত আওল রে!
মধুকর গুন গুন, অমুয়া মঞ্জরী কানন ছাওল রে।
শুন শুন সজনী হৃদয় প্রাণ মম হরখে আকুল ভেল,
জর জর রিঝসে দুঃখদহন সব দূর দূর চলি গেল।...

শেষজীবনে রচিত এই নিম্নোক্ত বসন্ত-গীতের ছন্দ সুর ভাষা যেমনই হোক, ঋতুটি জয়দেবের দেশ থেকেই এসে পড়েছে যেন :

আজি দক্ষিণ-পবনে
দোলা লাগিল বনে বনে।
দিক্‌ললনার নৃত্যচঞ্চল মঞ্জীরধ্বনি
অন্তরে ওঠে রনরনি
বিরহবিহ্বল হৃৎস্পন্দনে।

মাধবীলতায় ভাষাহারা ব্যাকুলতা
পল্লবে পল্লবে প্রলপিত কলরবে।
প্রজাপতির পাখায় পাখায় দিকে দিকে লিপি নিয়ে যায়
উৎসব-আমন্ত্রণে॥

৪

*গীতগোবিন্দ*-এর ষষ্ঠ সর্গের লক্ষ্যবেধ রাধার বাসকসজ্জা বর্ণনায়, যেমন কবির গানের ভাষায়, 'সে আসিবে আমার মন বলে।' সপ্তম সর্গে কৃষ্ণের অনাগমনে রাধার বিপ্রলব্ধা রূপ :

কথিতসময়েঽপি হরিরহহ ন যযৌ বনম্
মম বিফলমিদমমলমপিরূপযৌবনম্॥ (৭।৩)

'কথিত সময় বহিয়া গেল, হরি তো আসিলেন না। আমার এই অমল রূপযৌবন বিফল হইল। সখীগণ আমায় বঞ্চনা করিয়াছে; হায় আমি কাহার শরণ গ্রহণ করিব।' (অনুবাদ : হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।)

মম মরণমেব বরমতিবিতথকেতনা
কিমিহ বিষহামি বিরহানলমচেতনা॥ (৭।৫)

'এখন আমার মরণই ভালো, কৃষ্ণবিরহানলে চেতনাশূন্য হইতেছি। ব্যর্থ দেহে এই বিরহ সহ্য করিয়া কী ফল?' (অনুবাদ : হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।)

কুসুমসুকুমারতনুমতনুশরলীলয়া
স্রগপি হৃদি হন্তি মামতিবিষমশীলয়া॥ (৭।৮)

'এই কুসুমহার বক্ষের উপর সুশোভিত রহিয়াছে। ইহাও যেন মদনবাণরূপ পরিগ্রহ করিয়া আমার কুসুমসুকুমার দেহকে বিষমরূপে প্রহার করিতেছে।' (অনুবাদ : রসময় দাস।)

প্রচলিত বৈষ্ণব পদাবলীতে এই বিষয়ের পদের অভাব নেই। বিপ্রলব্ধা বাসকসজ্জিকা খণ্ডিতা কলহান্তরিতা প্রভৃতি নায়িকালক্ষণযুক্ত বৈষ্ণব পদের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের আকৈশোর পরিচয় ছিল, তবু এই বিষয়ের রবীন্দ্ররচনায় জয়দেবের কথাই মনে আসে। নিম্নোদ্ধৃত পদটিতে ভানুসিংহের লেখনী যেন *গীতগোবিন্দ*-এর মসীতে অনুসিক্ত :

হৃদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে, কণ্ঠে বিমলিন মালা।
বিরহবিষে দহি বহি গল রয়নী, নহি নহি আওল কালা।
বুঝনু বুঝনু, সখি, বিফল বিফল সব, বিফল এ পীরিতি লেহা—
বিফল রে এ মঝু জীবন যৌবন, বিফল রে এ মঝু দেহা!
চল সখি গৃহে চল, মুঞ্চ নয়ন-জল, চল সখি চল গৃহকাজে,
মালতি-মালা রাখহ বালা, ছি ছি সখি, মরু মরু লাজে।
সখি লো, দারুণ আধি-ভরাতুর এ তরুণ যৌবন মোর,
সখি লো, দারুণ প্রণয়-হলাহল জীবন করল অঘোর।
তৃষিত প্রাণ র্মম দিবস-যামিনী শ্যামক দরশন আশে,
আকুল জীবন থেহ ন মানে, অহরহ জ্বলত হুতাশে।...

নিচের *কড়ি ও কোমল*-এর যুগে লেখা গানটিও এরই প্রায় ভাষান্তর :

আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন আকুল নয়ন রে
আমি নিতিনিতি বনে করিব যতনে কুসুমচয়ন রে।

কত শারদ যামিনী হইবে বিফল বসন্ত যাবে চলিয়া
কত উদিবে তপন আশার স্বপন প্রভাত যাইবে ছলিয়া।
এই যৌবন কত রাখিব বাঁধিয়া মরিব কাঁদিয়া রে
সেই চরণ পাইলে মরণ মাগিব সাধিয়া সাধিয়া রে।...

একবার স্মরণপটে আনা যাক *গীতগোবিন্দ*-এর সপ্তম সর্গের অন্তিম শ্লোকটি :

বাধাং বিধেহি মলয়ানিল পঞ্চবাণ
প্রাণান্ গৃহাণ ন গৃহং পুনরাশ্রয়িষ্যে
কিন্তে কৃতান্তভগিনি ক্ষময়া তরঙ্গৈর্
অঙ্গানি সিঞ্চ মম শাম্যতু দেহদাহঃ॥ (৭।৪১)

'হে মলয়ানিল! তুমি আমাকে ব্যথিত কর। পঞ্চবাণ! তুমি আমার পঞ্চপ্রাণ গ্রহণ কর, আমি আর গৃহে ফিরিয়া যাইব না। হে যমভগিনি [কালিন্দি]। তুমিই বা কেন ক্ষমা করিবে, তোমার তরঙ্গরঙ্গে এ দেহ সিক্ত কর (আমাকে ডুবাইয়া দাও) তবেই আমার দেহজ্বালা প্রশমিত হইবে।' (অনুবাদ : হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।)

*সোনার তরী*-র গানটি এখানে মনে পড়বেই :

আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে
নয়নের জল ঝরিছে বিফল নয়নে।
এ বেশভূষণ লহো সখী লহো
এ কুসুমমালা হয়েছে অসহ—
এমন যামিনী কাটিল বিরহ শয়নে॥
আমি বৃথা অভিসারে এ যমুনা পারে এসেছি
বহি বৃথা মন-আশা এত ভালোবাসা বেসেছি।
শেষে নিশি— শেষে বদন মলিন,
ক্লান্তচরণ, মন উদাসীন,
ফিরিয়া চলেছি কোন সুখহীন ভবনে॥
ওগো ভোলা ভালো তবে কাঁদিয়া কী হবে মিছে আর।
যদি যেতে হল হায় প্রাণ কেন চায় পিছে আর।
কুঞ্জদুয়ারে অবোধের মতো
রজনী প্রভাতে বসে রব কত—
এবারের মতো বসন্ত গত জীবনে॥

*গীতগোবিন্দ*-এর অষ্টম সর্গে ব্যর্থ নিশাবসানে শ্রীমতীর প্রভাত হল। জয়দেব অষ্টম সর্গের সূচনাতেই 'রজনীজনিতগুরুজাগররাগকষায়িতমলসনিমেষম্' কৃষ্ণকে রাধাসমীপে উপস্থিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ব্যর্থ নায়িকার প্রভাতী ছবিটি এঁকেছেন নিজের মতো করে। নায়িকার উদ্দেশে সখী-বচনে :

আহা, জাগি পোহাল বিভাবরী
অতি ক্লান্ত নয়ন তব সুন্দরী।
ম্লান প্রদীপ উষানিলচঞ্চল, পাণ্ডুর শশধর গত-অস্তাচল,
মুছ আঁখিজল, চলো সখি চলো' অঙ্গে নীলোঞ্চল সম্বরি।
শরতপ্রভাত নিরাময় নির্মল, শান্ত সমীরে কোমল পরিমল,
নির্জন বনতল শিশির সুশীতল, পুলকাকুল তরুবল্লরী।
বিরহ শয়নে ফেলি মলিন মালিকা এসো নবভুবনে এসো গো বালিকা,
গাঁহি লহ অঞ্চলে নব শেফালিকা অলকে নবীন ফুলমঞ্জরী॥

৫

*গীতগোবিন্দ*-এর যে প্রথম শ্লোকের কথা (মেঘৈর্মেদুরমম্বরং) আগেই বলেছি, পূর্বতন গবেষকরাও সবিস্তারে রবীন্দ্ররচনায় সেই শ্লোকের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। *মানসী*-র 'মেঘদূতে'র সেই বাণীবিতান :

ভারতের পূর্বদেশে
আমি বসে আছি; যে শ্যামল বঙ্গদেশে
জয়দেব কবি, আর এক বর্ষাদিনে
দেখেছিলা দিগন্তে তমাল বিপিনে
শ্যামচ্ছায়া, পূর্ণমেঘে মেদুর অম্বর।

*সোনার তরী*-র 'বর্ষাযাপনে'ও এই ধ্বনির পুনরুচ্চারণ শুনি :

আষাঢ় হতেছে শেষ মিশায়ে মল্লার দেশ
রটি 'ভরা ভাদরের' সুর
খুলিয়া প্রথম পাতা গীতগোবিন্দের গাথা
গাহি মেঘে অম্বর মেদুর।

এই শ্লোকটি অনেক লেখাতেই উল্লেখিত। শার্দুলবিক্রীড়িত ছন্দে রচিত এই শ্লোকটির অভিরাম একটি উপস্থাপনা আছে কবির 'গদ্যছন্দ' নামক প্রবন্ধে :

আকাশ কালো মেঘে স্নিগ্ধ, বনভূমি তমালগাছে শ্যামবর্ণ, ব্যাপারটি এর বেশি কিছুই নয়; খবরটা একবারের বেশি দুবার বললে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিই। কবি বরাবরকার মতো বলতে থাকলেন

মেঘৈর্মেদুরম্বরং বনভূবঃ শ্যামস্তমালদ্রুমৈঃ

কবিমনের মেঘলাদিনের সংবেগ চড়ে বসল ছন্দ-পক্ষিরাজের পিঠে, চলল চিরকালের মনোহরণ করতে।[১২]

পম্পা মজুমদার দেখিয়েছেন, জয়দেবের এই পদটি ছাড়াও 'চরণচারণ চক্রবর্তী', 'ললিতলবঙ্গলতা', 'পরিশীলন', 'বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে' প্রভৃতি পদাংশ বহুবার কবি স্মরণ করেছেন। *ছন্দ* গ্রন্থে জয়দেব উদাহরণ-সূত্রে পরিকীর্ণ। আর *শেষের কবিতা*-য় 'ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং' শ্লোকটিকে তো কবি অমিত-লাবণ্যের প্রণয়কণ্ঠের চিরন্তনী মালিকা করে দুলিয়ে দিয়েছেন। জয়দেবের বাক্‌বিন্যাস কবির কাছে মেলে ধরে যেন গানের গগন। সে-পদ শ্রবণমাত্রেই সেই 'অম্বর প্রাঙ্গণমাঝে নিঃসর মঞ্জীর গুঞ্জে'। তাই *ছন্দ* গ্রন্থভুক্ত 'বাংলা শব্দ ও ছন্দ' রচনায় একদা মন্তব্য করেছিলেন :

বাঙালি জয়দেবের গীতগোবিন্দ আধুনিক এবং তাহাকে এক হিসাবে গান না বলিলেও চলে। কারণ তাহার ভাষালালিত্য ও ছন্দোবিন্যাস এমন সম্পূর্ণ যে তাহা সুরের অপেক্ষা রাখে না; বরং আমার বিশ্বাস সুরসংযোগে তাহার স্বাভাবিক শব্দনিহিত সংগীতের লাঘব করে।

*চিরকুমার সভা*-য় রসিক ন-এর বর্ণমালা গেঁথে গেঁথে কোনো নীলোৎপলনয়নার কণ্ঠে পরানোর উদ্দেশ্যে শব্দ বানিয়েছিলেন 'নির্মলনবনীনিন্দিত', 'নবীননবমল্লিকা'। তারপর কৌতুক-মন্তব্য—'গীতগোবিন্দ মাটি হল'। *ব্যঙ্গকৌতুক* গ্রন্থের 'মীমাংসা' লেখাটি থেকে একটি জয়দেব প্রসঙ্গ :

আমার ন্যায় আর-কোনো হতভাগিনী সম্বন্ধে জয়দেব লিখিয়াছেন

নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনু বিন্দতি খেদমধীরম্।
ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরম্॥

পদটি *গীতগোবিন্দ*-এর চতুর্থ সর্গের মুখ-গীত, মাধবকে রাধার সখী জানালেন, 'রাধা চন্দন এবং চন্দ্রকিরণের নিন্দা করিতেছেন, যাহারা স্বভাবশীতল তাহারা অগ্নিবৎ জ্বালা বিস্তার করিতেছে। তিনি এই দুর্দৈবে অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। মলয়পবনকে তিনি চন্দনতরুকোটরস্থিত সর্পগণের সঙ্গহেতু বিষময় (সর্প-নিঃশ্বাসে বিষাক্ত) বলিয়া মনে করিতেছেন।' বোঝা যায়, জয়দেবের বহুতর কাব্যচরণ রবীন্দ্রনাথের

স্বচ্ছন্দস্মরণে বিরাজ করত। 'ললিতলবঙ্গলতা' তাদেরই অন্যতম *শেষ রক্ষা*-য় চন্দ্রকান্তের উক্তিটি উদ্ধার্য :

তোরা বুঝবি নে গদাই, ভিতরে গীতগোবিন্দের অল্প একটু আমেজ আছে; সুযোগ ঘটলে ললিতলবঙ্গলতার সঙ্গে ছন্দের মিল হতেও পারত।[১৩]

শব্দতত্ত্বের দিক থেকে 'দেহি পদপল্লবমুদারম্'-এর উল্লেখ পাওয়া গেল 'উপসর্গ সমালোচনা' নামের ছোটো একটুকরো লেখায় :

যদিচ উৎ উপসর্গের ঊর্ধ্বগামিতার ভাব সুস্পষ্ট', এবং উৎপত্তি অনুসারে 'উদার' শব্দে বিশেষরূপে উচ্চতা ও উন্নতভাবই প্রকাশ করে, তথাপি জয়দেব রাধিকার পদপল্লবে উদার বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া তাহার গৌরব সূচনা করিয়াছেন মাত্র।[১৪]

*ঘরে বাইরে* উপন্যাসে সন্দীপের মুখে আবার জয়দেবকে এনেছেন রবীন্দ্রনাথ :

আমি [ সন্দীপ ] বললুম, আপনারা কবিতার বই পড়তে লজ্জা পান কেন আমি বুঝতে পারি নে। লজ্জা পাবার কথা পুরুষদের; কেন আমরা কেউ বা অ্যাটর্নি, কেউ বা এঞ্জিনিয়ার। আমাদের যদি কবিতা পড়তেই হয় তাহলে অর্ধেকরাত্রে দরজা বন্ধ করে পড়া উচিত। কবিতার সঙ্গেই তো আপনাদের আগাগোড়া মিল। যে বিধাতা আপনাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি যে গীতিকবি, জয়দেব তাঁরই পায়ের কাছে বসে 'ললিতলবঙ্গলতায় হাত পাকিয়েছেন।

*গীতগোবিন্দ*-এর কবি জয়দেব ও পত্নী পদ্মাবতী অনেক কল্পকথার উৎস, এই কথাও রবীন্দ্রনাথের জানা ছিল। সেই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথও এক কৌতুক-কাহিনি তৈরি করেছেন তাঁর শেষ রাগের *বাঁশরি* নাটকে।[১৫] এরই এক দৃশ্যে বাঁশরির ডাকা পার্টিতে বুদ্ধিজীবী পুরুষনারীদের আলাপচারিতা চলেছে বাঁশরিকে নিয়ে। শোনা গেল এক আলাপিকার মুখে :

সোমশংকর হাতছাড়া হবার পর বাঁশরির শখ গেল নখী-দন্তী গোছের একটা লেখক পোষবার। হঠাৎ দেখি জোটালো কোথা থেকে আস্ত একটা কাঁচা সাহিত্যিক। সেদিন উৎসাহ পেয়ে লোকটা শোনাতে এসেছে একটা নূতন লেখা। জয়দেব-পদ্মাবতীকে নিয়ে তাজা গল্প। জয়দেব দূর থেকে ভালোবাসে রাজমহিষী পদ্মাবতীকে। রাজবধূর যেমন রূপ তেমনি সাজসজ্জা, তেমনি বিদ্যেসাধ্যি। অর্থাৎ একালে জন্মালে সে হত ঠিক তোমারই মতো শৈল। একদিকে জয়দেবের স্ত্রী ষোলো-আনা গ্রাম্য, ভাষায় পানাপুকুরের গন্ধ, ব্যবহারটা প্রকাশ্যে বর্ণনা করবার মতো নয়, যে-সব তার বীভৎস প্রবৃত্তি ড্যাশ দিয়ে ফুটকি দিয়েও তার উল্লেখ করা চলে না। লেখক শেষকালটা খুব কালো কালিতে দেগে প্রমাণ করেছে যে, জয়দেব স্নব, পদ্মাবতী মেকি, একমাত্র খাঁটি সোনা মন্দাকিনী। বাঁশরি চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তারস্বরে বলে উঠল, 'মাস্টরপীস'। ধন্যি মেয়ে! একেবারে সাব্লাইম ন্যাকামি।

তবু জয়দেবকে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের ঊর্ধ্বে স্থাপন করেন নি। সে কথাটিও এখানে উচ্চারিত হওয়া চাই। 'কেকাধ্বনি' প্রবন্ধের প্রাজ্ঞোক্তি মনে রাখতেই হবে :

জয়দেবের ললিতলবঙ্গলতা ভালো বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ নহে। ইন্দ্রিয় তাহাকে জন-মহারাজের কাছে নিবেদন করে, মন তাহাকে একবার স্পর্শ করিয়াই রাখিয়া দেয়— তখন তাহা ইন্দ্রিয়ের ভোগেই শেষ হইয়া যায়। ললিত-লবঙ্গলতার পার্শ্বে কুমারসম্ভবের আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং... ধরিয়া দেখা যাক— ইহার মধ্যে লয়ের যে উত্থান আছে, কঠোরে কোমলে যথাযথরূপে মিশ্রিত হইয়া ছন্দতে যে দোলা দিয়াছে, তাহা জয়দেবী লয়ের মতো অতিপ্রত্যক্ষ নহে, তাহা নিগূঢ়; মন তাহাকে আলস্যভরে পড়িয়া পায় না, নিজে আবিষ্কার করিয়া লইয়া খুশি হয়।[১৬]

শেষ বয়সে লেখা *সে* বইতে[১৭] এক একেলে কবির নামে ছড়া বানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তাতে আছে :

আগডুম বাগডুম
দুমদাম ধুমাধুম
ভেঙে চুরে চুরমার হোক খাটটা
ঘুম যাক মারো কষে মালসাট্টা।
বাঁশিওলা চুপ রাও
টান মেরে উপড়াও
ধরা হতে ললিত লবঙ্গলতা।
বেল জুঁই চম্পক
দূরে দিক ঝম্পক,
উপবনে জমা হোক জঙ্গলতা।

আমি অস্থির হয়ে দুই হাত তুলে বললুম, থামো থামো, আর নয়। জয়দেবের ভূত এখনও কাঁধে বসে ছন্দের সার্কাস করছে, কানের দখল ছাড়ে নি।

৬

রবীন্দ্রসংগীতের সিঁথিপ্রান্তে *গীতগোবিন্দ*-এর মেঘমুক্ত-সহাস্য-চন্দ্রকলার আরও একটি কিরণের উল্লেখ বাকি রয়েছে। জয়দেবের কাব্যের নবম ও দশম সর্গ জুড়ে 'মুগ্ধ-মুকুন্দ' ও 'মুগ্ধ-মাধব'-এর মানভঞ্জন অতি অপরূপ লীলাময় শব্দে ছন্দে বর্ণিত। নবম সর্গে সখীদের মিনতি 'মাধবে মা কুরু মানিনি মানময়ে' যেন *প্রকৃতির প্রতিশোধ*-এর সেই

বনে এমন ফুল ফুটেছে
মান করে থাকা আর কি সাজে।

মুগ্ধ মাধব দশম সর্গ জুড়ে স্তুতিবচনে রাধার শীতলতাকে উষ্ণ করতে চাইলেন। সেখানেই প্রদোষঘন অন্ধকারে কৃষ্ণ গাইলেন :

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্
স্ফুরদধরসীধবে তব বদনচন্দ্রমা
রোচয়তি লোচনচকোরম্॥ (১০।২)

তুমি যদি একটি কথাও কও, তাহা হইলেই তোমার দশনপঙ্‌ক্তির জ্যোৎস্নাচ্ছটায় আমার অন্তরের (ভীতিরূপ) অতিঘোর অন্ধকার দূরীভূত হয়। তোমার বদনচন্দ্র-উচ্ছলিত অধরসুধা পানের জন্য আমার নয়ন-চকোর অত্যন্ত পিপাসিত হইয়াছে। (অনুবাদ : হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।)

প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চময়ি মানমনিদানম্
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসম
দেহি মুখকমলমধুপানম্॥ (১০।৩)

প্রিয়ে চারুশীলে! (আমার প্রতি) অকারণ মান পরিত্যাগ কর, যখন হইতে মান করিয়াছ, তখন হইতেই আমার চিত্ত মদনানলে দগ্ধ হইতেছে। তোমার মুখকমলের মধুদানে সেই জ্বালা নির্বাপিত কর। (অনুবাদ : হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।)

সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী
দেহি খরনয়নশরঘাতম্
ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনম্
যেন বা ভবতি সুখজাতম্॥ (১০।৪)

প্রসন্নবদনে! যদি সত্যই আমার উপর কোপ করিয়া থাক, তবে তোমার তীক্ষ্ণ কটাক্ষশরে আমাকে আঘাত কর। ভুজলতায় পাশবদ্ধ করিয়া [ তু. 'ভুজপাশে তব লহ সম্বোধয়ি' ], চুম্বনে অধর দংশন করিয়া, যাহাতে তোমার সুখ হয়, সেইভাবেই আমার শাস্তি বিধান কর। (অনুবাদ : হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।)

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনম্
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্
ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়তিযত্নম্। (১০।৫)

তুমিই আমার, ভুষণ তুমিই আমার জীবন [ তু. 'তুঁহু মম মাধব তুঁহু মম দোসর'], তুমিই আমার সংসার-সাগরের রত্নস্বরূপ। হৃদয়ের একান্ত অভিলাষ এই যে, তুমি যেন আমার প্রতি চির-অনুকুল থাকিও [ তু. 'রাধা-হৃদয় তু কবহুঁ ন তোড়বি' ]। (অনুবাদ : হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।)

স্মর গরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্
দেহি পদপল্লবমুদারম্
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো
হরতু তদুপাহিত-বিকারম্। (১০।৯)

হে প্রিয়ে! কামবিষ-বিনাশক আমার শিরোভূষণ তোমার ওই পরম সুন্দর পদপল্লব এই মস্তকে স্থাপন কর। আমার অন্তর দারুণ মদনানলে জ্বলিতেছে, তোমার চরণস্পর্শে সে বিকার দূরীভূত হউক। (অনুবাদ : হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।)

ইতি চটুল-চাটু-পটু-চারু মুরবৈরিনো
রাধিকামধি বচনজাতম্
জয়তি পদ্মাবতী-রমণ-জয়দেব-কবি—
ভারতী-ভনিতমতিশাতম্। (১০।১০)

রাধিকার প্রতি প্রযুক্ত মুরারির সুন্দর অনুরাগবাক্য-সম্বলিত পদ্মাবতী-রমণ জয়দেব কবির এই আনন্দপ্রদ সংগীত জয়যুক্ত হউক। (অনুবাদ : হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।)

স্বয়ং জয়দেবই কৃষ্ণের মুখে রাধাস্তুতির এই উচ্চারণকে 'চটুল-চাটু-পটু-চারু বচন' বলেছেন। *ঘরে বাইরে*-র সন্দীপের কথাটা মনে পড়িয়ে দিই : 'যে-বিধাতা আপনাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি যে গীতিকবি, জয়দেব তাঁরই পায়ের কাছে বসে ললিতলবঙ্গলতায় হাত পাকিয়েছেন।' মানভঞ্জনের সেরা উপায় তো রমণীরূপের স্তাবকতা। *গীতগোবিন্দ*-এর দশম সর্গের সেই মানভঞ্জন শ্লোকাবলির একটি অপরূপ চারুশীলিত রেপ্লিকা, সেই গীতিকবি বিধাতার পায়ের কাছে বসেই কি রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন? পদটি এই :

মনোমন্দিরসুন্দরী! মণিমঞ্জীর গুঞ্জরি
স্খলদঞ্চলা চলচঞ্চলা ! অয়ি মঞ্জুলা মুঞ্জরী!
রোষারুণ-রাগ-রঞ্জিতা! বঙ্কিম-ভুরু-ভঞ্জিতা!
গোপনহাস্য-কুটিল-আস্য কপটকলহগঞ্জিতা!
সঙ্কোচনত-অঙ্গিনী! ভয়ভঙ্গুরভঙ্গিনী!
চকিত চপল নবকুরঙ্গ যৌবনবন-রঙ্গিনী!
অয়ি খলছলগুণ্ঠিতা মধুকরভর কুণ্ঠিতা
লুব্ধপবন-ক্ষুব্ধ-লোভন মল্লিকা অবলুণ্ঠিতা!
চুম্বনধনবঞ্চিনী দুরূহগর্বমঞ্চিনী!
রুদ্ধকোরক-সঞ্চিত-মধু কাঠনকনককঠিনী॥[১৮]

বলতে ইচ্ছে করছে, জয়দেব জীবিত থাকলে এই পদটির কবিকে ঈর্ষা করতেন। কিন্তু গীতগোবিন্দের দশম সর্গ না পড়লে রবীন্দ্রনাথও কি এই পদটি লিখতে পারতেন!

প্রসঙ্গ-নির্দেশ

১. 'সেই রমণীর চরণকমলের অলক্তক-রাগে রঞ্জিত হওয়ায় তোমার বিশাল বক্ষঃস্থল মদন-তরুর বহিঃপ্রকাশিত নব-পল্লব-জালের মত দর্শনীয় হইয়াছে।' শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ*, বৈশাখ ১৩৯২ সংস্করণ।

২. 'মধুরভাষিণি, তুমি আদেশ দাও, আমার হৃদয়ের শোভাবর্ধক, স্থলকমলের শোভাহারী, রতিরঙ্গে পরম রমণীয় তোমার ওই চরণকমল সরস অলক্তকরাগে রঞ্জিত করি।' হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদে এটি দশম সর্গের অষ্টম শ্লোক।

৩. এই পদটির উল্লেখ ও অনুবাদ পরে দ্রষ্টব্য।

৪. দশম সর্গ, দ্বিতীয় শ্লোক, প্রবন্ধের পরবর্তীভাগে অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

৫. তাও যথেষ্ট নয়, আরও অজস্র আছে।

৬. প্রথম সর্গ, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শ্লোক।

৭. দ্বাদশ সর্গ, ঊনবিংশ-বিংশ শ্লোক।

৮. এই শ্লোকের পরের দুই চরণ।

অমন্দং কন্দর্পজ্বরজনিতচিন্তাকুলতয়া
বলদ্‌বাধাং রাধাং সরসমিদমুচে সহচরী॥

অর্থাৎ 'বসন্তকালে [ একদিন ] প্রবলমদনবেদনে চিন্তাকুলা ও কাতরা হইয়া মাধবীকুসুমকোমলাঙ্গী রাধা বৃন্দাবনের নিভৃতপ্রদেশে বহুযত্নে শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এমন সময় কোনো সখী আসিয়া মিষ্ট বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন—॥' অনুবাদ : হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

৯. প্রথম সর্গের অষ্টাবিংশ শ্লোকের হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় -কৃত অনুবাদ :
'সখি, কোমল মলয়পবন মনোহর লবঙ্গলতা সংসর্গে মধুময় হইয়াছে। অলিগুঞ্জনমিশ্রিত কোকিলকূজনে কুঞ্জকুটীর প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বিরহিগণের দুঃখদায়ক এই সরস বসন্তে শ্রীহরি ব্রজবধূগণের সহিত বিহার ও নৃত্য করিতেছেন।'

১০. প্রথম সর্গের ঊনত্রিংশ ও ত্রিংশৎ দুই শ্লোকের হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় -কৃত অনুবাদ :
'এই বসন্ত (একদিকে যেমন) মদনসন্তাপিতা পথিকবধূগণের বিলাপে মুখরিত, (অন্যদিকে তেমনি) আলিকুলব্যাপ্ত কুসুমসমূহে নিরাকুল বকুলকলাপে সুশোভিত।'
'(এই বসন্তে) নবমুকুলিত তমালরাজি যেন মৃগমদসৌরভকে অতিশয় বশীভূত করিয়াছে (অর্থাৎ তমালমুকুল মৃগমদের ন্যায় গন্ধ বিকীর্ণ করিতেছে)। প্রস্ফুটিত পলাশপুষ্পগুলিকে যুবজন-হৃদয়-বিদীর্ণকারী কামদেবের নখরসদৃশ মনে হইতেছে।'

১১. পয়ার-অনুবাদে মূল শ্লোকের পারম্পর্য রক্ষিত হয় নি।

১২. দ্র *চিঠিপত্র* ৬, পত্রসংখ্যা ২১; চিঠিপত্র ৯, পত্রসংখ্যা ১৯৮; *পারস্যে*, নবম অধ্যায় ইত্যাদি। জয়দেবের এই পদটির রবীন্দ্রনাথ -কৃত অনুবাদ এইরূপ :

অম্বর অম্বুদে স্নিগ্ধ,
তমালে তমিস্র বনভূমি,
তিমির শর্বরী, এ যে
শঙ্কাকুল-সঙ্গে লহো তুমি।

পাঠান্তর

মেঘলা গগন, তমাল-কানন
সবুজ ছায়া মেলে—
আঁধার রাতে লও গো সাথে
তরাস পাওয়া ছেলে।

পুলিনবিহারী সেন-সম্পাদিত বিশ্বভারতী-প্রকাশিত (*রূপান্তর*, ১৩৭২) গ্রন্থ থেকে জানা যায় (গ্রন্থপরিচয়, পৃ. ২১৬-১৭) :

অনুবাদ দুইটি শ্রীনরেন্দ্র দেবকে লিখিত ২৯ আশ্বিন ১৩৩৬ তারিখের এক পত্রের অন্তর্গত—হাল আমলে সংস্কৃত ভাষায় যখন কাব্যরচনা চলেছিল তখন সে ভাষা চল্‌তি ছিল না। ময়ূরের পুচ্ছে ময়ূরের পালক হল এক জিনিস আর রাজার বীজনীতে ময়ূরের পালখ হল আরেক জিনিস। সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিগাম্ভীর্যই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসাধনকলার প্রধান অঙ্গ, সেটাকে যদি বাদ দাও তবে ইন্দ্রধনু থেকে রঙের ছটাকেই বাদ দেওয়া হয়। চল্‌তি বাংলার ছাঁদে যদি কাদম্বরীকে তর্জমা করো তাহলে সে কাদম্বরীই থাকে না। জয়দেবের 'মেঘৈর্মেদুর' শ্লোকটিতে তিনি সংস্কৃতশব্দপুঞ্জে ধ্বনির মৃদঙ্গ বাজিয়ে মেঘলা রাত্রির সংগীতটিকে ঘনিয়ে তুলেছেন। সেই সংগীত বাদ দিয়ে কেবল অর্থটুকু রাখা চলে কিন্তু তা হলে ধ্রুপদের সংগতে পাখোয়াজটাকে সরিয়ে রেখে বাঁয়ায় ঠেকা দেওয়ার মতো হয়—অভাবপক্ষে কাজ চলে কিন্তু মন প্রফুল্ল হয় না। জয়দেবের ঐ শ্লোকের প্রথম দুটি লাইন সাদা বাংলায় লিখলুম—

মেঘলা গগন, তমাল-কানন সবুজ ছায়া মেলে,
আঁধার রাতে লও গো সাথে তরাস পাওয়া ছেলে।

একটা কিছু হল বটে, কিন্তু জয়দেবের সুরই যদি না রইল তবে গীতগোবিন্দের নাম রক্ষা হবে কী করে। সে সুরটা সংস্কৃত ভাষারই সুর। এই জন্যে সংস্কৃত শব্দকেই আসরে নামানো চাই—

অম্বর অম্বুদে স্নিগ্ধ। তমালে তমিশ্র বনভূমি,
তিমির শর্বরী, এ যে শঙ্কাকুল, সঙ্গে লহো তুমি।

আর কিছু না হোক, এতে গীতগোবিন্দের সুরটা লাগলো। আমি হলে ছন্দাভাস দেওয়া গদ্যে সংস্কৃতধ্বনি সম্পদ রেখে মেঘদূতের তর্জমা করতুম।...

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

*রূপান্তর* গ্রন্থে জয়দেবের আরও দুটি পদের কবিকৃত অনুবাদে উদাহরণ আছে। যথা, জয়দেবের—

পততি পতত্রে বিচলিতপত্রে শঙ্কিতভবদুপয়ানম্
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্॥ (৫/১১)

কবি -কৃত অনুবাদ :

কাঁপিলে পাতা নড়িলে পাখি
চমকি উঠে চকিত আঁখি।

অন্যটি,

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্। (১০/২)

কবি -কৃত অনুবাদ :

বচন যদি কহ গো দুটি
দর্শনরুচি উঠিবে ফুটি
ঘুচাবে মোর মনের ঘোর তামসী।

এই দুটি অনুবাদ 'বাংলা ছন্দ' নামক আলোচনাভুক্ত হয়ে *সবুজপত্র* ১৩২১ শ্রাবণে মুদ্রিত হয়। লেখাটি জে. ডি. অ্যান্ডারসনকে পত্রাকারে লিখিত। (*রূপান্তর*, গ্রন্থপরিচয়, পৃ ২১৭।)

১৩. *শেষরক্ষা* (১৯২৮)।
১৪. *শব্দতত্ত্ব* (১৩০৬)।
১৫. *বাঁশরি* (১৩৪০)।
১৬. 'কেকাধ্বনি' (১৩০৮), *বিবিধ প্রবন্ধ*।
১৭. *সে* (১৩৪৪)।
১৮. উদ্‌ধৃত গানটি *চিরকুমার সভা* (১৩৩২) নাটকের অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে ব্যবহৃত গানটি অক্ষয় যে পত্নীর মানভঞ্জনের জন্যেই রচনা করেছিলেন, তার স্বচ্ছ স্বীকৃতি পাওয়া যাচ্ছে। নাট্যদৃশ্য থেকে সামান্য উদ্ধার অনুজ্জ্বল হবে না :

নৃপবালা। আচ্ছা মুখুজ্জেমশায়, সত্যি করে বলো, দিদির নামে তুমি কখনো কবিতা রচনা করেছ?
অক্ষয়। এবার তিনি যখন অত্যন্ত রাগ করেছিলেন তখন তাঁর স্তব রচনা করে গান করেছিলুম।
নৃপবালা। তার পরে?
অক্ষয়। তার পরে দেখলুম, তাতে উলটো ফল হল, বাতাস পেয়ে যেমন আগুন বেড়ে ওঠে তেমনি হল— সেই অবধি স্তবরচনা ছেড়েই দিয়েছি।
নৃপবালা। ছেড়ে দিয়ে কেবল গয়লাবাড়ির হিসেব লিখছ? কী স্তব লিখেছিলে মুখুজ্জে মশায়, আমাদের শোনাও না।
অক্ষয়। সাহস হয় না, শেষকালে আমার উপরওয়ালার কাছে রিপোর্ট করবি।
নৃপবালা। না, আমরা দিদিকে বলে দেব না।
অক্ষয়। তবে অবধান করো।

গান

মনোমন্দিরসুন্দরী।
স্খলদঞ্চলা চলচঞ্চলা
অয়ি মঞ্জুলা মঞ্জরী।
রোষারুণরাগরঞ্জিতা
গোপনহাস্য- কুটিল-আস্য-
কপটকলহ গঞ্জিতা।
সংকোচনত-অঙ্গিনী।
চকিতচপল- নবকুরঙ্গ-
যৌবনবন রঙ্গিণী।
অয়ি খলছল গুণ্ঠিতা।
লুব্ধ-পবন- ক্ষুব্ধ-লোভন
মল্লিকা অবলুণ্ঠিতা।
চুম্বন ধনবঞ্চিনী।
রুদ্ধ কোরক- সঞ্চিত মধু
কঠিন কনককঞ্জিনী।

*চিরকুমার সভা*-র পাঠ *গীতবিতান*-এর পূর্ব-উদ্‌ধৃত পাঠের তুলনায় খণ্ডিত। তবে *স্বরবিতান*-এ পূর্ণতর পাঠের সুরই পাওয়া যায়। দুই পাঠে কেবল বাক্যের নয়, শব্দেরও ঈষৎ পরিবর্তন আছে।

# উনিশ শতকের উত্তরাধিকার ও রবীন্দ্রনাথ

## ভবতোষ দত্ত

বিশ শতকের প্রায় মধ্যভাগে এসে রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগের বাঙালি সমাজের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন :

> আমাদের আবহমান কালের অনভিজ্ঞতার মধ্যেও মনুষ্যত্বের যে একটি মহৎ রূপ সেদিন দেখেছি তা বিদেশীয়দের আশ্রয় করে প্রকাশ পেলেও তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করবার শক্তি আমাদের ছিল ও কুণ্ঠা আমাদের মধ্যে ছিল না। কারণ মানুষের মধ্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা সংকীর্ণভাবে কোনো জাতির মধ্যে বদ্ধ হতে পারে না, তা কৃপণের মনরুদ্ধ ভাণ্ডারের সম্পদ নয়। তাই, ইংরেজের যে সাহিত্যে আমাদের মন পুষ্টিলাভ করেছিল আজ পর্যন্ত তার বিজয়শঙ্খ আমার মনে মন্দ্রিত হয়েছে।

উনিশ শতকের বাংলার জাগরণকে রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমি সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ও সর্বকালিক দানেরই ফল বলে ভেবেছিলেন। এই দানে আমাদের সাহিত্য ও সমাজ সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। তার সবটাই যে ভালো ছিল, তা নয়। যা সৎ ও চিরকালীন নয়, তা কালের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে অথবা হারিয়ে গেছে। আর ফলবান হয়েছে পশ্চিমি সভ্যতার সেই নিত্যকালীন দান। রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন এমনই এক সময়ে যখন আমাদের সাহিত্যে ও সমাজে এরই প্রকাশ ঘটছে। তাঁর মনটি এরই মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছিল। তিনি দেখেছেন আমাদের সমাজের রূপান্তরণকে তার সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে। তিনি গ্রহণ করে নিয়েছিলেন নতুন সাহিত্য ও সংস্কৃতির নবরূপ দানের ভূমিকাকে। সেকালের নতুন যুগের ভাবনা কল্পনা চিন্তা আদর্শের মধ্যে তাঁর নিজের প্রতিভার উদ্‌গম ও বিকাশ। কিছু তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন, কিছু করেন নি। অনেকখানিই তিনি কালের পরিবর্তনের সঙ্গে বর্জন করেছিলেন, কিন্তু নতুন যুগের মর্মবাণী তিনি হারান নি কখনও। তিনি গ্রহণ করে নিয়েছিলেন আর সকলের মতোই ইংরেজি সাহিত্যের রূপ ও রীতিকে আর মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে উঠেছিলেন চিরজীবী মানবিক মূল্যবোধের নব নব রূপসৃষ্টিতে।

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য নবরূপ লাভ করেছিল ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শের। মঙ্গলকাব্য আর লোকসাহিত্যের বৈচিত্র্যহীনতায় মানবতার প্রকাশ ছিল অবরুদ্ধ। নতুন যুগে মহাকাব্য গাথাকাব্য উপন্যাস নাটক— এ সবকিছুর মধ্যে নতুন যুগের বাণী পথ খুঁজেছিল। য়ুরোপের রেনেসাঁস এবং ফরাসি বিপ্লবের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার যে সর্বমানবিক বাণী ধ্বনিত হয়েছিল, আমাদের সমাজে ও সাহিত্যে সে বাণী প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। *মেঘনাদবধ কাব্য*-এর রাবণ এবং প্রমীলা, বঙ্কিমের উপন্যাসের চন্দ্রশেখর সীতারাম রাজসিংহ মবারক প্রভৃতি বীর নায়কেরা, কপালকুণ্ডলা সূর্যমুখী শৈবলিনী দেবী চৌধুরানী প্রভৃতি ব্যক্তিত্বময়ী নায়িকারা আমাদের সাহিত্যে মনুষ্যত্বের নতুন মূল্যমান রচনা করল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যকালেই বাংলা সাহিত্যকে কাব্যে উপন্যাসে নাটকে বহুবিচিত্র হয়ে উঠতে দেখেছিলেন। তিনিও সেই সাহিত্য রচনায় যোগ দিয়েছিলেন। এর সবটাই যে তাঁর প্রতিভার অনুকূল ছিল তা নয়। তবু অনুকরণ দিয়েই তিনি আত্মবিকাশের পথ খুঁজেছিলেন। ধীরে ধীরে তিনি আপন পথটি খুঁজে পেয়েছিলেন। উনিশ শতকের শেষে তিনি স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠিত হলেন। উনিশ শতকের উত্তরাধিকার নিয়েই তাঁর সেই যাত্রা শুরু হয়েছিল।

*বঙ্গদর্শন* প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭২-এ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বাংলা সাহিত্য যেন নবযৌবনে উপনীত হল। কিন্তু তার আগে থেকেই বাংলা সাহিত্যে পরিবর্তনের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছিল। কাব্যে রঙ্গলাল *পদ্মিনী উপাখ্যান* এবং মধুসূদন *মেঘনাদবধ কাব্য* লিখে নতুনত্বের সঞ্চার করলেন। এ দুটি ঘটনাই রবীন্দ্রনাথের জন্মের পূর্বের ঘটনা। *পদ্মিনী উপাখ্যান* সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কোনো মন্তব্য করেছেন বলে জানি না, কিন্তু *মেঘনাদবধ কাব্য*-কে তাঁর কৈশোরকালের সমালোচনায় পছন্দ করেন নি। তাঁর শৈশবেই বেরিয়েছিল *দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা* এবং *মৃণালিনী*। এদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সোজাসুজি মন্তব্য না থাকলেও পরে তিনি এই শ্রেণির রোমান্স সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠ হতে পারেন নি। অথচ জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে তাঁর প্রথম রচনায় এর প্রভাব পড়েছিল। ১৮৭৮-এর আগেই তিনি লেখেন *বনফুল* নামে গাথাকাব্য। তাতে কমলা চরিত্রের মূলে ছিল কপালকুণ্ডলার প্রভাব :

> বিবাহ কাহাকে বলে জানি না তো আমি
> বহিল কমলা তবে বিপিন কামিনী
> কারে বলে পত্নী আর কারে বলে স্বামী
> কারে বলে ভালোবাসা আজও চিনি নি।

*বনফুল* কাব্যের বারো-তেরো বছর পূর্বে বেরিয়েছে হেমচন্দ্রের *বীরবাহু কাব্য* এবং *চিন্তাতরঙ্গিণী*। রবীন্দ্রনাথ এদের সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করেন নি। কিন্তু *কবিকাহিনী*-তে তার ছায়াও দেখতে পাওয়া যাবে। বলা বাহুল্য কৈশোর কালের এই সব রচনাকে কবি পরে স্বীকার করতে চান নি। কিন্তু এরই মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তাটি তৈরি হয়ে উঠেছিল। সেকালের সম্ভাব্য কবিদের মতো তিনিও *বনফুল, কবিকাহিনী* প্রভৃতি গাথাকাব্য লিখেছেন। তাতে আবেগ ছিল, উচ্ছ্বাস ছিল, নাটকীয়তা ছিল। অথচ এ সব যে তাঁর একেবারেই পছন্দ ছিল না, এটা বোঝা যায় বিহারীলাল সম্পর্কে তাঁর আলোচনায় :

> বিহারীলাল তখনকার ইংরেজিভাষায় নব্যশিক্ষিত কবিদিগের ন্যায় যুদ্ধবর্ণনাসঙ্কুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না, এবং পুরাতন কবিদিগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না— তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন। তাঁহার সেই স্বগত উক্তিতে বিশ্বহিত দেশহিত অথবা সভামনোরঞ্জনের কোনো উদ্দেশ্য দেখা গেল না।

রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, কাব্যে তিনি এই সব বিষয় পছন্দ করেন না। কবি আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁর আপন মনের নিভৃত অনুভূতিকে ভাষা দেবেন— তাতেই কবিতা হবে রসে পূর্ণ। বিহারীলাল সেই নিভৃতচারী কবি। তাই রবীন্দ্রনাথকে তিনি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। আবার এইজন্যই তিনি সেকালের বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে ছিলেন উপেক্ষিত। তখনকার পাঠক হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রর কাহিনিকাব্যে দেশানুরাগ ও যুদ্ধবর্ণনার উদ্দামতাতেই মুগ্ধ ছিল। *বঙ্গদর্শন*-এর মতো পত্রিকাতে হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র এবং তাঁদের অনুগামী কবিরাই ছিলেন সমাদৃত।

প্রচলিত রীতিকে অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথ যখন কবিতা লেখা শুরু করলেন, তখন তিনি অন্তর্লোকের ভাব প্রকাশের কাব্য নয়, বক্তব্যপ্রধান সর্বজনবোধ্য কবিতা লেখা দিয়েই আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর 'হিন্দুমেলায় উপহার' (১৮৭৫), 'অভিলাষ' (১৮৭৪), 'প্রকৃতির খেদ' (১৮৭৫) কবিতাগুলি প্রথম কাব্যপ্রয়াস। সে সব কবিতার বিষয় এবং ছন্দ হেমচন্দ্রেরই অনুবর্তন করেছিল। বিষয় ছিল ভারতবর্ষের অতীত গৌরব ও বর্তমানকালে তার পতন। তারপর তিনি লিখলেন *বনফুল* ও *কবিকাহিনী*। এই দুটি কাব্যই আখ্যানাশ্রিত। সে সময়ে তিনি দেখেছিলেন আখ্যানকাব্যের চর্চা। তাঁদের পারিবারিক বন্ধু অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর *উদাসিনী* কাব্যখানি রবীন্দ্রনাথের সম্মুখেই ছিল। এ সব কাব্য মন্ময় বা আত্মগত কাব্য নয়। হেমচন্দ্রের *চিন্তাতরঙ্গিণী* কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬১-তে। তার প্রভাব পড়েছিল *কবিকাহিনী*-তে। সমাজজীবন থেকে প্রকৃতির রাজ্যে গিয়ে শান্তি পায় বায়রনের নায়ক মানফ্রেড, আর রবীন্দ্রনাথের নায়কেরাও যেন মানুষের সমাজ বর্জন করে হিমালয়ের অরণ্যে ঘুরে বেড়ায়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যজীবনের ঊষাকালে সমকালীন সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত হবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এগুলি তাঁর সৃষ্টিতে স্থায়ী হয় নি। তাঁর নিজস্ব প্রকৃতি কিছুদিনের মধ্যেই আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ খুঁজে নিল। তাঁর *শৈশবসঙ্গীত*-এর কবিতাতেই আর এক ভিন্ন সুর শোনা গেল। পুস্তকাকারে পরে প্রকাশিত হলেও এর কবিতা আরও কয়েক বছর আগেই লেখা হয়েছিল। তাতে ছিল কিশোর-কবির রূপমুগ্ধতা, আনন্দ ও বিস্ময়। *সন্ধ্যাসঙ্গীত*-এ (১৮৮২) তার পূর্ণতা। *কড়ি* ও *কোমল* প্রকাশিত হল তার চার বছর পরে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাগ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন :

> তখন হেম বাঁড়ুজ্জে এবং নবীন সেন ছাড়া এমন কোনো দেশপ্রসিদ্ধ কবি ছিলেন না যাঁরা কবিদের কোনো একটা কাব্যরীতির বাঁধাপথে চালনা করতে পারতেন। কিন্তু আমি তাঁদের সম্পূর্ণই ভুলে ছিলুম। আমাদের পরিবারের বন্ধু কবি বিহারীলালকে ছেলেবেলা থেকে জানতুম এবং তাঁর কবিতার প্রতি অনুরাগ আমার ছিল অভ্যস্ত।

এই কথা বলেও তিনি বললেন, 'তাঁর প্রবর্তিত কবিতার রীতি ইতিপূর্বেই আমার রচনা থেকে সম্পূর্ণ স্খলিত হয়ে গিয়েছিল।' কথাটা একটু বিশেষ অর্থেই নিতে হবে। 'কবিতার রীতি' বলতে তিনি কবিতার বহিরঙ্গ রীতিকেই বুঝিয়েছেন নিশ্চয়। কিন্তু বহিরঙ্গ রীতি বলতে ছন্দকেও বোঝায়। বিহারীলালের *বঙ্গসুন্দরী* কাব্যের :

> **সুঠাম** শরীর পেলব লতিকা
> আনত সুষমা কুসুম ভারে,
> চাঁচর চিকুর নীরদ মালিকা
> লুটায়ে পড়েছে ধরণী-পরে।

এই ছন্দকে বলেছেন তিনমাত্রামূলক এবং এই ছন্দের ধ্বনিসংগীত তাকে বিশেষ মুগ্ধ করেছিল। 'এ ছন্দ নারীবন্দনার উপযুক্ত বটে— দুহাতে তালে তালে নূপুর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে' কিন্তু এ ছন্দের প্রধান অসুবিধা এই যে, 'ইহাতে যুক্ত অক্ষরের স্থান নাই।' আসলে এর এক একটি পর্ব ছয় মাত্রা। প্রত্যেক পর্ব তিন মাত্রায় বিভক্ত। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথই দেখিয়েছিলেন এই ছন্দে যুক্তাক্ষরের পূর্ব অক্ষরকে দুই মাত্রা ধরতে হয়। বিহারীলাল তখনও পর্যন্ত এই প্রকৃতি স্থির করতে পারেন নি। তাই এই ছন্দে যুক্তাক্ষরকে একমাত্রা ধরে ছন্দোদুষ্ট পর্ব রচনা করেছিলেন যেমন 'অপ্সরী কিন্নরী দাঁড়াইয়ে তীরে ধরিয়ে ললিত করুণাতান।' এখানে 'অপ্সরী কিন্নরী'কে ছয়মাত্রা ধরায় ছন্দোভঙ্গ হয়েছে। *মানসী* কাব্যে রবীন্দ্রনাথ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যুক্তাক্ষরের এই প্রকৃতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন। *বঙ্গসুন্দরী, সারদামঙ্গল, সাধের আসন* কাব্যের রীতি তিনি পরে অনুসরণ করেন নি, কিন্তু নারী-প্রতিমা রূপে সৌন্দর্যের ধ্যানে, নিসর্গ সৌন্দর্যে মগ্নতায় যে অভিনব রসসৃষ্টির আয়োজন ছিল রবীন্দ্রনাথে পরে তাই পূর্ণ বিকাশ লাভ করেছে। বিহারীলালের ওই সৌন্দর্যপ্রীতি রবীন্দ্রনাথের *সন্ধ্যাসঙ্গীত*-এ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আর তা বিস্ময়কর কাব্যরূপ লাভ করেছে *মানসী, চিত্রা*-য়, *সোনার তরী*-তে। তখন আর তা হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের কবিতার ছায়ামাত্র নেই। উনিশ শতকের বস্তুগত কবিতা লেখার রীতি রবীন্দ্রনাথের কাব্য থেকে সম্পূর্ণই চলে গেল। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি লক্ষ করলে দেখা যাবে উনিশ শতকে দুটি ধারা তৈরি হয়েছিল।* হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র বাংলা কবিতার যে আদর্শ ছিলেন সেটাই সেকালে একমাত্র আদর্শ ছিল না, যদিও তাঁদের বহু অনুগামী দেখা দিয়েছিল। দ্বিতীয় আদর্শের আদি কবি প্রথমে অপেক্ষাকৃত অপরিচিত থাকলেও বিহারীলাল যে আত্মগত ও সৌন্দর্যের কবিতা লিখছিলেন ১৮৮০-র সময় থেকে সে ধারাও ক্রমে বেগ সঞ্চয় করে। অক্ষয়কুমার বড়াল এবং দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবিতা এ সময় থেকেই প্রকাশিত হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ *সোনার তরী* কাব্যখানি 'কবিভ্রাতা' দেবেন্দ্রনাথ সেনকেই উৎসর্গ করেছিলেন।

---

* এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যাবে আমার *কাব্যবাণী*-র 'কাব্যে দুই রীতি' অধ্যায়ে।

আবার রবীন্দ্রনাথের *বাল্মীকি-প্রতিভা* ও *সন্ধ্যাসঙ্গীত*-এর প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৮৮১ এবং ১৮৮২। রবীন্দ্রনাথ ক্রমেই নিজস্ব কাব্যরীতিতে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিলেন। অবশেষে রবীন্দ্রনাথ মুক্তকণ্ঠেই ঘোষণা করলেন :

আমি নাবব মহাকাব্য
সংরচনে
ছিল মনে—
ঠেকল কখন তোমার কাঁকন
কিঙ্কিনীতে
কল্পনাটি গেল ফাটি
হাজার গীতে।

শুধু কবিতার ক্ষেত্রে নয়, উনিশ শতকের নাটকীয় ঘটনা ও নীতিউপদেশ-পূর্ণ উপন্যাস গল্প লেখার রীতিও তিনি পছন্দ করতেন না। ১৮৮৮-তে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা চিঠিতেও তিনি সে কথা লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধুকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, বাংলার পল্লীর শান্ত স্নিগ্ধ ঘটনাবিরল জীবন নিয়ে উপন্যাস লিখতে। নাটকীয়তা উদ্দামতা ইত্যাদি বাঙালি-জীবনের প্রকৃতির সংগত নয়। য়ুরোপীয় সাহিত্যের অনুকরণে শান্ত নিরুদ্দেশ জীবনে এ ধরনের ঘটনা কল্পনা করলে সেটা স্বাভাবিক হয় না। *জীবনস্মৃতি*-র 'ভগ্নহৃদয়' অধ্যায়ে তিনি লিখেছিলেন :

> য়ুরোপীয় চিত্তের এই চাঞ্চল্য, এই নিয়মবন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সেখানকার ইতিহাস হইতেই সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তাহার অন্তরে বাহিরে একটা মিল ছিল। সেখানে সত্যই ঝড় উঠিয়াছিল বলিয়া ঝড়ের গর্জন শুনা গিয়াছিল। আমাদের সমাজে যে অল্প একটু হাওয়া দিয়াছিল তাহার সত্য সুরটি মর্মরধ্বনির উপরে চড়িতে চায় না— কিন্তু সেটুকুতে তো আমাদের মন তৃপ্তি মানিতেছিল না। এইজন্য আমরা ঝড়ের ডাকের নকল কবিতে গিয়া নিজের প্রতি জবরদস্তি করিয়া অতিশয়োক্তির দিকে যাইতেছিলাম।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের এই প্রবণতার দিকপরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন তাঁর কবিতার মতো ছোটোগল্প লিখেও। উনিশ শতকের শেষ দশকে *সাধনা* পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের অবিস্মরণীয় গল্পগুলি প্রকাশিত হতে থাকল। ছোটোগল্প লেখায় রবীন্দ্রনাথ যে বাংলা সাহিত্যের কোনো পূর্বসূরী পেয়েছিলেন, তা সেভাবে বলা যায় না। স্বর্ণকুমারী দেবী বা পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কোনো কোনো কাহিনিতে ছোটোগল্পের সূচনা লক্ষ করে থাকেন ঐতিহাসিকেরা। কিন্তু সেগুলি বর্তমান প্রসঙ্গে ধর্তব্যের মধ্যে নয়। যে কথাটা বিশেষভাবে মনে হয়, সেটা এই যে রবীন্দ্রনাথের লিরিক প্রতিভারই একটা বিকাশ যেন তাঁর ছোটোগল্পগুলি।

ছোটোগল্পে না হলেও উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথকে উনিশ শতকের প্রথাকে মেনে নিতে হয়েছে। তাঁর *বউঠাকুরাণীর হাট* (১৮৮৩) এবং *রাজর্ষি*-তে (১৮৮৭) উনিশ শতকের প্রবণতার চিহ্ন আছে। প্রথম উপন্যাসটির কথাবস্তু তিনি সংগ্রহ করেছিলেন যশোহরের ইতিহাস থেকে। প্রতাপচন্দ্র ঘোষের *বঙ্গাধিপ পরাজয়* উপন্যাস যশোহরের ইতিহাস অবলম্বনেই লেখা। দ্বিতীয় উপন্যাসের প্লট তিনি পেয়েছিলেন ত্রিপুরার ইতিহাস থেকে। ইতিহাস থেকে প্লট সংগ্রহ করার কারণ কী? সেকালের স্কটের উপন্যাসেই তার আদর্শ ছিল। অতীত থেকে সংগৃহীত কাহিনি নিয়ে আসত নানা কাল্পনিক পরিতৃপ্তি। এ সব কাহিনিতে চরিত্রগুলি চালিত হত হৃদয়াবেগে এবং নানা কল্পিত ঘটনার মধ্যে দিয়ে। চরিত্রের কর্মে ও আচরণে প্রকাশ পেত একদিকে মহৎ অথবা অসাধারণ প্রবৃত্তি অন্যদিকে লোভ হিংসা প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রবৃত্তি। চরিত্রগুলি মোটা রেখায় আঁকা হত। এই আদর্শের অনুসরণে আমাদের সেকালের রোমান্সের সৃষ্টি। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের *অঙ্গুরীয় বিনিময়*, প্রতাপচন্দ্র ঘোষের *বঙ্গাধিপ পরাজয়*, স্বর্ণকুমারীর *দীপ নির্বাণ*, বঙ্কিমচন্দ্রের *দুর্গেশনন্দিনী*, রমেশচন্দ্র দত্তর *মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত*— সবারই ছিল একই প্রকৃতি। এরই ভিতর দিয়ে গড়ে উঠছিল বাংলা উপন্যাসের শিল্পরূপ। বিলাতি উপন্যাস থেকে প্লটের আদর্শ এসেছে। উপন্যাসে প্লটরচনার কৌশলই সমগ্র কাহিনিকে বিশিষ্ট রূপ দেয়— স্কটের থেকে

এই ইঙ্গিত আমরা পেয়েছিলাম। কার্যকারণসূত্রে গাঁথা ঘটনার ধারা অনাবশ্যকতার বাহুল্যবর্জিত হয়ে নিটোল হয়ে ওঠে। এই প্লটকে বঙ্কিমচন্দ্র নাট্যগুণান্বিত করে তুললেন, অর্থাৎ একমুখী গতি সঞ্চার করে কাহিনিতে গতি নিয়ে এলেন আর তার নিয়ামক হল যথার্থ অর্থে নায়ক। এর ফলে উপন্যাস পরিমিত রূপ লাভ করল। লেখকের নিজস্ব মন্তব্য যথাসম্ভব কমে গেল। কাহিনি হল বিবরণাত্মক। তাতে মনোবিশ্লেষণ নেই, দীর্ঘ পারিপার্শ্বিক বর্ণনা নেই। পাঠককে সম্বোধন করে মাঝে মাঝে লেখকের দু-একটি মন্তব্য মাত্র থাকত। উপন্যাসের আকর্ষকতা প্রধানত নির্ভর করত প্লটের উপর।

বাংলা উপন্যাসে প্লটের প্রাধান্য স্থাপিত হল। আবার অন্যদিক দিয়ে পরে এর চরিত্রেরও পরিবর্তন এল। সকলেই জানেন বিশ শতকের গোড়াতে *চোখের বালি*-তে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের নতুন রীতি প্রবর্তন করলেন। উপন্যাস লিখতে গিয়ে ইতিহাসের কাছে প্লটের জন্য হাত পাতলেন না। তিনি লিখলেন আমাদের সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবনের মনের ঘাতপ্রতিঘাতের কাহিনি। এতে পাঠককে আকর্ষণ করতে পারে, এমন কী থাকতে পারে? আমাদের নিত্যকার সাধারণ শহুরে জীবনকে সাধারণ মনে করলেও তার মধ্যে যে বিভিন্ন ভাবের সংঘাত ঘটতে পারে, সে রকম সংঘাত যে বঙ্কিম দেখান নি, তা নয়। *বিষবৃক্ষ*-এর নগেন্দ্রনাথ বা কুন্দের মধ্যে দ্বিধাসংশয় ছিল না তা নয়। কিন্তু বঙ্কিম তার সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ করেন নি। সেকালের উপন্যাসে চরিত্র কতকগুলি সুনির্দিষ্ট চারিত্রিক গুণ বা দোষ নিয়ে গড়ে উঠত। তার বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না। *চোখের বালি*-র বিনোদিনীর সঙ্গে *বিষবৃক্ষ*-র কুন্দের তুলনা করলেই বোঝা যায় বিনোদিনীর চরিত্র কত স্পষ্ট অস্পষ্ট ভাবের সংঘাতে, কত সংশয় দ্বিধার দোলায়, কত সচেতন অসচেতন প্রবৃত্তির বিচিত্র লীলায় দোলায়িত। এর পরের উপন্যাস *গোরা*-তেও রবীন্দ্রনাথ চরিত্রের সূক্ষ্মতর দিকগুলি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। শুধু তাই নয়, *গোরা*-তে রবীন্দ্রনাথ বাংলার ভবিষ্যৎ উপন্যাসের মহৎ সম্ভাবনার পথ প্রস্তুত করলেন। এই উপন্যাসে শুধু যে সমকালের সমাজ রাষ্ট্র ধর্মকে এঁকে দিলেন, তা নয়। লেখক হিসাবে তাঁর বক্তব্যকে প্রাধান্য দিলেন। উপন্যাস কেবল মানব-হৃদয়ের বিষয় নয়। উপন্যাস প্রকাশ করে লেখকের সমাজ ধর্ম রাষ্ট্র ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্যকেও। *গোরা*-তে ভারতবর্ষীয় সমাজজীবনের এক নিজস্ব ব্যাখ্যা তিনি দিলেন। এটা উপন্যাসের রূপরীতিতে পরিবর্তন নিয়ে এল।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের দুটি উপন্যাস *বউঠাকুরানীর হাট* এবং *রাজর্ষি*-তে উনিশ শতকের সাহিত্য-প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ থাকলেও পরবর্তী রবীন্দ্রনাথের আভাসও তাতে ছিল। দুই উপন্যাসেই চরিত্রসৃষ্টি এমন যে, তাতে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের ছায়াপাত হয়েছে। বসন্ত রায় যেন ভাবী ঠাকুর্দারই পূর্বগামী ছায়া, আবার *রাজর্ষি*-র গোবিন্দমাণিক্য চরিত্রটিও রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব রাজা কল্পনা— এটা কোনো বাস্তব রাজা নয়। এই প্রসঙ্গে একটা তুলনা মনে আসে। বঙ্কিমচন্দ্রে সীতারামের ট্র্যাজেডি আর *রাজা ও রানী*-র ট্র্যাজেডিতে বিয়োগান্তিক পরিণামের কারণ কী? সীতারাম আর শ্রীর পরস্পরকে কাছে পাওয়ার ব্যাকুলতা সত্ত্বেও মিলন হল না কেন। সে ছিল তৃতীয় একটি বাধা— জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎবাণী। *রাজা ও রানী*-তে বিক্রম আর সুমিত্রার মিলন হল না সুমিত্রার কল্পিত আদর্শের সঙ্গে বাস্তব স্বামীর মিল নেই বলে। একটায় বাধা বাস্তবগত আর একটায় ভাবগত। ট্র্যাজেডির এই রূপ বঙ্কিমের নয়। বঙ্কিমের সীতারাম মবারক প্রতাপের বিয়োগান্তিক পরিণাম শেক্সপিয়রের ট্র্যাজেডির নায়কের মতোই বাস্তব অবস্থার পরিণতি।

এই সূত্রেই বলতে হবে উনিশ শতকের বাংলা নাটকের রূপ ছিল ইংরেজি নাটকেরই অনুসরণ। তার পঞ্চাঙ্ক নাট্যরূপে ছিল তারই উপযোগী ঘটনাধারা। রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিকের নাটকে এই রূপটিকে অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর নাটকের ফর্ম *প্রায়শ্চিত্ত* (১৯০৯) পর্যন্ত উনিশ শতকের নাটককেই অনুসরণ করেছে। *বিসর্জন* (১৮৯০) ও *রাজা ও রানী*-তে (১৮৮৯) তিনি সেই ইতিহাসকে পুরোপুরি রক্ষা করেছেন। ১৮৯৬-তে *কাব্যগ্রন্থাবলী*-তে অন্তর্ভুক্ত *মালিনী* নাটকেও ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের মনের তত্ত্বকথাটি নাটকের ঘটনাধারায় প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

শেক্‌সপিয়রের নাটক আমাদের কাছে বরাবর নাটকের আদর্শ। তার বহুশাখায়িত বৈচিত্র্য, ব্যাপ্তি ও ঘাত-প্রতিঘাত প্রথম থেকেই আমাদের মনকে অধিকার করেছে। *মালিনী*-র নাট্যরূপ সংযত সংহত এবং দেশকালের ধারায় অবিচ্ছিন্ন। এর বাহিরের রূপায়ণ সম্বন্ধে যে মত শুনেছিলাম এ হচ্ছে তাই। কবিতার মর্মকথাটি প্রথম থেকেই যদি রচনার মধ্যে জেনেশুনে বপন করা না হয়ে থাকে তবে কবির কাছেও সেটা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে দেরি লাগে, আজ আমি জানি মালিনীর মধ্যে কী কথাটি লিখতে লিখতে উদ্ভাবিত হয়ে ছিল গৌণরূপে ঈষৎ গোচর। আসল কথা, মনের একটা সত্যকার বিস্ময়ের আলোড়ন ওর মধ্যে দেখা দিয়েছে। (রচনাবলী-র বিশ্বভারতী সংস্করণের ভূমিকা।)

যে কথাটি রবীন্দ্রনাথ *মালিনী* নাটকে সচেতনভাবে উপলব্ধি করে লেখেন নি, সেই কথাটি *প্রায়শ্চিত্ত* নাটকে দেখা দিল চরিত্ররূপে। ধনঞ্জয় চরিত্রটিতে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। বিশ শতকের রবীন্দ্রনাট্য উনিশ শতকের নাট্যরীতি থেকে সম্পূর্ণই ভিন্ন হয়ে গেল। সাংকেতিক নাটক, রূপক নাটক, ঋতু নাটক সম্পূর্ণতই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। পুরাণের কাহিনি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কখনও নাটক লেখেন নি। তবে পুরাণ না হলেও সংস্কৃত সাহিত্যের পরিবেশ তাঁর নাটকেরও পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।* তবে সেই পরিবেশটিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্যের সহায়ক রূপে তৈরি করে তুলেছেন। সেকালে যাঁরা পৌরাণিক নাটক লিখতেন, তাঁরা রাজা রাণী ভক্ত সন্ন্যাসী জনসাধারণ সবাইকে এনেছেন কাহিনির প্রয়োজনে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ *শারদোৎসব*, *রাজা*, *ডাকঘর*, *অচলায়তন*, *রক্তকরবী*, *মুক্তধারা* নাটকে রাজা মহিষী প্রজা প্রভৃতি সংস্কৃত নাটকের চরিত্রগুলিকে নিজস্ব অর্থে পুনর্নির্মাণ করেছেন। তাঁর প্রথম দিকের তিনটি নাটক *রাজা ও রাণী*, *বিসর্জন*, *মালিনী*-তে পরিবেশ সেই প্রাচীনকালের এবং তাতে রূপকাভাসও নেই। এই তিনটি নাটকই রচিত হয়েছিল উনিশ শতকের শেষে প্রচলিত ধারায়, যদিও তারই মধ্যে ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব অভিপ্রায়টিও।

১৮৭২ সালে প্রকাশিত *বঙ্গদর্শন* পত্রিকা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব সুজ্ঞাত। *বঙ্গদর্শন* কিন্তু বেশিদিন চলে নি। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন পনেরো বছর তখনই *বঙ্গদর্শন*-এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। আর তার পরেই আত্মপ্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথের পরিবারের *ভারতী* পত্রিকা। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এর সম্পাদক। এই পত্রিকাতেই তরুণ রবীন্দ্রনাথের *য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র*, *কুমারসম্ভব*-এর অনুবাদ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ *ভারতী*-র কথা তত বলতেন না। *বঙ্গদর্শন*-এর প্রবল প্রভাবের কথাই পরে একাধিক প্রসঙ্গে বলেছেন, *বঙ্গদর্শন* বাঙালি চেতনার জন্মান্তর ঘটাল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ ভাষণে যে সার্বভৌম মানবিক মুল্যবোধের কথা বলেছেন। *বঙ্গদর্শন*-এর চিন্তামূলক প্রবন্ধগুলির মধ্যেই তার প্রকাশ ঘটে। *সাম্য*, 'দেশের শ্রীবৃদ্ধি', 'ভারত-কলঙ্ক', 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা', 'ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে' ইত্যাদি যুক্তিমূলক মানবমূল্যবোধক প্রবন্ধগুলি *বঙ্গদর্শন*-এ প্রকাশিত হয়ে আমাদের চিন্তাপদ্ধতিতে যুগান্তর নিয়ে এল। *বঙ্গদর্শন* বাঙালির চেতনার জন্মান্তর ঘটাল। অথচ *বঙ্গদর্শন*-এ প্রকাশিত কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কোনো আগ্রহ ছিল না। তাঁর আগ্রহ ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে এবং তাতে প্রকাশিত চিন্তামূলক প্রবন্ধগুলিতে। আমাদের ইতিহাসবোধ, সমাজবোধ, সাহিত্যবোধ— সবকিছুরই সূচনা ছিল *বঙ্গদর্শন*-এ— রবীন্দ্রনাথ সে কথা স্বীকার করতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি। তিনি মুখর ছিলেন বঙ্কিমের স্বাধীন যুক্তিবোধনে, প্রাচীন আদর্শকে অন্ধের মতো গ্রহণ করে না নিয়ে যুক্তি দিয়ে বিচার করার সার্থক প্রয়াসে। আর বঙ্কিমের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল ভারতের ঐতিহ্যে ধর্মসংস্কৃতিতে যার থেকে আধুনিক জীবনের মূল্যমান গড়ে নেওয়া সম্ভব ছিল।

রবীন্দ্রনাথ সেভাবে ব্যাখ্যা করেন নি কিন্তু স্পষ্টতই দেখেছিলেন সেকালের য়ুরোপীয় চিন্তার প্রভাব বাঙালির মনে এসে পড়েছিল। নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা সেকালের ইংরেজি শিক্ষার সহায়তায় ছড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু এই শিক্ষালব্ধ সম্পদকে যে সাধারণ জনসমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে, এটা

* এই প্রসঙ্গটির বিস্তৃত আলোচনা আছে আমার 'রবীন্দ্রনাটকের পূর্বসূত্র' প্রবন্ধে। দ্রষ্টব্য *রবীন্দ্রসাহিত্য প্রসঙ্গ*, ১৯৮৭। প্রবন্ধটি পরে *বিশ্বভারতী পত্রিকা প্রবন্ধ সঙ্কলনে* পুনঃসংকলিত হয়েছে।

বঙ্কিমের মতোই রবীন্দ্রনাথও ভেবেছিলেন। 'বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায়' 'লোকশিক্ষা' প্রবন্ধে বঙ্কিম খুব স্পষ্ট করেই বলেছিলেন সে কথা। এই ভাবনাটি রবীন্দ্রনাথের ছিল বলেই তিনি মাতৃভাষার সাহায্য শিক্ষাদানের কথা খুব জোরের সঙ্গেই চিরকাল বলে এসেছেন। এ বিষয়ে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'শিক্ষার হেরফের' (১৮৯২) *সাধনা*-তে বেরিয়েছিল। প্রবন্ধটি পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লেখেন। তিনি বলেন, প্রবন্ধটি দুবার পড়েছেন এবং 'প্রতিছত্রে আপনার সঙ্গে আমার মতের ঐক্য আছে।' মাতৃভাষার মধ্য দিয়েই যুক্তিবিচার করে আধুনিক বিশ্বকে জানতে হবে, এ বিষয়ে বঙ্কিমের মতো রবীন্দ্রনাথের মনেও কোনো সন্দেহ ছিল না।

জীবনমূল্যমান নিয়ে যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল উনিশ শতকে, তার দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে সেকালের সাময়িকপত্রের অজস্র প্রবন্ধে। বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ভাবুক ভারতবর্ষীয় সমাজজীবন ইতিহাসের আলোচনা করে আমাদের আদর্শ নির্দিষ্ট করে দেবার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের *সমাজ* বইয়ের প্রবন্ধগুলি এই সময়েই লেখা। এ সব আলোচনার মূল বিষয়, পশ্চিমি সভ্যতার ফলে আমাদের বহুকালাগত প্রাচীন সমাজের যে পরিবর্তন আসছিল তারই প্রকৃতি নির্ণয়। উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে এমন পত্রিকাও প্রকাশিত হয়েছে, যেগুলি দেশের ঐতিহ্যগর্বে জড় ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যই ব্যস্ত হয়েছে। প্রাচীনের প্রতি অন্ধ অনুরাগী ছিলেন কোনো কোনো ভাবুক, আবার পরিবর্তনকে স্বীকার করেও একটি সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলবার কথাও বলেছেন কেউ কেউ। দ্বিজেন্দ্রনাথ-সম্পাদিত *ভারতী*-তে রবীন্দ্রনাথের *য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র* প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে ইংরেজ সমাজের সঙ্গে তুলনায় ভারতীয় সমাজের রক্ষণশীলতার সমালোচনা ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদকীয় মন্তব্যে তার কিছু কিছু সমালোচনাও করেছিলেন। পরে *য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি*-তে রবীন্দ্রনাথ *য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র* যোগ করেন নি। দুই সমাজের তুলনাত্মক কথা তাতেও ছিল। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, বিবেকানন্দের *ভাববার কথা* এবং 'বিলাতযাত্রীর পত্র'। দুই-ই *উদ্বোধন* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তারপর প্রকাশিত হয় *প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য*। দুজনেরই লেখার উপলক্ষ ছিল পাশ্চাত্য জীবনযাত্রার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। দুজনেই দেখেছেন ভারতবর্ষের শান্ত জীবনযাত্রায় পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিঘাত। রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপের কর্মচঞ্চল সভ্যতার সঙ্গে ভারতবর্ষের নিরুদ্যম অতীত স্বপ্নমগ্ন স্থিতিশীল সভ্যতার তুলনা করেছেন। বিবেকানন্দ বলছেন, হিন্দুদের প্রাচীনত্বের অভিমানে বর্তমানকে উপেক্ষা করে চলতে গেলে জাতি হিসাবে মৃত্যু ঘটবে।

রবীন্দ্রনাথ *বঙ্গদর্শন*-এর নবপর্যায় সম্পাদনা আরম্ভ করলেন ১৯০১-এ। তিনি বঙ্কিমের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছিলেন, স্বাভাবিক কারণে আদি *বঙ্গদর্শন*-এর দৃষ্টিভঙ্গি এবং নবপর্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছু পার্থক্য ঘটবেই। তথাপি বঙ্কিমের দ্বারা তিনি কতখানি উজ্জীবিত ছিলেন সেটা বোঝা যায় ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধায়। বঙ্কিমের মতো তাঁর এ সময়ের জাতীয়তাবোধেও ঐতিহ্যগর্ব ছিল। তিনি অবশ্য বাঙালির ঐতিহ্যের কথা সেভাবে বলেন নি। তিনি বলেছিলেন প্রাচীন ভারতবর্ষের কথা, উপনিষদের কথা, তার ধ্যানপরায়ণ উদার সত্যানুভূতির কথা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্মসাধনা রবীন্দ্রনাথের চিন্তয় ও সৃষ্টিতে বিশেষ রূপ লাভ করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল পৌরাণিক ভারতের কর্মময় জীবন-সাধনার প্রতি অনুরাগ। রবীন্দ্রনাথ তখন আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক। ইতিপূর্বে তাঁর বেরিয়েছে *ব্রহ্মোপনিষদ* (১৯০০), *ব্রাহ্মমন্ত্র* (১৯০১) এবং *ঔপনিষদ ব্রহ্ম* (১৯০১)। তাঁর এ সময়ের চিন্তাধারায় স্বভাবতই মিলে গিয়েছে ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ভারতীয় ইতিহাসের গতিপ্রকৃতির ধারণা। নবপর্যায়ে *বঙ্গদর্শন*-এর সম্পাদনাকালে তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস ব্যাখ্যা করে প্রবন্ধ লিখেছেন, সে রকম ব্যাখ্যা কেউ করে নি। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে নেশন-তত্ত্বের কথা ছিল। ইতিহাসের রাজনৈতিক প্রকৃতি মুখ্য হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ নবপর্যায় *বঙ্গদর্শন*-এ নেশন-তত্ত্ব নিয়ে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি নেশনের রাষ্ট্রগত ব্যাখ্যা করতে চান নি। ভারতবর্ষে সেই অর্থে নেশন হবে—

এমনও ভাবেন নি। তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস ব্যাখ্যা করে দেখালেন, ইতিহাস সবদেশেই যে একরকম হবে এমন কথা মানা যায় না। ভারতবর্ষে অজস্র বৈচিত্র্য, তাকে রাষ্ট্রীয় অর্থে নেশন-রূপে ভাবা সংগত নয়।

যুরোপে যে ন্যাশনালিজ্‌মের জন্ম হয়েছিল, তারই আদর্শ আমাদের উনিশ শতকের মনীষীদের প্রভাবিত করেছিল। এই ন্যাশনালিজ্‌মের থেকেই আমাদের জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি। বঙ্কিমের রচনা, বিশেষ করে *আনন্দমঠ* এই জাতীয়তাবোধেরই সৃষ্টি। *আনন্দমঠ*-এর মূল ভাবের প্রতিমা দশপ্রহরণধারিণী দেবী। এই জাতীয়তাবোধ দ্বারা উনিশ শতকের শেষ দশক এবং বিশ শতকের প্রথম দশক প্লাবিত হয়ে গেল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে এই জাতীয়তাবাদই ছিল প্রাণশক্তি। রবীন্দ্রনাথও জাতীয়তাবোধে আচ্ছন্ন হলেন। কংগ্রেসের ১৮৯৬-এর অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ 'বন্দে মাতরম্' গানটি গেয়েছিলেন। তিনিই এই গানে সুর দিয়েছিলেন। এ গানে সপ্তকোটি কণ্ঠের কথা আছে। তাই মনে হয় এই মাতা ভারতমাতা নন, বঙ্গমাতা। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় 'বন্দে মাতরম্' গানই গেয়েছেন। আবার তিনি নিজে যে গান রচনা করেছেন, তাতে সোনার বাংলার মাতৃমূর্তিকেও বঙ্কিমি ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন 'ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে বাঁ হাতে করে শঙ্কা হরণ'।

রবীন্দ্রনাথ নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত হয়ে বহু স্বদেশি সংগীত রচনা করলেন; অবশ্য সেগুলি 'বন্দে মাতরমে'র রাজসিক মহিমার গান নয়— একেবারেই সাধারণ বাঙালি জীবনের সঙ্গে সংগতি রেখে দেশাত্মবোধের গান। সেই গানই সেদিন বাঙালিকে উদ্দীপিত করে তুলেছিল। বাঙালি সেদিন বাংলাকে বিভক্ত হতে দেখে অধীর হয়ে উঠেছিল, কিন্তু এ বঙ্গচেতনা যে বৃহত্তর ভারতচেতনাকেই জাগিয়ে তুলছিল, রবীন্দ্রনাথের সে বিশ্বাস ছিল। তাই বঙ্গচেতনার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, ভারতবর্ষের ধর্ম, ভারতবর্ষের ইতিহাসের ভাবনা তাঁর চিত্তকে অধিকার করছিল। এদিকে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করে সেই ভারতবর্ষকে তিনি ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন দেখছিলেন— ব্রহ্মানুভূতিই আমাদের সমগ্র চেতনাকে আশ্রয় করে বিরাজিত থাকবে।

কিন্তু যখন তিনি দেখলেন, দেশের জাগ্রত চেতনা ভিন্ন পথ নিচ্ছে, অসহযোগ ও বিদেশিবর্জন দ্বারা পশ্চিমি জাতীয়তাবোধের অনুকরণ করছে, নিজেকে সংকীর্ণ গণ্ডিতে বদ্ধ করছে, তখন তিনি এ আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ালেন। শুধু তাই নয়, *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে (১৯১৬) 'বন্দে মাতরম্' সংগীতটির প্রভাবজাত জাতীয়বাদকে ধিক্‌কার দিলেন এবং উনিশ শতকের জাগ্রত দেশচেতনাকে তিনি বিশ শতকে বিশ্বচেতনায় পৌঁছে দিলেন।

# শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের সূচনাপর্ব

## পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের জীবনের এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়। এর যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ৭ পৌষ— যে দিনটি, কবির মতে শান্তিনিকেতন-আশ্রমকে সৃষ্টি করেছে এবং এখনও সৃষ্টি করে চলেছে। যত্র বিশ্বং ভবেত্যক নীড়ম্— সেই নীড়, যার পরিচয় আজ বিশ্বভারতীরূপে, তার অঙ্কুরোদ্‌গম হয়েছিল ওই সাতই পৌষে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে। সেকালে যার নাম ছিল বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম, সেই ব্রহ্মচর্যাশ্রমই পরবর্তী-কালের শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়, যা রূপান্তরিত হয়েছে বর্তমানের বিশ্বভারতীতে। এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে রবীন্দ্র-জীবনের যোগ যে কত গভীর, কত নিবিড় তা অবশ্যই স্মরণীয়— কেননা রবীন্দ্রনাথ নিজেই তো স্বীকার করেছেন তাঁর বিদ্যালয় শুধু যে ক্রমশ বড়ো হয়ে উঠেছে তা নয়, তাঁকেও নিয়ে গেছে যুগ থেকে যুগান্তরে, বিদ্যালয়ের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কবিরও ঘটেছে জন্মান্তর।

চল্লিশের ঘরে যখন কবির বয়স তখন তাঁর দিনগুলি কাটছিল পদ্মার বোটে নিভৃত-নির্জন নিবাসে, যেখানে তাঁর প্রতিবেশী ছিল চক্রবাক-দল। সেখানেই তিনি তখন 'ক্ষণিকের গান' রচনায় মগ্ন। কবি বলেছেন, হয়তো চিরকাল সেইভাবেই তিনি কাটাতে পারতেন, কিন্তু তা বোধহয় ভবিতব্য নয়। মন তাঁর হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে উঠল, চিরপরিচিত ভাবের জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে কবি প্রবেশ করতে চাইলেন কর্মের জগতে। শিলাইদহের পদ্মাতীরে নৌকাবাসে সাহিত্যসাধনায় নিমগ্ন কবি যেন অন্তরে শুনতে পেলেন শান্তিনিকেতনের রৌদ্রদগ্ধ মরুপ্রান্তরের আহ্বান। 'আমার প্রভু আমাকে তাঁর দেউড়িতে কেবলমাত্র বাঁশি বাজাবার ভার দেন নি— শুধু কবিতার মালা গাঁথিয়ে তিনি আমাকে ছুটি দিলেন না। আমার যৌবন যখন পার হয়ে গেল, আমার চুল যখন পাকল, তখন তাঁর অঙ্গনে আমার তলব পড়ল। সেখানে তিনি শিশুদের মা হয়ে বসে আছেন। তিনি আমাকে হেসে বললেন, ওরে পুত্র, এতদিন তুই তো কোনো কাজেই লাগলি নে, কেবল কথাই গেঁথে বেড়ালি। বয়স গেল, এখন যে, কয়টা দিন বাকি আছে, এই শিশুদের সেবা কর।'

শান্তিনিকেতনের অবারিত আকাশের নিচে রবীন্দ্রনাথ সেদিন খুঁজে পেলেন তাঁর সেবার ক্ষেত্র। আর তখনই সূচনা হল কবিজীবনের এক নতুন অধ্যায়ের। এ যুগের কবিগুরু বসলেন এক নতুন আসনে, সে আসন হল শিক্ষাগুরুর। প্রচলিত শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে কবির অসন্তোষ বহুদিনের— বাল্যের তিক্ত অভিজ্ঞতা সেই অসন্তোষের অন্যতম কারণ। তাই বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা তাঁর চিন্তার জগৎকে অনেকখানি জুড়েছিল। অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে তাঁর মনে এই কথাটি বাসা বেঁধেছিল যে, ছেলেদের মানুষ করে তোলবার জন্য যে একটা যন্ত্র তৈরি হয়েছে— যার নাম ইস্কুল— সেটার ভিতর দিয়ে মানবশিশুর শিক্ষার সম্পূর্ণতা হতেই পারে না। সেই সম্পূর্ণতা তিনি খুঁজতে চেয়েছিলেন আশ্রমে, যেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে সমগ্রজীবনের সজীব ভূমিকা। 'দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষা সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে যে মতটি সক্রিয় ছিল মোটের উপর সেটি হচ্ছে এই যে, শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ, চলবে তার সঙ্গে এক তালে এক সুরে, সেটা ক্লাস নামধারী খাঁচার জিনিস হবে না। যে-শিক্ষাতত্ত্বকে আমি শ্রদ্ধা করি তার

ভূমিকা হল এইখানে। এতে যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন ছিল, কেননা এর ফল অনভ্যস্ত এবং চরম ফল অ-পরীক্ষিত।'

তাই কবির অন্তরে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বাসনা একদিনে সৃষ্টি হয় নি। 'He wanted for his own self-development as man and poet a vaster field of intimate human contact and collective movement. He wanted to transcend his individual limits and find his world.' (*Rabindranath's Educational Philosophy and Experiment* by Sunil Chandra Sarkar.) একদিকে যখন তিনি এইভাবে নিজেকে প্রকাশের সুযোগের সন্ধান করছিলেন, অন্যদিকে তখন প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শও কাজ করছিল তাঁর মনে। তপোবন-বিদ্যাশ্রমের যে ছবিটি তাঁকে প্রভাবিত করেছিল— তাকেই রূপ দিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন তিনি। তাই 'আশ্রমের শিক্ষা' প্রবন্ধের সুরুতেই তিনি বলেছেন : 'প্রাচীন ভারতের তপোবন জিনিসটার ঠিক বাস্তবরূপ কী তার ঐতিহাসিক ধারণা আজ সহজ নয়। তপোবনের যে প্রতিরূপ স্থায়ীভাবে আঁকা পড়েছে ভারতের চিত্তে ও সাহিত্যে সে হচ্ছে একটি কল্যাণময় কল্পমূর্তি, বিলাসমোহমুক্ত প্রাণবান আনন্দের মূর্তি। আধুনিক কালে জন্মেছি। কিন্তু, এই ছবি রয়ে গেছে আমারও মনে। বর্তমান যুগের বিদ্যায়তনে ভাবলোকের সেই তপোবনকে রূপলোকে প্রকাশ করবার জন্যে একদা কিছুকাল ধরে আমার মনে আগ্রহ জেগেছিল।'

শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপনের মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশের এবং তপোবনের আদর্শকে রূপ দিতে সুযোগ পেলেন রবীন্দ্রনাথ। কবি মাত্রেরই চরিত্র হল প্রকাশধর্মী। কবিতা যেমন কবির অন্তরকেই প্রকাশ করে— শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ও কবির অন্তরের আর এক প্রকাশের ক্ষেত্র। কবি নিজে বলেছেন যে, প্রকাশের ইচ্ছাই তাঁর জীবনের একমাত্র ইচ্ছা, অন্তরের মধ্যে যে চিত্র আছে সেটাকে বাইরে কর্মে গানে চিত্রে রূপ দেওয়াই তাঁর কাজ। নিজেকে প্রকাশ করার সেই বাসনাই কাজ করেছে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পিছনে। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথা *On the Edges of Time* গ্রন্থে পিতার বিদ্যালয় স্থাপনের ইতিহাস প্রসঙ্গে বলেছেন, 'He had become restless and was eager to find a congenial place where he could experiment with his ideas about education. What could better fulfil his dream he had long cherished in his mind of the ideal atmosphere and surroundings for children than what Santiniketan seemed to offer ?'

বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা কীভাবে রবীন্দ্রনাথকে আচ্ছন্ন করেছিল তার পরিচয় রয়েছে ওই সময়ে লেখা তাঁর চিঠিপত্রে। ১৯০১ সালের ডিসেম্বরে বিদ্যালয়ের সূচনা হয়। তার কয়েক মাস আগে ১৬ অগস্ট বিলাত-প্রবাসী বন্ধু বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুকে তিনি লিখেছেন, 'শান্তিনিকেতনে আমি একটি বিদ্যালয় খুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। সেখানে ঠিক প্রাচীন কালের গুরুগৃহ-বাসের মত সমস্ত নিয়ম। বিলাসিতার নাম-গন্ধ থাকিবে না— ধনী দরিদ্র সকলকেই কঠিন ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত হইতে হইবে। উপযুক্ত শিক্ষক কোন মতেই খুঁজিয়া পাইতেছি না। এখনকার কালের বিদ্যা ও তখনকার কালের প্রকৃতি একত্রে পাওয়া যায় না। স্বার্থ-চেষ্টা ও আড়ম্বর হইতে কোন মহৎ কার্য্যকে বিচ্যুত করিতে গেলে কাহারো মুখরোচক হয় না। এতদিনকার ইংরেজি বিদ্যায় আমাদের কাহাকেও যথার্থ কর্ম্মযোগী করিতে পারিল না কেন? মহারাষ্ট্র দেশে ত তিলক ও পরঞ্জপে আছে, আমাদের এখানে সে-রকম ত্যাগী অথচ কর্ম্মী নাই কেন? ছেলেবেলা হইতে ব্রহ্মচর্য্য না শিখিলে আমরা প্রকৃত হিন্দু হইতে পারিব না। অসংযত প্রবৃত্তি এবং বিলাসিতায় আমাদিগকে ভ্রষ্ট করিতেছে— দারিদ্র্যকে সহজে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না বলিয়াই সকল প্রকার দৈন্যে আমাদিগকে পরাভূত করিতেছে। তুমি যদি ইতিমধ্যে একবার এখানে এস তবে তোমাকে লইয়া আমার এই কাজটি পত্তন করিতে হইবে।'

বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে প্রায় সমকালেই, ১ ডিসেম্বর ১৯০১ নববিধান ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম যুবনেতা এবং কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র প্রমথনাথকে এক চিঠিতে কবি জানালেন, 'সম্প্রতি আমি কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার সমালোচনা লিখিতে নিযুক্ত আছি— ইহার মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে সাহিত্য ও সমাজ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের আদর্শ কি ছিল কতকটা আলোচনা করা যাইবে। এবারকার বঙ্গদর্শনে শিক্ষাসম্বন্ধে কোন লেখা দিবার অবসর হইবে না। বোধহয় পরের বারে হইবে। বস্তুত আমার এই বিদ্যালয় লইয়া আমি অধিক গোল করিতে চাই

না। এখানে অল্পই ছাত্র পড়িবে; আমাদের যতদূর সাধ্য কাজ করিয়া যাইব। বাহিরের তীব্র দৃষ্টি Evil eye এর মত কাজ করে— ইহাতে শিশু অনুষ্ঠানকে আঘাত করিতে পারে। কাজের আরম্ভে যথেষ্ট শান্তি ও কিয়ৎ পরিমাণে গোপনতা না হইলে নয়। একটুখানি শক্ত হইয়া উঠিলে তাহার পরে সমস্ত সংসারের কাছে জবাবদিহি করিবার সময় আসে। আমি কোন মৃত প্রাচীন ব্যাপারকে মন্ত্রবলে জীবিত করিবার ইচ্ছা করি না; অতীতকে ফিরান আমার কর্ম নহে; যাহা প্রচ্ছন্নরূপে অথচ প্রবল রূপে বর্তমান, যাহা মৃত নহে, যাহা আমাদের ভারতবর্ষের প্রকৃতিগত, তাহাকে আমার কার্য্যের সহায় করিতে চাই; অন্ধভাবে তাহাকে অস্বীকার চলিতে চেষ্টা করি বলিয়াই বারম্বার আমাদের প্রারব্ধ অনুষ্ঠান নষ্ট হইয়া যায়। অন্যদেশের বর্তমান ইতিহাসকেই আমরা বর্তমান কাল বলিয়া গণ্য করি— ভুলিয়া যাই তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে বর্তমান নহে। বরঞ্চ ভারতবর্ষের অতীতকে পুনর্জ্জীবিত করা সম্ভব তবু অন্য দেশের ঐতিহাসিক কালকে ভারতবর্ষের মধ্যে সঞ্চার করা সম্ভব নহে— এরূপ চেষ্টায় বিকার ও বিনাশের সূত্রপাত হইতে পারে, নূতন জীবনের নহে...।' *রবিজীবনী*-রচয়িতার মতে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনের অন্তর্নিহিত প্রেরণা ও লক্ষ্যটি এত সংক্ষেপে হয়তো আর কোথাও ব্যক্ত হয় নি।

ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোরমাণিক্য, মহিমচন্দ্র ঠাকুর প্রমুখকে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার খবর চিঠিতে লিখেছেন। মহারাজকে জানাচ্ছেন, 'শান্তিনিকেতন আশ্রমের সঙ্গে একটি বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ করিয়াছি। বিদ্যালয়গৃহ পূর্বেই নির্মাণ হইয়া গেছে— এক্ষণে ষোলোজন ছাত্রের বাসোপযোগী একটি বাড়ি তৈরি হইতেছে। যাহাতে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের বুদ্ধি, শরীর ও চরিত্রের উন্নতি হয় সেজন্য বিশেষ চেষ্টান্বিত হইব। বিষয়কর্মের ঝঞ্ঝাট পরিত্যাগ করিয়া আমি এই বিদ্যালয় লইয়া শান্তিনিকেতনে নিভৃতে জীবনযাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। দেশের জন্য যেমন করিয়াই যাহা করিতে যাই গোড়ায় মানুষ দরকার— বালককাল হইতে গুরুগৃহে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য পালনপূর্বক শ্রদ্ধা সংযম ও অবধানের সঙ্গে বিদ্যাশিক্ষা না করিলে কেবল মুখস্থ বিদ্যায় কেহ মানুষ হইতে পারে না। প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে আমার উৎসাহ সেইজন্য। আমার ছেলেদের আমি এই বিদ্যালয়েই শিক্ষাদান করিতে সংকল্প করিয়াছি। খুব ভাল অধ্যাপকের সন্ধান পাওয়া গেছে, অতএব পড়াশুনা ও পরীক্ষা দেওয়ার কোন ব্যাঘাত হইবে না। দুইজন ইংরাজি অধ্যাপক একজন সংস্কৃত পণ্ডিত নিযুক্ত হইবেন— দশ-বারোটি মাত্র ছেলেকে পড়াইতে হইবে। সুতরাং অধ্যাপক প্রত্যেক ছেলের প্রতি মন দিবার সময় পাইবেন। তাহা ছাড়া ব্যায়ামচর্চার যথেষ্ট আয়োজন থাকিবে।' চিঠিটি ৩ সেপ্টেম্বর ১৯০১ সালে লেখা।

কিছুদিন আগে ২৬ অগস্ট বিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে ব্যস্ততার কথা লিখেছেন মহিমচন্দ্রকে, 'আমাদের বোলপুর আশ্রমের সেই বিদ্যালয়টা স্থাপন করিবার আয়োজনেও ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে। সকালে বাহির হইয়াছিলাম। আহার করিয়া আবার এখনি বাহির হইতেছি। গাড়ি দ্বারে উপস্থিত। একটি ভাল অধ্যাপকের খবর পাওয়া গেছে।' দ্বিতীয় চিঠিতে বলেছেন, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়েই তিনি পুত্র রথীন্দ্রনাথের শিক্ষার ব্যবস্থা করছেন। 'সেখানে বিদ্যালয়টি যাহাতে আদর্শ বিদ্যালয় হইতে পারে এই আমার একমাত্র চেষ্টা।'

এই সময়েই ত্রিপুরায় মধ্যম রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরকে শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে উদ্যোগী হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। ব্রজেন্দ্রকিশোর তখন তাঁর সঙ্গে শিলাইদহ, বোলপুর ও কলকাতা ভ্রমণ-রত। তিনি স্মৃতিচারণে বলেছেন, 'জোড়োসাঁকো বাড়িতে মহর্ষিদেব আমার মাথায় ও শরীরে হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করে খুবই আনন্দ প্রকাশ করলেন ব্রহ্ম বিদ্যালয়ে যোগদান করার কথা জেনে।' *(রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা)*

সমকালেই মহিমচন্দ্রকে লিখছেন রবীন্দ্রনাথ, 'নানা কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম। স্কুলের বন্দোবস্ত লইয়াও অনেক সময় গেছে। আমাদের বিদ্যালয়ে শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষারও একটা ব্যবস্থা করা যাইতেছে। কেমিষ্ট্রি ও ফিজিক্যাল সায়ান্সে এম. এ. পাস করা একটি সুযোগ্য লোক পাওয়া গেছে। তিনি নানা প্রকার শিল্পকার্য্যেও দক্ষ। তাঁহার অধীনে ছেলেদের শিক্ষা পরীক্ষা ও আমাদের জন্য একটি ছোটখাট Workshop খোলা যাইবে। পিতাঠাকুর [ মহর্ষি ] এ কয়দিন প্রত্যহ প্রাতে এই বিদ্যালয় লইয়া আমার সঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন। পাছে শীঘ্র বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ না হইলে তাঁহার জীবিতকাল অতিক্রান্ত হয় এই তাঁর আশঙ্কা। এই কাজটিকে তিনি তাঁহার জীবনের শেষ কার্য্যরূপে দেখিয়া যাইতে চান।... আমি আজ এখনই বোলপুর রওনা হইতেছি।

সকালের প্যাসেঞ্জারে ছাড়িব। এখন ভোর সাড়ে চারটে। আলো জ্বালিয়া তোমাকে লিখিতেছি।' *(রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা)* এই চিঠিতে বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথের ব্যাকুল ব্যগ্রতা ও রবীন্দ্রনাথের ব্যস্ততা। তাছাড়া শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি কবির গভীর আকর্ষণ।

মহর্ষির ওই উদ্‌বেগপূর্ণ ব্যাকুলতার যথেষ্ট কারণ ছিল। বিদ্যালয়-স্থাপনের প্রায় চোদ্দ বছর আগে ১২৯৪ বঙ্গাব্দের ২৬ ফাল্গুন শান্তিনিকেতন-আশ্রমের জন্য তিনি যে ন্যাস-পত্র (ট্রাস্ট ডিড্) রচনা করেন তাতেও ওই বিদ্যালয় স্থাপনের উল্লেখ দেখা যায়।— 'এই ট্রাস্টের উদ্দিষ্ট আশ্রম-ধর্মের উন্নতির জন্য ট্রাস্টিগণ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় ও পুস্তকালয় সংস্থাপন, অতিথি-সৎকার ও তজ্জন্য আবশ্যক হইলে উপযুক্ত গৃহনির্মাণ ও স্থাবর অস্থাবর বস্তু ক্রয় করিয়া দিবেন এবং ঐ আশ্রমধর্মের উন্নতির বিধায় সকলপ্রকার কর্ম করিতে পারিবেন।'

মহর্ষির এই অভীপ্সা-পূরণে অগ্রণী হন তাঁর এক পৌত্র বলেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় এই ভ্রাতুষ্পুত্র, তাঁর চতুর্থ অগ্রজ বীরেন্দ্রনাথের একমাত্র সন্তান। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে উৎসাহী বলেন্দ্র লাহোর, বোম্বাই, বারাণসী প্রভৃতি শহরের একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলায় সচেষ্ট ছিলেন। শান্তিনিকেতনে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম শিক্ষা দেওয়ার জন্য ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা তাঁরই। পিতামহ দেবেন্দ্রনাথ সাগ্রহ-সম্মতি জানান তাতে। বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণের জন্য দান করেন পাঁচ হাজার টাকা। সেই টাকায় তৈরি হয় একতলা বিদ্যালয়-গৃহ। বর্তমান বিদ্যালয় অর্থাৎ পাঠভবনের অবস্থিতি সেখানেই।

১৮৯৯ সালের ২১ ডিসেম্বর, সাতই পৌষ, বলেন্দ্রনাথ পরিকল্পিত বিদ্যালয়ের উদ্‌বোধনও করেন সত্যেন্দ্রনাথ— মহর্ষির দ্বিতীয় পুত্র। কিন্তু তার আগেই ১৯ অগস্ট যক্ষ্মারোগে বলেন্দ্রের অকালমৃত্যু ঘটে। সুতরাং সাময়িকভাবে পরিত্যক্ত হয় বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা। অবশ্য বলেন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের জন্য যে নিয়মাবলি রচনা করেন তা থেকে যায়। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সেটি পরবর্তীকালে উদ্ধার করেন উত্তরায়ণে রাখা কাগজপত্র থেকে। তা এখানে উদ্‌ধৃত হচ্ছে :

১. শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযোগী করিয়া অধ্যাপন করা হইবে।

২. বিদ্যালয় ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইবে।

৩. আপাততঃ দশজন ছাত্র বিনা ব্যয়ে বিদ্যালয়ে থাকিয়া আহার ও শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন।

৪. আহার্যের ব্যয় স্বরূপ মাসিক ১০ টাকা দিলে আরও ২০ জন ছাত্রকে বিদ্যালয়ে লওয়া যাইতে পারিবে।

৫. শান্তিনিকেতন আশ্রমের ট্রস্টীগণ ব্যতীত আরও চারজন সভ্যকে লইয়া বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ-সমিতি গঠিত হইবে। প্রথম অধ্যক্ষ নির্বাচনে আশ্রমের ট্রস্টীগণের কর্তৃত্ব থাকিবে। তৎপরে কোনো অধ্যক্ষ অবসর গ্রহণ করিলে অবশিষ্ট অধ্যক্ষেরা মিলিয়া অধ্যক্ষ নির্বাচন করিয়া লইবেন।

৬. অধ্যক্ষ-সমিতি ব্রাহ্মধর্মানুমোদিত শিক্ষাপ্রণালী এবং শান্তিনিকেতন আশ্রমের নিয়মাবলী সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়া বিদ্যালয়ের কার্য পরিচালনা করিবেন।

৭. শান্তিনিকেতন আশ্রমের ট্রস্টীগণের মধ্যে একজন এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক হইবেন। সম্পাদক অধ্যক্ষ-সভার অনুমতি লইয়া বিদ্যালয়ের কার্য পরিদর্শন হিসাব পরীক্ষা শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ ও পরিবর্তন ছাত্র-নির্বাচন পুস্তক শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।

৮. বিদ্যালয়ের অন্যান্য পাঠ্যগ্রন্থের সঙ্গে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম এবং চতুর্থ বার্ষিক হইতে প্রবেশিকা পর্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম ও ব্যাখ্যান অধ্যাপন হইবে। [চতুর্থ ও তৃতীয় যথাক্রমে বর্তমান যুগের ৭ম ও ৮ম শ্রেণী।]

৯. ৩য় বার্ষিক শ্রেণী হইতে এণ্ট্রান্স পর্যন্ত সমুদয় ছাত্র অধ্যাপকগণ-সহ আশ্রমের প্রতি সায়ং-উপাসনায় যোগ দিবে। এবং নিম্ন শ্রেণীর বালকগণকে লইয়া অধ্যাপকগণ স্বতন্ত্র নির্দিষ্ট উপাসনা করিবেন।

১০. সকল ছাত্রকেই বিদ্যালয়-ভবনে বাস করিতে হইবে। এবং শিক্ষকগণ তাহাদিগকে লইয়া নিরূপিত সময়ে একত্র আহারাদি করিবেন। এবং যথাসম্ভব ছাত্রগণের সহিত ক্রীড়া-কৌতুকেও যোগ দিবেন।

১১. ছুটির সময় ব্যতীত মাসে ৩ দিন অভিভাবকের সম্মতি থাকিলে অধ্যাপকের অনুমতি লইয়া বাটী যাইতে পারিবে।

১২. অভিভাবকগণ প্রতি রবিবারে গিয়া বালকদিগকে দেখিয়া আসিতে পারিবেন। [ অর্থাৎ সাপ্তাহিক ছুটির দিন হিসেবে রবিবারই নির্দিষ্ট হয়েছিল— পরবর্তীকালের মতো বুধবার নয়। ] (*রবীন্দ্র-জীবনী*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।)

বলেন্দ্র-পরিকল্পিত ব্রহ্মবিদ্যালয়-আকৃষ্ট করেছিল পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথকে। কেননা শান্তিনিকেতন-আশ্রমের অন্যতম ট্রাস্টিও তিনি, তাছাড়া শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁরও নিজস্ব কিছু চিন্তা-ভাবনা তখনই প্রকাশ পেয়েছিল। সুতরাং ভ্রাতুষ্পুত্রের বিদ্যালয়-পরিকল্পনা তাঁকে উৎসাহিত করাই স্বাভাবিক। এমনকি তাঁর হিসাব-খাতায় কলকাতায় মির্জাপুর রাজাবাগানে বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে ঘোরাঘুরির কথা আছে।— 'মেজাপুর ব্রহ্মবিদ্যালয় সম্বন্ধে' এবং 'ব্রহ্মবিদ্যালয় সম্পর্কে রাজার বাগানে' যথাক্রমে ৬ ও ১৯ মাঘ (১৩০৫) যাতায়াতের বিবরণই তার এক প্রমাণ। সম্ভবত উপযুক্ত শিক্ষকের সন্ধানই এই যাতায়াতের উদ্দেশ্য। কিন্তু, বলেন্দ্রর অকালমৃত্যু ওই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা-ভাবনাকে আপাতত বিঘ্নিত করে। সস্ত্রীক রবীন্দ্রনাথ এই মৃত্যুশোকে কতখানি বিচলিত হয়েছেন তাও আমাদের জানা। এর দুবছর পর যখন তিনি স্বয়ং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নিয়েছেন তখন নিশ্চয়ই একেবারে বিলীন হয়নি বলেন্দ্রের স্মৃতি। হয়তো পূর্ব-কথিত নিয়মাবলি সাহায্যও করে থাকবে তাঁকে— যদিও তা অনুসরণ করেন নি রবীন্দ্রনাথ— বলেন্দ্রের মতো ব্রাহ্মধর্ম শিক্ষাদানে ছিল তাঁর অনীহা।

শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপনের সংকল্প রবীন্দ্রনাথের মনে দৃঢ়বদ্ধ হয়েছে ১৯০১ সালের জুলাই মাসে। জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার স্বামীগৃহ মজঃফরপুর থেকে কলকাতা ফেরার পথে তিনি নেমে পড়েন শান্তিনিকেতনে। সেখানে বলেন্দ্র-পরিকল্পিত ব্রহ্মবিদ্যালয়ের নবনির্মিত বাড়িটি দেখার পর সেই সংকল্পকে বাস্তবায়িত করার বাসনা তাঁর কাছে অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। তিনি যে উপকরণবাহুল্য-বর্জিত শিক্ষাদানের ব্রত গ্রহণ করেছেন তার উপযুক্ত স্থান তো এই শান্তিনিকেতন আশ্রম। ৯ অগস্ট মধ্যমা কন্যা রেণুকার বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে— জামাতা সত্যেন্দ্র ভট্টাচার্যকে ওই মাসেই বিলেত পাঠিয়েছেন। সমকালে বিদ্যালয়ের ব্যাপারে তাঁর ব্যস্ততা বেড়েই চলেছে। বিভিন্ন শুভানুধ্যায়ীদের কাছে চিঠি লেখার কথা তো আগেই বলা হয়েছে— মৌখিক কথাবার্তা আলাপ-আলোচনা করেছেন হিতৈষীদের সঙ্গে। আশ্রমের অন্যতম ট্রাস্টি মহর্ষির প্রিয় ভক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর বাড়ি গিয়ে তাঁকে বিদ্যালয়-প্রসঙ্গ অবগত করেছেন। অবিরাম ঘোরাঘুরি লেগেই আছে— কখনও বালিগঞ্জ, কখনও হেদুয়াতলা কিংবা গোলতলাও। এর মধ্যে আছে সাহিত্য-সাধনা। আছে *বঙ্গদর্শন*-সম্পাদনা, আছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অধিবেশনে 'বাঙ্গলা তদ্ধিত ও কৃদন্ত প্রত্যয়' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ। ধারাবাহিকভাবে লিখছেন *চোখের বালি* উপন্যাস। কখনও-বা প্রবন্ধ 'মেঘদূত', সামাজিক রচনা 'হিন্দুত্ব', ব্যঙ্গকৌতুক 'বশীকরণ'। সেইসঙ্গে আছে মৃত্যুশোকের আঘাত প্রিয়বিচ্ছেদের বেদনা। বলেন্দ্রের অকালমৃত্যুর একবছর পরেই আবার এক প্রাণাধিক ভ্রাতুষ্পুত্র নীতীন্দ্রনাথ (বড়ো দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র) গুরুতর অসুস্থ এবং মৃত্যুপথযাত্রী। মহিমচন্দ্রকে জানাচ্ছেন, 'আমার ভ্রাতুষ্পুত্র নীতুর পীড়া অত্যন্ত সংশয়াপন্ন অবস্থায় আসিয়াছে সেইজন্য ক্রমাগত রাত্রি জাগরণে ও দুশ্চিন্তায় শরীর মন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।' মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্যকে লিখছেন, 'আমার একটি ভ্রাতুষ্পুত্রের সংশয়াপন্ন পীড়া উপস্থিত সেইজন্য একান্তই উদ্বিগ্ন হইয়া আছি। তাহাকে সুস্থ দেখিলেই বোলপুরে চলিয়া যাইব।' কিন্তু সেই আশা পূর্ণ হয় নি। ১৩ সেপ্টেম্বর নীতুর লোকান্তর ঘটেছে। তাঁর আদ্যশ্রাদ্ধের আগেই শোকাহত কবি-পরিবার শান্তিনিকেতন রওনা দিয়েছে। শোকের পাশাপাশি আছে বন্ধু-কৃত্য। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের গবেষণাকাজে অর্থসাহায্য প্রার্থনায় কবি যাত্রা করেছেন ত্রিপুরা, শরণাপন্ন হয়েছেন মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের। নভেম্বরের প্রথম দিকেই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁর প্রধান সহযোগী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে নিয়ে চলেছেন শান্তিনিকেতন— হয়তো জায়গাটির সঙ্গে শ্রদ্ধেয় বন্ধুর পরিচিতির উদ্দেশ্যেই।

এবার বিদ্যালয়ের অন্যতম স্থপতি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় [ ১৮৬১-১৯০৭ ] প্রসঙ্গ। এক বিস্ময়কর গতিময়

বিচিত্রমনা পুরুষ— জন্মসূত্রে তিনি হিন্দুব্রাহ্মণ, কেশবচন্দ্র সেনের সান্নিধ্যে ব্রাহ্মধর্মপ্রচারক, খুল্লতাত রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাবে প্রথমে প্রটেস্টান্ট পরে রোমান ক্যাথলিক, আবার স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ, বৈদান্তিক সন্ন্যাসী অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজে বেদান্তধর্মের প্রচারক। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তিনি ছিলেন 'রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী, অপরপক্ষে, বৈদান্তিক— তেজস্বী, নির্ভীক, ত্যাগী, বহুশ্রুত ও অসামান্য প্রভাবশালী।' [ *চার অধ্যায়*, 'আভাস'। ] ১৯০১ সালে কলকাতার সিমলায় বৈদিক আদর্শে স্থাপিত আবাসিক বিদ্যালয় 'সারস্বত আয়তন'-এর প্রতিষ্ঠাতা তিনি— কয়েকমাস পরেই রবীন্দ্রনাথ-পরিকল্পিত শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উপদেষ্টা-সহায়কও। ব্রহ্মবান্ধবই সর্বপ্রথম 'বিশ্বকবি' আখ্যা দেন রবীন্দ্রনাথকে— ১৯০০ সালের ১ সেপ্টেম্বর করাচি থেকে প্রকাশিত *Sophia* পত্রিকার সম্পাদকীয় হিসেবে তিনি রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ করে লেখেন 'The world-poet of Bengal' প্রবন্ধ। তাঁর ভাষায় 'If ever the Bengali language is studied by foreigners it will be for the sake of Rabindra. He is a world-poet.' [ হায়! ১৩ বছর পর রবীন্দ্রনাথকে নোবেল-প্রাইজে সম্মানিত হতে— সন্ন্যাসীর সেই ভবিষ্যৎ বাণী সার্থক হতে— তিনি দেখে যান নি। ] পরের বছরেই ১৯০১ জুলাই *Twentieth Century* পত্রিকায় ব্রহ্মবান্ধব রবীন্দ্রনাথের *নৈবেদ্য* কাব্যের সপ্রশংস সমালোচনা লেখেন। কবি সেই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'তৎপূর্বে আমার কোনো কাব্যের এমন অকুণ্ঠিত প্রশংসাবাদ কোথাও দেখি নি।' [ *চার অধ্যায়*, 'আভাস'। ]

শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয় স্থাপনায় ব্রহ্মবান্ধবের ভূমিকার কথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন বারাবার। পূর্বোক্ত রচনাতেই বলেছেন, 'শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠায় তাঁকেই আমার প্রধান সহযোগী পাই। এই উপলক্ষে কতদিন আশ্রমের সংলগ্ন গ্রামপথে পদচারণ করতে করতে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনা কালে যে-সকল দুরূহ তত্ত্বের গ্রন্থিমোচন করতেন আজও তা মনে করে বিস্মিত হই।' [ *চার অধ্যায়*, 'আভাস'। ] এমনকি জীবন-সায়াহ্নে 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' বক্তৃতায় বলেছেন, 'এই শান্ত জনবিরল শালবাগানে অল্পকয়েকটি ছেলে নিয়ে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সহায়তায় বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করেছিলুম।... ব্রহ্মবান্ধব এবং তাঁর খৃস্টান শিষ্য রেবাচাঁদ ছিলেন সন্ন্যাসী। এই কারণে অধ্যাপনার আর্থিক ও কর্মভার লঘু হয়েছিল তাঁদের দ্বারা।' [ আষাঢ়, ১৩৪৮ ] অনুরূপ 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' প্রবন্ধে অন্যত্র লিখেছেন, '... তিনি [ ব্রহ্মবান্ধব ] জানতে পেরেছিলেন আমার সংকল্প, এবং খবর পেয়েছিলেন যে, শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়-স্থাপনের প্রস্তাবে আমি পিতার সম্মতি পেয়েছি। তিনি আমাকে বললেন, এই সংকল্পকে কার্যে প্রতিষ্ঠিত করতে বিলম্ব করবার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর কয়েকটি অনুগত শিষ্য ও ছাত্র নিয়ে আশ্রমের কাজে প্রবেশ করলেন। ... অধ্যাপনার অধিকাংশ ভার যদি উপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত রেবাচাঁদ— তাঁর এখনকার নাম অণিমানন্দ— বহন না করতেন তাহলে কাজ চালানো একেবারে অসাধ্য হত। ... তখন উপাধ্যায় আমাকে যে গুরুদেব উপাধি দিয়েছিলেন আজ পর্যন্ত আশ্রমবাসীদের কাছে আমাকে সেই উপাধি বহন করতে হচ্ছে। আশ্রমের আরম্ভ থেকে বহুকাল পর্যন্ত তার আর্থিক ভার আমার পক্ষে যেমন দুর্বহ হয়েছে, এই উপাধিটিও তেমনি। ...' [ আশ্বিন ১৩৪০ ]

এর আগেও ১৯২২-এর ২১ অগস্ট প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রসভায় বিশ্বভারতী-প্রসঙ্গে বক্তৃতা দান কালে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, 'তখন আমার সঙ্গী-সহায় খুবই অল্প। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় আমায় ভালোবাসতেন, আর আমার সংকল্পে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি আমার কাজে এসে যোগ দিলেন। তিনি বললেন, 'আপনি মাস্টারি করতে না জানেন, আমি সে ভার নিচ্ছি।' আমার উপর রইল ছেলেদের সঙ্গ দেওয়া।...' [ *বিশ্বভারতী*, ৬। ]

বস্তুত, ব্রহ্মবান্ধব রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠায় কতখানি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন তার পরিচয় পূর্বোক্ত উদ্‌ধৃতিগুলি থেকেই প্রমাণিত। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর কলকাতাস্থ আবাসিক বিদ্যালয় 'সারস্বত আয়তন' বন্ধ করে যোগ দেন শান্তিনিকেতনে। সঙ্গে আনেন তাঁর শিষ্য শিক্ষাব্রতী সিন্ধি যুবক রেবাচাঁদ এবং কয়েকজন

ছাত্রকে। ['রেবাচাঁদের পুরো নাম রেবাচাঁদ জ্ঞানচাঁদ মখিজানি— পরবর্তীকালে ব্রহ্মচারী অণিমানন্দ নামে পরিচিত হন।] ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম সুধীরচন্দ্র নান ব্রহ্মবান্ধবের প্রাক্তন ছাত্র ও শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু কার্তিকচন্দ্র নানের পুত্র। অন্যরা হলেন উপাধ্যায়ের বন্ধু ও সহপাঠী উপেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মণীন্দ্রকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠপুত্র গৌরগোবিন্দ ও মধ্যম ভ্রাতার পুত্র অশোককুমার।

১৩০৮ বঙ্গাব্দের ৭ পৌষ, ২২ ডিসেম্বর ১৯০১ শান্তিনিকেতনে একাদশ সাম্বৎসরিক উৎসবের পর উদ্‌বোধন হল বহু প্রতীক্ষিত ব্রহ্মচর্যাশ্রম-বিদ্যালয়ের। এই উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ ২৭ অগ্রহায়ণ, ১৩ ডিসেম্বর, উপস্থিত হয়েছেন সেখানে। স্মর্তব্য, সেপ্টেম্বর মাসে নীতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর থেকেই কবি-পরিবার শান্তিনিকেতনবাসী। ইতোপূর্বে শিলাইদহে থাকাকালেই ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা ছিল বাড়িতেই— রবীন্দ্রনাথ পুত্র-কন্যাদের কখনও দেশে তৎকালে প্রচলিত বিদ্যালয়ে পাঠান নি। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাঁর সেই গৃহবিদ্যালয় শান্তিনিকেতনেই চলে এসেছে। তা স্বাভাবিকভাবেই যুক্ত হয়েছে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সঙ্গে। জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথের বয়স তখন তেরো, কনিষ্ঠ শমীন্দ্রনাথ তখন পাঁচ বছরের শিশু। ফলে রথীন্দ্রই নতুন বিদ্যালয়ের প্রথম দলের ছাত্র হলেন— পাঁচজন ছাত্র সম্বল করে বিদ্যালয় শুরু, রথীন্দ্র তাঁদের অন্যতম। বাকিদের তিনজনের নাম আগেই বলা হয়েছে, চতুর্থজন হলেন প্রেমকুমার গুপ্ত। কেউ কেউ আবার অশোককুমারের পরিবর্তে গিরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের নাম করেছেন।

অবশ্য প্রথম দলের ছাত্রদের ভিন্ন ভিন্ন তালিকা পাওয়া যায়। *রবীন্দ্রজীবনী*কার প্রভাতকুমারের তালিকাটি দীর্ঘ ১. গৌরগোবিন্দ গুপ্ত [ পরে রংপুর কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ], ২. অশোককুমার গুপ্ত [ একই পরিবারের সন্তান ], ৩. যোগানন্দ মিত্র [ দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক অম্বিকাচরণ মিত্রের ভ্রাতুষ্পুত্র ], ৪. সুধীরচন্দ্র নান [ আগেই পরিচিতি দেওয়া হয়েছে ], ৫. গিরীন্দ্র ভট্টাচার্য, ৬. রাজেন্দ্রনাথ দে [ সুধীরচন্দ্র নানের পিসতুতো ভাই ], ৭. প্রেমকুমার গুপ্ত [ অশোককুমার গুপ্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ], ৮. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৯. শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১০. সন্তোষচন্দ্র মজুমদার [ কয়েকদিন পরে আসেন ]। গৌরগোবিন্দ গুপ্তের একটি পত্র-প্রবন্ধ থেকে তথ্যসংগ্রহ করে দীপ্তিময় রায় যে তালিকা দিয়েছেন তা হল ১. গৌরগোবিন্দ গুপ্ত, ২. অশোককৃষ্ণ গুপ্ত, ৩. গিরিন ভট্টাচার্য [ *বঙ্গবাসী* পত্রের সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বসুর গুরুপুত্র ], ৪. যোগানন্দ মিত্র, ৫. সুধীরচন্দ্র নান, ৬. রথীন্দ্রনাথ ও ৭. শমীন্দ্রনাথ। তবে এঁদের মধ্যে রথীন্দ্রনাথ গৌরগোবিন্দ ও সুধীরচন্দ্র যে প্রথম পাঁচজনের অন্যতম তাতে কোনো সংশয় নেই। দীপ্তিময় রায়ের মতে রাজেন্দ্রনাথ দে ও প্রেমকুমার গুপ্ত ব্রহ্মবান্ধবের চেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যেই ছাত্রদলভুক্ত হন। অশোককুমার ও অশোককৃষ্ণ সম্ভবত একই ব্যক্তি। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গৌরগোবিন্দ গুপ্ত, প্রেমকুমার গুপ্ত, অশোককুমার গুপ্ত, সুধীরচন্দ্র নান— এই পাঁচজন তখন আশ্রমের ছাত্র।' *রবিজীবনী*কার প্রশান্তকুমার পাল শেষোক্ত তালিকাকেই সঠিক বলেছেন। অবশ্য প্রথম দলের ছাত্র রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণও এখানে উল্লেখ্য, 'ছাত্র জোটানো বাবার এক সমস্যা হল। ... বাবা কলকাতায় গিয়ে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়কে ছাত্র সংগ্রহ করে দিতে অনুরোধ জানালেন। তিনি তাঁর পরিচিত পরিবার থেকে চারটি ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেন। এইটুকু শুধু মনে পড়ে, তাদের মধ্যে দু'জন কলকাতার ব্যবসায়ী নান পরিবারের ছেলে। আমাকে ধরলে পাঁচজন হয়। এই পাঁচজন ছাত্র নিয়েই বিদ্যালয় আরম্ভ হল শতাব্দীর প্রথম বছরে।' [ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর , *পিতৃস্মৃতি*। ]

উদ্‌বোধনের তিন দিন আগে ৪ পৌষ ১৯ ডিসেম্বর কলকাতা থেকে রিজার্ভ-করা কামরায় বোলপুর পৌঁছেছেন ব্রহ্মবান্ধব, রেবাচাঁদ আর তাঁদের ছাত্ররা। তাছাড়া ওই একই ট্রেনে এসেছেন ঠাকুর পরিবারের সত্যেন্দ্রনাথ দিনেন্দ্রনাথ, ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ এবং অন্যান্য অতিথিরা। সাতই পৌষ সকালে মন্দিরে পৌষ-উৎসব ও মেলার সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠানের পর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সূচনা হল নবীন ছাত্রদের দীক্ষাদানের মধ্যে দিয়ে। রথীন্দ্রনাথ তাঁর ইংরেজি আত্মকথা *On the Edges of Time*-এ লিখছেন, 'On the day of the opening ceremony, however, we were given red silk dhotis and chaddars and it made us feel very

proud and important to stand in a row in the Mandir, the cynosure of all eyes. My uncle Satyendranath conducted the prayers and there was quite a distinguished gathering on the occasion. The 7th Paush Mela was already an established institution of Santiniketan... . Father had composed some new songs for the opening ceremony, one of which, 'Mora satyer pare mon' remained as the school song for many years until it was replaced by 'Amader Santiniketan.'

রথীন্দ্রনাথের বর্ণনা ছাড়াও সমকালীন *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-য় [ মাঘ ১৮২৩ শক ] রয়ে গেছে পৌষ-উৎসব ও ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠান বিবরণ।—'পরে আমরা মেলা দেখিবার জন্যে বহির্গত হইলাম। খুব জনতা। বেশ ক্রয়-বিক্রয় চলিতেছে। বাউল সম্প্রদায় স্থানে স্থানে নৃত্য-গীত করিতেছে। চারিদিকে যেন আনন্দের বাজার। আমরা এই জনতা ভেদ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যালয় [ বলেন্দ্র'র বিদ্যালয়ের জন্য নির্মিত বাড়িতে ] প্রবেশ করিলাম। তথায় অপূর্ব দৃশ্য। কতকগুলি বালক ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করিয়া বিনীত ভাবে উপবিষ্ট হইয়াছে। আমরাও ব্যাপার দেখিবার জন্য বসিয়া গেলাম। দেখিলাম সর্বপ্রথম ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যালয় সম্বন্ধে কিছু বলিলেন। পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানবকদিগকে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করিলেন। পরে ছাত্রগণের প্রতি উপদেশ দিলেন। উপদেশ দেওয়ার পর বক্তা গায়ত্রী মন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দিলেন...।' দীক্ষাদানকালে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ওঁ নমো ব্রহ্মণে। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যম্ বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারম্ বতু। অবতুমাম্। অবতুবক্তারম্। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ? ব্রহ্মকে নমস্কার। ঋত বলিব। সত্য বলিব। তিনি আমাকে রক্ষা করুন। তিনি বক্তাকে রক্ষা করুন।' দীক্ষাভাষণে তিনি আরো বলেছেন, 'শ্রেয়ান্ বস্যাসোঽসানি স্বাহা— আমি যেন ধনবান্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হই।' উপদেশ দানকালেও দীক্ষিত ছাত্রদের কাছে রবীন্দ্রনাথ সত্যের তপস্যায় শ্রেষ্ঠ এবং বহিরঙ্গে দীন ব্রাহ্মণের মহিমা এবং বর্ণাশ্রম-ধর্মে স্থিত সকল সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার রূপটি সহজ ভাষায় বিবৃত করেছেন।

'সেই তখনকার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরা যে শিক্ষা যে ব্রত অবলম্বন করে বড়ো হয়ে উঠেছিলেন, বীর হয়ে উঠেছিলেন, সেই শিক্ষা সেই ব্রত গ্রহণ করবার জন্যেই তোমাদের এই নির্জন আশ্রমের মধ্যে আমি আহ্বান করেছি। তোমরা আমার কাছে এসেছ— আমি সেই প্রাচীন ঋষিদের সত্যবাক্য তাঁদের উজ্জ্বল চরিত মনের মধ্যে সর্বদা ধারণ করে রেখে তোমাদের সেই মহাপুরুষদের পথে চালনা করতে চেষ্টা করব— আমাদের ব্রতপতি ঈশ্বর আমাকে সেই বল সেই ক্ষমতা দান করুন। যদি আমাদের চেষ্টা সফল হয় তবে তোমরা প্রত্যেকে বীরপুরুষ হয়ে উঠবে— তোমরা ভয়ে কাতর হবে না— দুঃখে বিচলিত হবে না, ক্ষতিতে ম্রিয়মাণ হবে না, ধনের গর্বে স্ফীত হবে না; মৃত্যুকে গ্রাহ্য করবে না, সত্যকে জানতে চাইবে, মিথ্যাকে মন থেকে কথা থেকে কাজ থেকে দূর করে দেবে, সর্বদা জগতের সকল স্থানেই মনে এবং বাইরে এক ঈশ্বর আছেন এইটে নিশ্চয় জেনে আনন্দমনে সকল দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত থাকবে...।' গুরু-শিষ্যের সুগভীর সম্পর্কের কথাও উল্লেখ করেছেন সেই ব্রহ্মচারীদের কাছে, 'গুরুকে সর্বতোভাবে শ্রদ্ধা করবে, মনে বাক্যে কাজে তাঁকে লেশমাত্র অবজ্ঞা করবে না। ... মনকে গুরু-উপদেশের সম্পূর্ণ অধীন করে রাখবে।' উপসংহারে শিক্ষার্থীদের স্মরণার্থে বলেছেন, 'আজ থেকে তোমাদের সত্যব্রত ... আজ থেকে তোমাদের অভয়ব্রত ... আজ থেকে তোমাদের পুণ্যব্রত ... আজ থেকে তোমাদের মঙ্গলব্রত ... এককথায় আজ থেকে তোমাদের ব্রহ্মব্রত। এক ব্রহ্ম তোমাদের অন্তরে বাহিরে সর্বদা সকল স্থানেই আছেন। ... তিনিই তোমাদের একমাত্র ভয়, তিনিই তোমাদের একমাত্র অভয়। প্রত্যহ অন্তত একবার তাঁকে চিন্তা করবে।...'

সেদিন থেকে শান্তিনিকেতনের শান্ত জনবিরল শালবাগানে অল্প কয়েকটি ছাত্র নিয়ে কবি আর এক নতুন কবিতা রচনায় মগ্ন হলেন। শান্তিনিকেতন তো কবির সেই প্রত্যক্ষ কবিতা।

আকরগ্রন্থ :

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র-জীবনী*, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড; প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, পঞ্চম খণ্ড।

# স্বদেশি আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ

## রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

১৯০৫-১১ সালে আমাদের স্বদেশি আন্দোলনের সময় গোখলে বলিয়াছিলেন, 'What Bengal thinks to-day, India thinks tomorrow.' কিন্তু বাঙালির স্বদেশ-চিন্তা এবং স্বদেশ-কর্ম ১৯০৫-এর অনেক পূর্বে আরম্ভ হয়। ১৯০৫-এর স্বদেশি আন্দোলনের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল বিদেশি দ্রব্য বর্জন। কিন্তু এই বিদেশি বর্জনের কথা প্রথম উচ্চারিত হয় স্বদেশি আন্দোলনের ত্রিশ বৎসর পূর্বে। সে কাহিনী আমরা ইংরাজি বা বাংলা বাক্যে লিখিত স্বদেশি আন্দোলনের ইতিহাসে পাই না। ইহা আমাদের স্বদেশি আন্দোলনের পূর্বের কথা। সেই কথা বলি।

১৮৭২ সালে কৃষ্ণমোহন মল্লিক -কৃত এবং তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ *A Brief History of Bengal Commerce* গ্রন্থে বলা হইল যে, ইংরাজ আমলে ব্যাবসা-বাণিজ্যের ফলে বাংলার ধন বৃদ্ধি হইয়াছে। ভোলানাথ চন্দ্র -কৃত এই গ্রন্থের একটি বিস্তারিত সমালোচনা *Mookerjee's Magazine*-এ বাহির হয়। এই সমালোচনার উপসংহারে ভোলানাথ লিখিলেন, 'Allow us a share in the administration, and to frame our own tariff— and, with, perhaps of starting, a bit of patriotism to refuse to buy foreign goods, the children of India will prove to the world whether Providence has willed them to be more agriculturists, or whether they cannot dethrone King Cotton of Manchester, and once more re-establish their sway in the cotton world.'— কথাগুলি আমাদের জাতীয় আন্দোলনের প্রসঙ্গে এতই তাৎপর্যপূর্ণ যে ইহা আমি ভোলানাথের ইংরাজিতেই উপস্থিত করিলাম। দেশের আর্থিক দূরবস্থা দূর করিবার জন্য ভোলানাথ যে পন্থা নির্দেশ করিলেন তাহাই স্বদেশি আন্দোলনের পন্থা। ভোলানাথ এই প্রবন্ধে লিখিলেন, 'It would be no crime for us to take to the only but most effectual weapon— moral hostility left to us in the last extremity. Let us make use of this potent weapon by resolving to non-consume the goods of England.' ইংরাজ আমলেই যে আমাদের দেশের আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটে তাহা দাদাভাই নৌরজীর বৃহৎ গ্রন্থে (*Poverty and Un-British Rule in India,* ১৯০১) প্রমাণিত হইয়াছে। ঐ সময়েই রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার *Economic History of India* গ্রন্থে ইংরাজ আমলে আমাদের আর্থিক অবনতির কাহিনী উপস্থিত করিলেন। এই দুই গ্রন্থে ইহার বিহিত কীভাবে হইতে পারে সে প্রসঙ্গ নাই। ভোলানাথ চন্দ্রই প্রথম এ বিষয়ে আমাদের করণীয় কী সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। আমরা স্বদেশি আন্দোলনের সময় বিদেশি দ্রব্য বর্জনের প্রস্তাব করিলাম। ইংরাজিতে আমরা বলিতাম 'Boycott of British goods'। এই boycott শব্দের স্থলে ভোলানাথ লিখিলেন non-consume; ইহার কারণ এই যে boycott শব্দটি তখন ইংরাজি ভাষায় প্রবেশ করে নাই। ভোলানাথের এই রচনা ভূদেব মুখোপাধ্যায় পড়িয়াছিলেন কিনা জানি না। তবে ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *সামাজিক প্রবন্ধ* গ্রন্থে তাঁহার বক্তব্য ভোলানাথের বক্তব্য হইতে অভিন্ন। *সামাজিক প্রবন্ধ* গ্রন্থে ভূদেব লিখিলেন, 'বিলাতী দ্রব্যের আমদানীতে আমাদের যে সকল ব্যবসা মারা পড়িয়াছে এবং পড়িতেছে, সেই সকল ব্যবসা অবলম্বনে কত লক্ষ লক্ষ লোক অন্ন পাইত তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।'

স্বদেশি আন্দোলনের মূলভাবটি জাতিবৈরের ভাব। স্বদেশি আন্দোলনে জাতীয়তাবাদীর ভিতরে এই ভাব নিহিত, ইংরাজ তোমার শাসন আমার দেশের অবনতি ঘটাইতেছে। তোমরা বলো ইংরাজ আমলে ভারতের উন্নতি হইয়াছে, আমরা বলি উন্নতি হয় নাই, অবনতি ঘটিয়াছে। লর্ড লিটন পর্যন্ত তাঁহার এক Minute-এ (২ মে ১৮৭৮) লিখিলেন, 'I do not hesitate to say that both the governments of England and of India appear to me up to the moment unable to answer satisfactorily the charge of having taken every means in their power of breaking to the heart the words of promise they had uttered to the ear.'— এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করিয়াই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইংল্যান্ডে লেবার গভর্নমেন্টের প্রধানমন্ত্রী মেজর অ্যাটলী ভারতে ইংরাজ শাসনের অবসান ঘটাইলেন।

আমাদের স্বদেশি আন্দোলনের প্রসঙ্গে এই স্বদেশি আন্দোলনের পূর্বকথা অপরিহার্য। আমাদের স্বদেশি আন্দোলনে এই ইংরাজ-বিদ্বেষের ভাবটি এমন প্রকট ছিল না। কিন্তু ইহা যে একেবারে অনুপস্থিত তাহাও বলিতে পারি না। এমন-কি রবীন্দ্রনাথেরও ইংরাজ সম্বন্ধে কর্কশ কথা শুনিতে পাই :

চিরদিন টানবে পিছে, চিরদিন রাখবে নীচে—
এত বল নাই রে তোমার, সবে না সেই টান॥
শাসনে যতই ঘেরো আছে বল দুর্বলেরও,
হও-না যতই বড়ো আছেন ভগবান।
আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি নে রে,
বোঝা তোর ভারী হলেই ডুববে তরীখান॥

স্বদেশি আন্দোলনের সকল কথা, এই আন্দোলনের পূর্বকথা না জানিলে ভালোভাবে বুঝিব না।

আমি মনে করি, স্বদেশি আন্দোলনের তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি-ভাবনা এবং স্বদেশ-চিন্তার আলোচনাতেই স্পষ্ট হইবে। রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার একটি স্বাতন্ত্র্য অবশ্যই আছে। আবার এ-কথাও ঠিক, রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্বদেশি আন্দোলনের প্রাণপুরুষ। ১৯০৫ সালে ৭ অগস্ট বাঙালি লর্ড কার্জন-ঘোষিত বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ করিল। আর বঙ্গভঙ্গ রহিত হইল ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর। স্বদেশি আন্দোলন সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। হরিদাস মুখোপাধ্যায় এবং উমা মুখোপাধ্যায়ের *স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ* (১৯৬১) গ্রন্থের ভূমিকায় রমেশচন্দ্র লিখিলেন, 'It is not merely an economic or social or political movement but it is an all comprehemsive movement co-extensive with the entire circle of our national life, one in which are centred many-sided activities of our growing community.'

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশি আন্দোলনের এই ব্যাপকতা আমাদের বড়ো সুন্দর বুঝাইয়াছেন। বস্তুত রবীন্দ্রনাথই আমাদের স্বদেশি আন্দোলনের মর্যাদা ও মর্ম সারা দেশকে বুঝাইয়াছেন। স্বদেশি আন্দোলনের মর্মকথা বুঝিতে হইলে সেই আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি গান এবং স্বদেশি সমাজচিন্তা সম্যক্‌ভাবে না-বুঝিলে এই আন্দোলনের অর্থ আমরা বুঝিতে পারিব না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম ও অষ্টম দশকের এই নূতন রাজনৈতিক মনোভাবের প্রকাশ আমাদের সাহিত্যে, সংবাদপত্রে, নানা সামাজিক আন্দোলনে। আমাদের শিক্ষা, ধর্ম, নীতি প্রভৃতিতেও দেখি এই নূতন মনোভাব প্রতিফলিত। অবশ্য এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, রাজনৈতিক চিন্তাধারা বা আন্দোলন জাতীয় জীবনের অন্যান্য ধারা হইতে পৃথক বা বিচ্ছিন্নভাবে অগ্রসর হইতে পারে না। জাতি যখন কোনো নূতন আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয় তখন সে উদ্বোধনকে তাহার সমগ্র চেতনার উদ্বোধন বলিতে পারি। জাতি তখন তাহার সমস্ত চিন্তায়, কর্মে, কল্পনায় সেই আর্দশটি মূর্ত করিয়া তুলিতে তৎপর এবং এই নূতন কর্মশক্তির উৎস মূলত জাতির আত্মবোধ ও আত্মপ্রত্যয়। আত্মবোধ না থাকিলে আত্মপ্রত্যয় জন্মে না। আমি বড়ো এ বিশ্বাস না হইলে আমি পারি, এ বিশ্বাস হয় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের বাঙালি জীবনের কথা— আমি বড়ো এবং আমি পারি। সে যুগের

দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবাদের আসল কথাও এই— আমি বড়ো এবং আমি পারি। এখানে আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর দুই অর্ধের রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিভিন্নতা লক্ষ করিতে পারি। প্রথমার্ধের কথা— অর্থাৎ রামমোহন প্রভৃতির কথা— আমরা অতীতে খুব বড়ো ছিলাম— এখন আমরা দুর্দশাগ্রস্ত এবং ইংরাজ আমাদের দুর্দশা দূর করিবে। দ্বিতীয়ার্ধের কথা— আমরা বড়ো হইয়াছি— এখন আমরাই আমাদের নিজের ব্যাপার বুঝিতে পারি এবং ইংরাজ আমাদের মঙ্গলের জন্য ব্যস্ত এমন মনে হয় না। অবশ্য প্রথমার্ধের ভাবটি কোনো কোনো সময়ে দ্বিতীয়ার্ধেও দেখিতে পাই এবং দ্বিতীয়ার্ধের ভাবটির কিছু আভাস প্রথমার্ধে একেবারে বিরল নয়। তবে সাধারণভাবে আমাদের ভাগটি সিদ্ধ। এই দুইটি মনোভাব অনেকসময় একই সভায় প্রকাশত হইয়াছে। ১৮৬৮ সালের ১২ মার্চে অনুষ্ঠিত বীটন সোসাইটির সভায় তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এক বক্তৃতায় বলেন, 'Education in the highest sense of the term, must be one of national development to be of any use to a country. The result, however, is not to be expected in India, so long as the vast superiority of the English race produced in their minds an overwhelming sense of their own inferiority the two nations must be amicably parted before anything good or great could be achieved by the people of this country.'

তারাপ্রসাদের বক্তব্য, ইংরাজ ভারত না ছাড়িলে ভারতের উন্নতি নাই। এই সভাতেই হিন্দু মেলার উদ্যোক্তা নবগোপাল মিত্র বলেন যে, ভারতবর্ষের জাতীয় উন্নতি একমাত্র ইংরাজের সহায়তায়ই সম্ভব। (*The Proceedings sand Transactions of the Bethune Society, Nov. 10th, 1859–April 20th, 1869.*) যোগেশচন্দ্র বাগল তাঁহার *জাতিবৈর গ্রন্থে* এই সভাটির উল্লেখ করিয়াছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যে নূতন রাজনৈতিক চিন্তাধারার সূত্রপাত দেখিলাম, তাহার কতকগুলি বিশিষ্ট কারণ সুস্পষ্ট। প্রথম কথা, এইসময়ে আমরা বুঝিতে আরম্ভ করিলাম যে, ইংরাজ একমাত্র আমাদের হিতার্থেই এ দেশের শাসনভার গ্রহণ করে নাই। ক্রমে আমরা ইংরাজের প্রতি বিরূপ হইতে লাগিলাম। নীল আন্দোলনে এই সন্দেহ ও অবিশ্বাসের প্রথম বিশেষ প্রকাশ। দ্বিতীয়, নূতন শিক্ষার ফলে আমাদের মধ্যে ক্রমে এক আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি হইল। ইংরাজি শিক্ষার প্রথম যুগে আমরা যেন একরূপ আত্মজ্ঞানশূন্য হইয়াই বিদেশি সভ্যতা ও সংস্কৃতির মর্মগ্রহণে ব্যস্ত ছিলাম। শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে আমরা আত্মস্থ হইয়া ঘরে ফিরিলাম। 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা', 'হিন্দু মেলা' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস আমাদের এই ঘরে ফেরার ইতিহাস। তৃতীয়, কোনো কোনো ইংরাজের উদ্ধত আচরণে এইসময়ে আমরা আত্মগ্লানির মধ্য দিয়া আত্মশক্তিতে প্রবুদ্ধ হইলাম। চটি জুতা লইয়া শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে উড্রো সাহেবের তর্ক ইহার এক দৃষ্টান্ত (শিবনাথ শাস্ত্রীর *আত্মচরিত*, ৪র্থ পরিচ্ছেদ)। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে ফুলার মামলা লইয়া আমাদের সংবাদপত্রে ইংরাজের উদ্ধত আচরণের কঠিন সমালোচনা হয়। আগ্রার উকিল ফুলার সাহেবের প্রহারের ফলে তাঁহার সহিস প্রাণত্যাগ করে এবং বিচারে সাহেবের মাত্র ত্রিশ টাকা জরিমানা হয়। এই ব্যাপার লইয়া ইংরাজের অবিচার ও অন্যায়ের এমন কঠোর সমালোচনা হয় যে, বড়লাট লিটন ফুলারের শাস্তি নিতান্ত কম হইয়াছে বলিয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সরকারের নিকট পত্র লিখিতে বাধ্য হন (Buckland, *Bengal under the Lieutenant-Governors*, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৬৬৯-৭০)। চতুর্থ, এইসময়ের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি দেখিয়া আমরা বুঝিলাম, ইহা বিদেশি শাসনেরই ফল।

এইভাবে আমাদের ইংরাজ-বিদ্বেষের মাত্রা বাড়িতে লাগিল। এখন রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে আমাদের কী বলিলেন তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারি। তিনি আমাদের বুঝাইলেন যে, এই বিদ্বেষ কখনও মঙ্গলকর হইবে না। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আদর্শের সঙ্গে এই মনোভাবের সংযোগ স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ আমাদের বুঝাইলেন, বিদ্বেষ হইতে কোনো মহৎ কর্মের সূচনা হইতে পারে না। ইহাতে একটা হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। *গীতবিতান*-এর 'স্বদেশ' পর্যায়ের ৪২ সংখ্যক কবিতাটির কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিতে পারি। এই গানটির প্রথম দুটি লাইন এই, "ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো। একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো।'

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার মূল কথা এই যে, সার্থক দেশাত্মবোধের উৎস সার্থক আত্মবোধ। স্বদেশি আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দেশের মানুষকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন :

তোদের মা ডেকেছে কব বারে বারে
তোমার নামে প্রাণের সকল সুর
আপনি উঠে বেজে সুমধুর
মোদের হৃদয়যন্ত্রের তারে তারে।

স্বদেশি আন্দোলনের মর্মকথা বুঝিতে হইলে এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনা আমাদের যত্ন করিয়া পড়িতে হইবে। যে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের দুইটি দিক থাকে। একটি হৈহট্টগোলের দিক, আরেকটি গভীর চিন্তার দিক। আমাদের স্বদেশি অন্তরবস্তু বুঝিতে হইলে আমাদের রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তা সম্বন্ধে সকল চিন্তা এবং ভাবনার সংবাদ লইতে হইবে। সেই চিন্তার ইতিহাস সম্প্রতি অধ্যাপক প্রত্যুষকুমার রীত তাঁহার *রবীন্দ্রনাথ : স্বদেশি আন্দোলন ও ভান্ডার পত্রিকা* গ্রন্থে (১৯০৫) উপস্থিত করিয়াছেন। এই ইতিহাস স্বদেশি আন্দোলনের মর্মকথা বুঝিবার জন্য অপরিহার্য।

আজ স্বদেশি আন্দোলন বলিতে আমরা একটি রাজনৈতিক আন্দোলন বুঝি। এই আন্দোলনের কথা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্বকথা। কিন্তু এই আন্দোলন আবার একটি গভীর ভাবের আন্দোলন। ইহা আমাদের স্বদেশিভাবের আন্দোলন। অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার সহধর্মিণী অধ্যাপিকা উমা মুখোপাধ্যায়-রচিত *India's Fight for Freedom or the Swadeshi Movement (1905-1906)* গ্রন্থখানি এই বিষয় সম্বন্ধে আদি এবং আজও একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করিতে পারি যে এই দুইজন ঐতিহাসিক দ্বারা লিখিত *Sri Aurobindo's Political Thought* গ্রন্থখানি এই বিষয় সম্বন্ধে একখানি অপরিহার্য গ্রন্থ। ইহা ১৮৯৩ হইতে ১৯০৮ পর্যন্ত *ইন্দুপ্রকাশ* এবং *বন্দে মাতরম্* পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীঅরবিন্দের প্রবেন্ধর সংকলন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, '*Sri Aurobindo's Political Thought* which is their latest contribution to the historical literature on Modern India also reveals the same admirale qualities of the authors as sober and scientific students of history.' রবীন্দ্রনাথ এইসব প্রবন্ধ যত্ন করিয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তবু বলি, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তা তাঁহার স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল। স্বদেশি আন্দোলনের মূল ভাবটি তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন এবং এই উপলব্ধি এই বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার সমস্ত রচনার উপজীব্য এবং রবীন্দ্রনাথের এই স্বদেশচিন্তা তাঁহার স্বদেশি গানে স্মরণীয় ভাষায় বিধৃত।

*জীবনস্মৃতি*-র 'স্বাদেশিকতা' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল।' তবে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমের কতগুলি লক্ষণ আমাদের স্বদেশি আন্দোলনকে এক নূতন মর্যাদা দিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি আন্দোলন একটি ভাবের আন্দোলন। রাজনীতির হট্টগোল তিনি এড়াইয়া চলিতেন। তাঁহার এই স্বদেশপ্রীতির নিবিড়তা আমরা বোধহয় আজকাল উপলব্ধি করিতে পারি না। ১৯০৫ সালে রচিত একটি গানে এই স্বদেশপ্রীতি বড়ো সুন্দর ভাষায় প্রকাশিত :

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে।
যদি কেউ কথা না-কয়, ওরে ও অভাগা,
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়—
তবে পরান খুলে
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে॥

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি গান বাংলা সাহিত্যের এক পরম সম্পদ, কিন্তু তাঁহার স্বদেশি গানের বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে এ বিষয়ে তাঁহার প্রবন্ধগুলিও যত্ন করিয়া পড়িতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশভাবনা কেবল রাজনৈতিক ভাবনা, এ কথা বলিতে পারি না। স্বদেশের মঙ্গল বলিতে রবীন্দ্রনাথ জীবনের সর্বক্ষেত্রের মঙ্গলের কথাই ভাবিতেন। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার বৈশিষ্ট্য এইখানেই। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথের একটি উক্তি স্মরণ করিতে পারি। তিনি বলিয়াছেন, 'স্বদেশি আন্দোলন যদি কেবলমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলন হত তাহলে জ্যাঠামহাশয়রা বা বাবা তত উৎসাহ পেতেন কিনা সন্দেহ।' রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তা যে বিচিত্রপথগামী ছিল সে কথা আমরা বোধহয় এখন আর উপলব্ধি করিতে পারি না। সজনীকান্ত দাস লিখিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে একদিন বলিয়াছিলেন, 'দুর্ভাগ্যের বিষয় সে ইতিহাস কেউ লিখে রাখেনি। আজ চেষ্টা করলেও তোমরা সে নষ্ট ইতিহাস উদ্ধার করতে পারবে না; টুকরো টুকরো খবর পাবে, কিন্তু আমাদের সেই নিরলস সাধনার সম্পূর্ণ ইতিহাস কোনদিনই আর লোকচক্ষুর গোচরে আসবে না। আসবে না তার বড় কারণ এই যে, আমারই স্বহস্তরচিত সেই বিপুল উদ্যমের খসড়া যাঁদের হাতে ছিল, রাজার প্রহরীর ভয়ে তাঁরা একদিন তা নিঃশেষে অগ্নিসাৎ করে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। আমার অনেকদিনের অনেক ভাবনা সেই সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।' স্বদেশের সার্বিক উন্নতির জন্য রবীন্দ্রনাথের সকল কর্ম ও সকল চিন্তার পূর্ণ ইতিহাস আমরা এখন আর পাইব না। এই সংক্রান্ত সকল কাগজপত্র পাঞ্জাবে সরলা দেবীর বাড়িতে পুড়াইয়া ফেলা হইয়াছিল। কিন্তু এই বিষয়ে অনেক সংবাদ *ভাণ্ডার* পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। *ভাণ্ডার* পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তা মূলত সমাজ-উন্নয়নের পরিকল্পনা। ১৮৮৮ সালে রচিত এবং *মানসী* কাব্যগ্রন্থে 'পরিত্যক্ত' নামে একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন :

দাঁড়ায়ে বিশাল ধরণীর তলে
ঘুচে গেল ভয় লাজ,
বুঝিতে পারিনু এ জগৎ-মাঝে
আমারও রয়েছে কাজ।
স্বদেশের কাছে দাঁড়ায়ে প্রভাতে
কহিলাম জোড় করে,
'এই লহ, মাতঃ এ চিরজীবন
সঁপিনু তোমারি তরে।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সারাজীবনে এই সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। ২৫ অক্টোবর ১৯৩০ তারিখে ইন্দিরা দেবীকে একটি পত্রে তিনি লিখিলেন, 'দেশের কাজ করব বলে একদিন কোমর বেঁধে লেগেছিলেম। দেহের দিকে তাকাইনি, তহবিলের দিকে তাকাই নি, আরামের দিকে না, অবকাশের দিকে না ... । —স্বদেশের অতি সব অযোগ্য লোকের দ্বারে দ্বারে ফিরেচি মাথা হেঁট করে।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই আত্মনিবেদন মনে হয় দেশের হৃদয় স্পর্শ করে নাই। তিনি হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত একটি পত্রে বলিলেন, 'স্বদেশী সমাজ' লেখায় কংগ্রেসী নেতারা তাঁর উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিল (২১।১০।১৯৩২)। তাঁরা অবজ্ঞা করে বলেছেন, অশিক্ষাবশতই রবীন্দ্রনাথ বলতে পেরেছেন যে 'প্রজারা নিজেদের শাসনশক্তি নিজেরাই উদ্ভাবন করতে পারে।' রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার একটি শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ১৯০৪ সালে রচিত তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধটি। এই স্বদেশি সমাজের পরিকল্পনা লইয়াই তিনি পল্লী উন্নয়নে ব্রতী হইয়াছিলেন। এই কর্মে তাঁহার সহায় ছিলেন কালীমোহন ঘোষ। বিশ্বভারতীর ছত্রছায়ায় শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা এই সমাজ-কর্মসাধনার এক শ্রেষ্ঠ ফল। *চিত্রা* কাব্যের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন :

এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা— এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা...।

এখন কথা হইল রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার মূল কথা কী? রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার মূল কথাটি যদি বুঝিতে পারি, তাহা হইলে কেবল স্বদেশি আন্দোলনই নহে, স্বাধীন ভারতে আমাদের স্বদেশচিন্তা কী হওয়া উচিত তাহাও বুঝিতে পারিব। কারণ রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার উৎস তাঁহার ভারতচিন্তা। রাজনৈতিক জীবন এখন হইয়া উঠিয়াছে এক ক্ষমতার লড়াই। রাজনীতিতে কে কত বড়ো ইহাই এখন আমাদের একমাত্র প্রশ্ন। দেশের এখন কী অবস্থা এবং এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্যে আমরা কী করিব, এই চিন্তা আমরা এখন বড়ো করি না। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তা হইল তাঁর স্বদেশদর্শন। এই চিন্তার মূলে একটি গভীর ভারতচিন্তা। স্বদেশি আন্দোলনের সময় 'স্বদেশ' বলিতে আমরা কেবল বঙ্গদেশ বুঝিতাম না। আমাদের স্বদেশ ছিল ভারতবর্ষ। স্বদেশচিন্তা যে ভারতচিন্তারই এক অংশ তাহা আমাদের আজ বুঝিয়া লইতে হইবে। আমাদের বঙ্গ-ভাবনা যে আমাদের ভারত-ভাবনার একটি অংশ তাহা ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি মাইকেল মধুসূদন তাঁহার একটি সনেটে সুন্দর বুঝাইয়াছেন : 'জ্যোতির্ময় কর বঙ্গ— ভারত-রতনে'। এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে আমাদের কবি যেমন লিখিতেন 'ভারত আমার ভারত আমার যেখানে মানব মেলিল নেত্র', তেমনই আবার লিখিলেন 'বঙ্গ আমার জননী আমার'। বস্তুত ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশি আন্দোলনকে আমরা বলিতে পারি, ইহা আমাদের স্বদেশি আন্দোলনের পূর্বকথা।

অধ্যাপক হরিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায়ের *স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাস* (১৯৫৮) গ্রন্থের ভূমিকায় রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন, 'Viewed in its true perspective it was the real beginning of that conscious urge for freedom from the British yoke in India which culminated in the achievement of India's independence in 1947.' মহাত্মা গান্ধীও কিন্তু স্বদেশি আন্দোলন সম্বন্ধে এই কথাই বলিয়াছেন। স্বদেশি আন্দোলনের সময়েই ১৯০৮ সালে গান্ধীজী বলেন, 'The real awakening (of India) took place after the partition of Bengal. That day may be considered to be the day of the partition of British Empire. ... After Partition the people saw that they must be capable of suffering. This new spirit must be considered to be the chief result of the partition.'

স্বদেশি আন্দোলন এক অর্থে একটি ভারতীয় আন্দোলন ছিল। এই কথা বলিলাম ইহা ভাবিয়া যে, এই আন্দোলনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল কলিকাতার 'শিবাজী-উৎসব'। সখারাম গণেশ দেউস্কর মহারাষ্ট্রের শিবাজী-উৎসবের অনুকরণে কলিকাতায় ১৯০২ সালে শিবাজী-উৎসবের প্রচলন করেন। রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী-উৎসব' কবিতাটি এই উপলক্ষেই লিখিত হয়। কিছু পরেই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের *সন্ধ্যা* পত্রিকাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ *ভান্ডার* পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। এই বৎসরেই ভারত সরকারের গেজেটে বঙ্গবিভাগের প্রস্তাব কার্যকর হয়। ১৯০৫ সালের ৭ অগস্ট টাউন হলে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯০৫-এর ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ-রদের আন্দোলন কলিকাতায় আরম্ভ। ওই দিন রবীন্দ্রনাথকে পুরোভাগে রাখিয়া এক বিরাট শোভযাত্রা গঙ্গাতীরে উপস্থিত হয় এবং পরস্পরের হাতে রাখী পরাইয়া দেয়। ওই দিনই দ্বিপ্রহরে ২৯৪ আপার সার্কুলার রোডে ফেডারেশন হল্‌-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। এই সভায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি ছিলেন আনন্দমোহন বসু।

এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারি, এই স্বদেশি আন্দোলনকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতাগণ কী চোখে দেখিতেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও গান্ধীর অভিমত পূর্বেই উপস্থিত করিয়াছি। গোখলে বলিলেন, 'I have said more than once, but I think the idea bears repetition, that Swadeshism at its highest is not merely an industrial movement but that it affects the whole life of the nation— that

Swadeshism at its highest is a deep, passionate, fervent, all embracing love of the motherland, and that this love seeks to show itself, not in one sphere of activity only, but in all; it involves the whole man and it will not rest until it has raised the whole man. My own personal conviction is that in this movement we shall ultimately find the true salvation of India.'

উপসংহারে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বদেশি আন্দোলনের স্থান কোথায়? প্রথম কথা, যদিও ঐতিহাসিক কারণে এই আন্দোলনকে আমরা একটি বঙ্গীয় আন্দোলন বলিয়া বিচার করি, ইহা একটি ভারতীয় আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যাঁহার গান ও প্রবন্ধ ইহার মর্মকথা চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। তিনি আমাদের ভারতীয় রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ পুরুষ এবং তিনি বাঙালি স্বদেশি আন্দোলনের প্রধান প্রবক্তা। এই আন্দোলনের মর্যাদা আমরা তাঁহার চিন্তায় পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। এই কথার সত্য ধরিয়া বলিতে পারি যে স্বদেশি আন্দোলন ভারতীয় রেনেসাঁসের এক বিশেষ প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের একটি স্বদেশি গানে কবি বলিলেন :

ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা॥

এই আন্দোলনে বাঙালির বঙ্গবোধ ভারতবোধের সঙ্গে মিশিয়া এক বিশ্ববোধে পরিণত। রবীন্দ্রনাথ ১৯০৫ সালে রচিত একটি গানে বলিয়াছেন :

আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী।

রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিতে বঙ্গদেশ সারা বিশ্ব হইয়া উঠিয়াছে। মায়ের দুয়ার খুলিয়া গিয়াছে সোনার মন্দিরে। সেই মন্দির বিশ্ব-মন্দির। বাঙলা-মায়ের মন্দিরে আসিয়া তিনি যেন ভারতের মহামানবের সাগরতীরে পৌঁছিয়াছেন,

মার অভিষেক এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থ নীরে—
আজি ভারতের মহামানবের সাগর তীরে॥

# শেষ থেকে শুরু : *বিষবৃক্ষ* ও *চোখের বালি*

যূথিকা বসু

বঙ্কিমচন্দ্র *বিষবৃক্ষ* (১৮৭২) উপন্যাসটি লিখে ঔপন্যাসিক হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। সেকালে এইজাতীয় রচনা বিরল বললেই চলে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছিলেন : 'বঙ্গদর্শনের যে জিনিসটা সেদিন বাংলা দেশের ঘরে ঘরে সকলের মনকে নাড়া দিয়েছিল সে হচ্ছে বিষবৃক্ষ।' অতএব পাঠকসমাজে উপন্যাসটির প্রচার যথেষ্টই হয়েছিল, বোঝা যায়। এমন বহুল প্রচারিত উপন্যাসটির ঔপন্যাসিকের মূল প্রতিপাদ্য কী ছিল তা আর একবার যাচাই করে নেওয়া যেতে পারে। প্রখ্যাত সমালোচক গোপাল হালদারের মতে : 'পর্বান্তর এল। 'বিষবৃক্ষে' পটভূমি বদলে গেল। সমসাময়িক দেশকালের পরিচিত জীবনযাত্রার মধ্যে বঙ্কিম পদস্থাপনা করলেন,— সেই পরিচিতের মধ্যে তিনি জীবনের রূপরসের উদ্বোধন করবেন। আসলে পরিপ্রেক্ষিতও বদলে গেল। তখন থেকে বঙ্কিমের রোমান্টিক চেতনা পরিকল্পিত হল জীবন-জিজ্ঞাসার নিয়মে— আরম্ভ হল 'জীবন লইয়া কি করিব?' এই গম্ভীর জিজ্ঞাসা,— প্রবৃত্তির ও সংযমের প্রাণক্ষয়ী দ্বন্দ্ব, আরম্ভ হল নীতিচেতনার পর্ব। *বিষবৃক্ষ* থেকে *কৃষ্ণকান্তের উইল* পর্যন্ত উপন্যাসগুলিতে এই জিজ্ঞাসার গভীরতা দেখা যায়। দেখা যায়— জীবনধর্মের রক্তাক্ত সংগ্রামের রূপ, রসচেতনার সঙ্গে নীতিচেতনার দ্বন্দ্ব-মিলন ও সমন্বয়ের ক্রমাগত প্রয়াস।' বঙ্কিমচন্দ্রের *বিষবৃক্ষ* উপন্যাসের অন্তরে রয়েছে এই দ্বন্দ্ব— নীতিবোধের সঙ্গে শিল্পবোধের দ্বন্দ্ব।

*বিষবৃক্ষ* উপন্যাসের মূল সমস্যা অবশ্যই বিধবাবিবাহ নয়। উপন্যাসের শুরুতে *দীপনির্ব্বাণ* অংশে নগেন্দ্রনাথ মৃত পিতার পাশে উপবিষ্ট কুন্দকে দেখেছিলেন 'এক অনিন্দিত গৌরকান্তি স্নিগ্ধজ্যোতির্ম্ময়রূপিণী বালিকা' রূপে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে 'অনেক প্রকারের কথা'তে নগেন্দ্রনাথ কুন্দ সম্পর্কে হরদেব ঘোষালকে লিখছেন . 'বল দেখি, কোন্ বয়সে স্ত্রীলোক সুন্দরী? তুমি বলিবে, চল্লিশের পরে, কেন না, তোমার ব্রাহ্মণীর আরও দুই এক বৎসর হইয়াছে। কুন্দ নামে যে কন্যার পরিচয় দিলাম— তাহার বয়স তের বৎসর। তাহাকে দেখিয়া বোধ হয় যে, এই সৌন্দর্য্যের সময়। প্রথম যৌবন সঞ্চারের অব্যবহিত পূর্ব্বেই যেরূপ মাধুর্য্য এবং সরলতা থাকে, পরে তত থাকে না। এই কুন্দের সরলতা চমৎকার; সে কিছুই বুঝে না। ... কমল তাহাকে লেখাপড়া শিখাইতেছে। ... কিন্তু অন্য কোন কথাই বুঝে না। বলিলে বৃহৎ নীল দুইটি চক্ষু— চক্ষু দুইটি শরতের পদ্মের মত সর্ব্বদাই স্বচ্ছ জলে ভাসিতেছে— সেই দুইটি চক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া চাহিয়া থাকে; কিছু বলে না— আমি সে চক্ষু দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্ক হই, আর বুঝাইতে পারি না। ... যদি তোমাকে সেই দুইটি চক্ষুর সম্মুখে দাঁড় করাইতে পারি, তবে তোমারও মতিস্থৈর্য্যের পরিচয় পাই। চক্ষু দুইটি যে কিরূপ, তাহা আমি এ পর্য্যন্ত স্থির করিতে পারিলাম না। তাহা দুইবার একরকম দেখিলাম না; আমার বোধ হয়, যেন এ পৃথিবীর সে চোখ নয়; এ পৃথিবীর সামগ্রী যেন ভাল করিয়া দেখে না; ... কুন্দ যে নির্দ্দোষ সুন্দরী, তাহা নহে। অনেকের সঙ্গে তুলনায় তাহার মুখাবয়ব অপেক্ষাকৃত অপ্রশংসনীয় বোধ হয়, অথচ আমার বোধ হয়, এমন সুন্দরী কখনও দেখি নাই। বোধ হয় যেন কুন্দনন্দিনীতে পৃথিবী ছাড়া কিছু আছে, রক্তমাংসের গঠন নয়; যেন চন্দ্রকর কি পুষ্পসৌরভকে শরীরী করিয়া তাহাকে গড়িয়াছে। তাহার সঙ্গে তুলনা করিবার

সামগ্রী হঠাৎ মনে হয় না। অতুল্য পদার্থটি, তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ শান্তভাবব্যক্তি— যদি, স্বচ্ছ সরোবরে শরচ্চন্দ্রের কিরণসম্পাতে যে ভাবব্যক্তি, তাহা বিশেষ করিয়া দেখ, তবে ইহার সাদৃশ্য কতক অনুভূত করিতে পারিবে। তুলনার অন্য সামগ্রী পাইলাম না।'

কুন্দনন্দিনীর রূপমাধুরী সম্পর্কে নগেন্দ্রনাথের সচেতনতা লক্ষ করার মতো। যদি এমন হত যে, জমিদার নগেন্দ্রনাথ সহায়সম্বলহীন একটি কিশোরীকে তাঁর নিজের আশ্রয় দিয়েছেন মাত্র, তবে তাকে নিয়ে এত গভীর চিন্তার যেমন কোনো কারণ থাকত না, তেমনি তার রূপসৌন্দর্য সম্পর্কে এত সচেতনতা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণেরও কোনো কারণ ঘটত না। হয়ত নিরাশ্রিতাকেই নগেন্দ্রনাথ আশ্রয় দিয়েছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আশ্রিতার সৌন্দর্য সম্পর্কেও এত অধিকমাত্রায় আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন নগেন্দ্রনাথ, প্রকারান্তরে যার নাম রূপমুগ্ধতা।

এখনও পর্যন্ত কুন্দ কুমারী। অর্থাৎ নগেন্দ্রনাথ কুমারী কুন্দের প্রতিই যথেষ্টমাত্রায় দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। অতঃপর তারাচরণের বিধবা স্ত্রী কুন্দ নগেন্দ্রর গৃহেই কালাতিপাত করতে লাগল। একাদশ পরিচ্ছেদ 'সূর্য্যমুখীর পত্র'তে সূর্যমুখী কমলমণিকে লিখছেন : 'আমি আপনার চিতা আপনি সাজাইয়াছি। কুন্দনন্দিনী যদি না খাইয়া মরিত তাহাতে আমার কি ক্ষতি ছিল?... এখন তাহার বয়স ১৭/১৮ বৎসর হইয়াছে। সে যে সুন্দরী, তাহা স্বীকার করিতেছি। সেই সৌন্দর্য্যই আমার কাল হইয়াছে।

> 'পৃথিবীতে যদি আমার কোন সুখ থাকে, তবে সে স্বামী; ... সেই স্বামীর স্নেহে কুন্দনন্দিনী আমাকে বঞ্চিত করিতেছে।
>
> '... তোমার সহোদরকে মন্দ বলিও না। ... আমি প্রত্যহ দেখিতে পাই তিনি প্রাণপণে আপনার চিত্তকে বশ করিতেছেন।'

কুন্দনন্দিনীর প্রতি তার কুমারী অবস্থা থেকেই নগেন্দ্রনাথের যে আকর্ষণ গড়ে উঠেছিল, বর্তমানের বৈধব্য অবস্থায়ও তার কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটে নি। এখনও কুন্দর নাম মুখে না আনার জন্য নগেন্দ্রনাথকে চেষ্টা করতে হয়। কেন? উত্তর— কুন্দের রূপের প্রতি আসক্তি, কুন্দের প্রতি আসক্তি। কুন্দকে মাঝে মাঝে অকারণেই ভর্ৎসনা করেন নগেন্দ্রনাথ। সে ভর্ৎসনার মূল লক্ষ্য কে? নগেন্দ্রনাথ নিজেই। কেন? কুন্দের প্রতি আসক্তি এবং আত্মসংযমে ব্যর্থতাই এর উত্তর। কুন্দের কণ্ঠস্বর শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব থাকেন নগেন্দ্রনাথ। সূর্যমুখী কমলণিকে চিঠিতে লিখেছেন, 'তিনি আপনার মনে আমার নিকট অপরাধী। কিন্তু ইহাও বুঝিতে পারি যে, আমি তাঁহার মনে স্থান পাই না। যত্ন এক, ভালবাসা আর, ইহার মধ্যে প্রভেদ কি— আমরা স্ত্রীলোক সহজেই বুঝিতে পারি।' এই চিঠিতেই বিধবাবিবাহের প্রসঙ্গ আছে এবং সূর্যমুখীর বক্তব্য থেকে বোঝাই যায় যে, তিনি বিধবাবিবাহের ঘোরতর বিরোধী। কুন্দর মতো বৈধব্য সেকালে বহু নারীরই কপালের লিখন ছিল। আর এ সবই হত বাল্যবিবাহের কুফলের কারণে।

এই অবস্থার দিনকয়েক পর থেকেই নগেন্দ্রর 'চরিত্র' 'পরিবর্ত্তিত' হতে শুরু করল। আগে নগেন্দ্র শীতলস্বভাব ছিলেন, 'এখন কথায় কথায় রাগ।' কুন্দের রূপমোহে বিভোর বিবাহিত নগেন্দ্র এখন আর সূর্যমুখীকেও সহ্য করতে পারেন না। কুন্দও নগেন্দ্রের দেবকান্তরূপে আকৃষ্ট হয়েছিল, স্বপ্নাদেশ ভুলেছিল। তবে একমাত্র কমলমণির জেরার কাছেই সে আত্মসমর্পণ করেছিল, অন্যত্র নয়। কুন্দর সঙ্গে তারাচরণের বিবাহ দেবার জন্য যখন কমলমণি-সূর্যমুখী-নগেন্দ্র তিনজনেই সম্মত হয়েছিলেন তখনই ঔপন্যাসিক ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন : 'এখন কমলমণি, সূর্যমুখী, নগেন্দ্র, তিনজনে মিলিত হইয়া বিষবীজ রোপন করিলেন। পরে তিনজনেই হাহাকার করিবেন।' উপন্যাসের বিষবৃক্ষটি হল বিবাহিত পুরুষের পরনারীর প্রতি রূপজমোহ এবং এই-ই উপন্যাসটিরও বীজ।

যোড়শ পরিচ্ছেদ 'না'তে 'উদ্যান মধ্যস্থ বাপীতটে' সকলের অলক্ষ্যে কুন্দনন্দিনীর 'পৃষ্টে নগেন্দ্রনাথ অঙ্গুলিস্পর্শ' করলে ঔপন্যাসিক যেন তীব্রস্বরে বলে উঠেছেন : 'আর নগেন্দ্র! এই কি তোমার এতকালের

সুচরিত্র? এই কি তোমার এতকালের শিক্ষা? এই কি সূর্য্যমুখীর প্রাণপণ প্রণয়ের প্রতিফল! ছি ছি! দেখ, তুমি চোর! চোরের অপেক্ষাও হীন।... সূর্য্যমুখী তোমাকে সর্ব্বস্ব দিয়াছে— তবু তুমি চোরের অধিক চুরি করিতে আসিয়াছ।'

নগেন্দ্রের কী অভাব ছিল? দেবকান্তরূপ, অতুল ঐশ্বর্য, সূর্যমুখীর মতো সতী সাধ্বী গুণী স্ত্রী— এত প্রাপ্তির পরও তার চিত্তবৈকল্য ঘটেছিল। সূর্য্যমুখী-প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন : 'সূর্য্যমুখী পূর্ণচন্দ্রতুল্য তপ্তকাঞ্চনবর্ণা। ... সূর্য্যমুখীর চক্ষু সুদীর্ঘ, অলকস্পর্শী ভ্রূযুগসমাশ্রিত, কমনীয় পল্লবরেখার মধ্যস্থ, স্থূলকৃষ্ণতারাসনাথ, মণ্ডলাংশের আকারে ঈষৎ স্ফীত, উজ্জ্বল অথচ মন্দগতিবিশিষ্ট।... সূর্য্যমুখীর বয়স প্রায় ষট্‌বিংশতি।'

একবিংশ পরিচ্ছেদে 'হীরার কলহ—বিষবৃক্ষের মুকুল' অংশে নগেন্দ্রনাথ সূর্যমুখীর কাছে আপন চিত্তদৌর্বল্যের কথা স্বীকার করেছেন : 'তোমায় বলিতে হইবে না। আমি জানি, তুমি সন্দেহ করিয়াছিলে যে, আমি কুন্দনন্দিনীতে অনুরক্ত।

> '... যদি কথা পাড়িলে, তবে মনের কথা ব্যক্ত করিয়া বলি— ... আমি এ সংসার ত্যাগ করিব। মরিব না— কিন্তু দেশান্তরে যাইব। বাড়ী ঘর সংসারে আর সুখ নাই। তোমাতে আমার আর সুখ নাই। আমি তোমার অযোগ্য স্বামী। আমি আর কাছে থাকিয়া তোমাকে ক্লেশ দিব না।'

বিধবা কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করা যখন স্থির করলেন তখন নগেন্দ্রনাথ ভগ্নিপতি শ্রীশচন্দ্রকে লিখলেন : 'যদি কেহ বলে যে, বিধবাবিবাহ হিন্দুধর্মবিরুদ্ধ, তাহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবন্ধ পড়িতে দিই।

> '... আর যদি বল, শাস্ত্রসম্মত হইলেও ইহা সমাজসম্মত নহে, আমি এ বিবাহ করিলে সমাজচ্যুত হইব; তাহার উত্তর, এ গোবিন্দপুরে আমাকে সমাজচ্যুত করে কার সাধ্য?
>
> '... তুমি বলিবে, দুই বিবাহ নীতি-বিরুদ্ধ কাজ। ... কিন্তু ইংরেজেরা কি অভ্রান্ত?
>
> '... তুমি বলিবে, যদি একপুরুষের দুই স্ত্রী হইতে পারে, তবে এক স্ত্রীর দুই স্বামী না হয় কেন? উত্তর— অনেক অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা; সন্তানের পিতৃনিরূপণ হয় না ...।
>
> '... যাহা অধিকাংশ লোকের অনিষ্টকারক, তাহাই নীতিবিরুদ্ধ ...। তবে দেখাও যে, ইহা অধিকাংশ লোকের অনিষ্টকর।
>
> '... শেষ আপত্তি—সূর্য্যমুখী। ... তিনিই বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন ... তবে আর কাহার আপত্তি?'

একদিকে প্রণয়াধিক্য, অপরদিকে নীতিবোধের সঙ্গে লড়াই— শ্রীশচন্দ্রকে চিঠিটি লেখা হলেও এই দ্বন্দ্ব ও বোঝাপড়া নগেন্দ্রনাথের নিজের সঙ্গেই। পরিণামে গৃহবিপর্যয় ঘটে গেলে প্রণয় দূরে গেল, নৈতিকতারই জয় হল। এ সময় কুন্দ হল 'লোহার শিকল' আর সূর্যমুখী হলেন 'মুক্তার হার'। নগেন্দ্রনাথ স্বীকার করলেন যে, কুন্দকে তাঁর বিবাহ ভ্রান্তিমূলক যার জন্য সূর্যমুখীকে হারাতে হল। ঔপন্যাসিক দ্বাত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদে : 'বিষবৃক্ষের ফল' অংশে স্পষ্টই বলেছেন যে, রূপজ মোহে যে প্রণয়ের জন্ম 'তাহার তীক্ষ্ণতা পৌনঃপুন্যে হ্রস্ব হয়। ... গুণজনিতের পরিতৃপ্তি নাই। ... গুণজনিত প্রণয় চিরস্থায়ী বটে— কিন্তু গুণ চিনিতে দিন লাগে। এই জন্য সে প্রণয় একেবারে হঠাৎ বলবান্ হয় না— ক্রমে সঞ্চারিত হয়। ... রূপজ ... মোহের প্রথম বলে সূর্য্যমুখীর প্রতি তোমার যে স্থায়ী প্রেম, তাহা তোমার পক্ষে অদৃশ্য হইয়াছিল। এই তোমার ভ্রান্তি। এ ভ্রান্তি মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ।' আর এইজন্যই শেষপর্যন্ত উপন্যাসে কুন্দকে আত্মহত্যা করতে হল, নগেন্দ্রনাথকে সূর্যমুখীকে হারাতে হল।

অতঃপর প্রশ্ন এইখানেই সৃষ্টি হল যে, যে কোনো সৃষ্টিশীল শিল্পী-সাহিত্যিককেই তাঁর সৃষ্টিকর্মকে অমরতা দানের জন্য সমকালকে উত্তীর্ণ হয়ে যেতেই হয়, ভাবি সম্ভাবনাকেই মর্যাদা দিয়ে উজ্জ্বল করে তুলতে হয়। এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ঔপন্যাসিক বিবাহিত কুন্দ-নগেন্দ্রের প্রণয়কে স্বীকার করে নিলেন, যা সমকালে ছিল রীতিমতো বিদ্রোহ। কিন্তু তবুও শেষরক্ষা হল না— নীতিপরায়ণতার আধিক্যই বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পীসত্তাকে পর্যুদস্ত করল। যে নীতির প্রশ্ন তিনি উপন্যাসে তুলে ধরেছিলেন তাতেই তিনি উপন্যাসটির শেষ কথা উচ্চারণ

করলেন, 'আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।' এই মন্তব্যই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। বিবাহিত নারী অথবা পুরুষের রূপমোহজনিত সমাজবিগর্হিত প্রণয় যে পরিণামে সুখদায়ী হয় না, তাই-ই বঙ্কিমচন্দ্র প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

তবে বঙ্কিমচন্দ্রের কুন্দহত্যা ঘটনাটি সমকালের তো নয়ই, কোনোকালের পাঠকই মেনে নেন নি। আর এই জায়গা থেকেই মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের *চোখের বালি* উপন্যাসের সূত্রপাত। *চোখের বালি* উপন্যাসে *বিষবৃক্ষ*-এর মতোই দুই নারী এক পুরুষ, তবে বিহারীর ভূমিকা উপন্যাসে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণে চরিত্রের ছক একটু পরিবর্তিত হয়েছে— দুই নারী, দুই পুরুষ।

মহেন্দ্র শৈশবে পিতৃহীন হওয়ায় 'বাল্যকাল হইতে ... দেবতা ও মানবের কাছে সর্বপ্রকারে প্রশ্রয় পাইয়াছে। এইজন্য তাহার ইচ্ছার বেগ উচ্ছৃঙ্খল। পরে ইচ্ছার চাপ সে সহিতে পারে না।' মহেন্দ্র এই উচ্ছৃঙ্খল ইচ্ছার বেগেই বিহারীর সঙ্গে বিবাহ স্থির হওয়া পাত্রীকে অকস্মাৎ বিবাহ করার জন্য মনস্থির করে ফেলেছে। পিতৃমাতৃহীনা কন্যাটির নাম 'আশালতা' শুনেই মহেন্দ্রের মনে হল 'নামটি বড়ো করুণ এবং কণ্ঠটি বড়ো কোমল। অনাথা আশা!' এখান থেকেই মহেন্দ্রর দুর্বলতা শুরু। অথচ এর আগে যখন মহেন্দ্রের সঙ্গে আশার বিবাহের কথা হয়েছিল তখন তাড়াতাড়ি সে উত্তর দিয়েছিল : 'আমার জন্য নয় কাকী, আমি বিহারীকে রাজি করিয়েছি।' মহেন্দ্রের উচ্ছৃঙ্খল আবেগের ক্রমাগত প্রকাশ আমরা দেখেছি আশাকে বিবাহের পর দাম্পত্য প্রণয়ে। সেখানেও ঘটেছে আতিশয্যের চূড়ান্ত এবং অবহেলিতা অপমানিতা রাজলক্ষ্মী সংসার ত্যাগ করেছেন। গ্রামের বাড়িতে মা-কে যে পত্র মহেন্দ্র লিখেছে, সেখানে সাধারণ সৌজন্যটুকুও রক্ষিত হয় নি, সর্বত্র উচ্ছৃঙ্খল আবেগের'ই প্রকাশ ঘটেছে। বিনোদিনী রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে কলকাতার বাড়িতে এলে ধীরে ধীরে আশার প্রতি 'মহেন্দ্রেব বাহুপাশ শিথিল এবং তাহার মুগ্ধদৃষ্টি যেন ক্লান্তিতে আবৃত হইয়া আসিতেছে। ... আশার সাংসারিক অপটুতায় সে ক্ষণে ক্ষণে বিরক্ত হয়, কিন্তু প্রকাশ করিয়া বলে না। ... মহেন্দ্রের সোহাগের মধ্যে বেসুর লাগিতেছিল— কতকটা মিথ্যা বাড়াবাড়ি, কতকটা আত্মপ্রতারণা।' শুরু হল বিনোদিনীর সঙ্গে প্রতি কাজে আশার তুলনা। আশা তেমন লেখাপড়া-না-জানা কিশোরী বালিকা, আর একসময়ে প্রত্যাখ্যাতা বিনোদিনী মেমসাহেবের কাছে গানবাজনা, লেখাপড়া শেখা পূর্ণযুবতী। সেই 'ইচ্ছার' উচ্ছৃঙ্খল আবেগে মহেন্দ্র সংযমের সমস্ত বাঁধনকে ধীরে ধীরে মুক্তি দিয়েছে। কখনো কখনো চেষ্টা করেছে আত্মসংবরণ করতে, কিন্তু পরমুহূর্তেই তা দ্বিগুণ বেগে সমস্ত ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। আধুনিকা শিক্ষিতা গৃহকর্মনিপুণা বিনোদিনীর প্রতি মহেন্দ্রের আকর্ষণ দিনে দিনে বৃদ্ধি পেয়ে শেষপর্যন্ত চূড়ান্ত মাত্রায় গিয়ে পৌঁছেছে— মহেন্দ্র বিনোদিনীকে নিয়ে গৃহ পরিত্যাগ করেছে। একসময় কিশোরী আশার প্রতি মহেন্দ্রর আসক্তি ছিল সীমাহীন, এখন যুবতী বিনোদিনীর প্রতি তা আরো বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। মনে রাখতে হবে আজ বিনোদিনী পরস্ত্রী এবং বিধবা, কিন্তু মহেন্দ্রদের সংসারে সে শৈশবাবধিই সুপরিচিত ছিল, মহেন্দ্রর সঙ্গে একসময় বিবাহের কথাও হয়েছিল। হয়তো সে কারণেই যে প্রাপ্তিতে চরম বিঘ্ন সেখানেই মহেন্দ্রর আকর্ষণ তৈরি হয়েছে সীমাতিশায়ী— আর একেই বলে ভবিতব্য।

বিনোদিনীর আচরণও প্রশ্নাতীত ছিল না। আশার সঙ্গে 'চোখের বালি' পাতানো থেকেই তার মনোভাব স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এ কথা সরলা আশা বুঝতে না পারলেও পাঠকের বুঝতে কোনোই অসুবিধা হয় না। গ্রামের বাড়িতে রাজলক্ষ্মীকে লেখা মহেন্দ্রের চিঠি বিনোদিনীর অস্থিরতাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। মহেন্দ্র-বিনোদিনীর বিবাহ প্রসঙ্গকে মাতা ও পুত্রের মধ্যে তৃতীয় পক্ষের অবস্থান অসম্ভব বলে যে মহেন্দ্র বাতিল করেছিল, সেই মহেন্দ্রই কিশোরী বালিকা আশাকে কেমন করেই-বা বিবাহ করল এবং এমন প্রেমোন্মাদনাই বা কী করে সম্ভব হল? বিনোদিনীর প্রতিমুহূর্তে মনে হতে লাগল 'মহেন্দ্র কেমন, আশা কেমন, মহেন্দ্র-আশার প্রণয় কেমন ...।' রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে কলকাতার বাড়িতে আসার মূলে এই কৌতূহল সক্রিয় হয়েছে। মহেন্দ্রের সংসারে থেকে মহেন্দ্রকে যাচাই করাও বিনোদিনীর লক্ষ্য ছিল।

বিনোদিনী কেমন? ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন 'সর্বগুণশালিনী বিনোদিনী' 'সর্বপ্রকার গৃহকর্মে সুনিপুণ ...।' বিনোদিনীর মধ্যে যেন জাদু ছিল, আশার সঙ্গে বন্ধুত্ব সহজেই গড়ে উঠল। আশা হল তার 'চোখের বালি।' আশার 'সুসজ্জিত শয়নঘর' তো একদিন বিনোদিনীরই হতে পারত, কিন্তু হয় নি। আজ সেই কারণেই বিনোদিনী বৈধব্যজীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছে, বাধ্য হয়েছে গ্রামের বাড়িতে একাকিনী বসবাস করতে। বিনোদিনী যেদিকে চায়, তার চোখে যেন স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ হতে থাকে : 'এমন সুখের ঘরকন্না! এমন সোহাগের স্বামী! এ ঘরকে যে আমি রাজার রাজত্ব, এ স্বামীকে যে আমি পায়ের দাস করিয়া রাখিতে পারিতাম।' এই হল বিনোদিনীর আক্ষেপ। বিপিনের বউ বিনোদিনী হলেও বর্তমান অবস্থায় যে তাকে রাজলক্ষ্মী-মহেন্দ্রের সংসারে রাখা উচিত হয় না সে বিষয়ে মহেন্দ্র নিশ্চিত, কারণ বিনোদিনী 'পরের ঘরের যুবতী বিধবা।' ... সমাজে নানা কথা রটনা হতে পারে। তাই বিহারী বিনোদিনীর বিষয়ে মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলে মহেন্দ্র হেসে বলেছে : 'ভাবিয়া রাত্রে ঘুম হয় না ... আজকাল বিনোদিনীর ধ্যানে আমার আর সকল ধ্যানই ভঙ্গ হইয়াছে।' তবু এ শুধু রসিকতা নয়, বিহারী সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করেছে : 'বল কী। দ্বিতীয় বিষবৃক্ষ।' অবশ্য বিহারীও জানে বা বুঝেছে : 'এ নারী জঙ্গলে ফেলিয়া রাখিবার নহে ... এ নারী খেলা করিবার নহে, ইহাকে উপেক্ষা করাও যায় না।' তবে তার মনেও একটা শঙ্কা কাজ করেছে : 'শিখা একভাবে ঘরের প্রদীপ রূপে জ্বলে, আর একভাবে আগুন ধরাইয়া দেয় ...।'

বিহারীর মনের এই আশঙ্কা দূরীভূত হয়ে গেছে দমদমের চড়ুইভাতির ঘটনার দিন। সেদিন বিনোদিনীর জন্য মহেন্দ্রর আকর্ষণ বা লালসাকে বিনোদিনী মোটেই সুনজরে দেখে নি। বরং বিহারীর ব্যক্তিত্ব, কর্মপটুতা বিনোদিনীকে মুগ্ধ করেছিল। সে দিন আহারান্তে বিহারীরই অনুরোধে গল্প করতে থাকা বিনোদিনীর মধ্যে বিহারী আবিষ্কার করেছিল : 'বিনোদিনী বাহিরে বিলাসিনী যুবতী বটে, কিন্তু তাহার অন্তরে একটি পূজারতা নারী নিরশনে তপস্যা করিতেছে।' সেদিনই বিহারীর মনে হয়েছিল যে, মানুষের বাইরের পরিচয়টাই 'সংসারের কাছে সত্য' হয়ে ওঠে, প্রকৃত মানুষটিকে তাই জানা যায় না। মহেন্দ্র এই 'পূজারতা নারী'র সন্ধান পায় নি, পাবার চেষ্টাও করে নি। কারণ তার মধ্যে ছিল মোহ, আসক্তি, যুবতী বিনোদিনীর প্রতি যুবক মহেন্দ্রের অমোঘ আকর্ষণ। তাই বিনোদিনীকে নিয়ে গৃহপরিত্যাগ করে বহু জায়গা ঘুরে বেড়ালেও তার মন মহেন্দ্র পায় নি। মহেন্দ্রের গ্রাস থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য বিনোদিনী বিহারীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছিল, সঙ্গে ছিল বিহারীর প্রতি শ্রদ্ধাও। ইতিপূর্বে বিনোদিনী সব কাজে বোঝাতে চেয়েছিল : 'আশাই বা কে আর বিনোদিনীই-বা কে। দুজনের মধ্যে কত প্রভেদ। প্রতিকূল ভাগ্যবশত বিনোদিনী আপন প্রতিভাকে কোনো পুরুষের চিত্তক্ষেত্রে অব্যাহতভাবে জয়ী করিতে না পারিয়া জ্বলন্ত শক্তিশেল উদ্যত করিয়া সংহারমূর্তি' ধারণ করেছিল। এই জ্বলন্ত শক্তিশেলই আশার সংসারটিকে নষ্ট করেছে ঠিকই, কিন্তু মহেন্দ্রের প্রতি তার আক্রোশ মেটানোর এই পথই সে বেছে নিয়েছিল। মহেন্দ্রকে বিবাহ করার কথা বিনোদিনী কোনোদিনই ভাবে নি। আশার সরলতার জন্য বিনোদিনীর একধরনের মায়া জন্মেছিল। একসময়ে বিহারীকে সে বলেছিল : 'ঠাকুরপো, আমি তো চিরদিন এখানে থাকিব না— কিন্তু আমি চলিয়া গেলে আমার চোখের বালির উপর একটু দৃষ্টি রাখিয়ো— সে যেন অসুখী না হয়।' তবে মহেন্দ্রকে যাচাই করার অর্থ আশার জীবনেও অশান্তি ঘনিয়ে আসা— এ দুই-ই অঙ্গাঙ্গি জড়িত।

মহেন্দ্রের সংসারে বিনোদিনীর থাকা-না-থাকা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিনোদিনীকে বিহারী বলেছে : 'বোঠান, আমি তোমাকে প্রথমে চিনি নাই, সেজন্য আমাকে ক্ষমা করো। আমিও সংকীর্ণহৃদয় সাধারণ ইতর লোকদের মতো মনে মনে তোমার সম্বন্ধে অন্যায় ধারণা স্থান দিয়াছিলাম; একবার এমনও মনে হইয়াছিল, যেন আশার সুখে তুমি ঈর্ষা করিতেছ— যেন— কিন্তু সে-সব কথা মুখে উচ্চারণ করিতেও পাপ আছে। তার পরে, তোমার দেবীহৃদয়ের পরিচয় আমি পাইয়াছি— তোমার উপর আমার গভীর ভক্তি জন্মিয়াছে বলিয়াই, আজ তোমার কাছে আমার সমস্ত অপরাধ স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

'বিনোদিনীর সর্বশারীর পুলকিত হইয়া উঠিল। যদিও সে ছলনা করিতেছিল, তবু বিহারীর এই ভক্তি-উপহার সে মনে মনেও মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। এমন জিনিস সে কোনো কাহারো কাছ হইতে পায় নাই। ক্ষণকালের জন্য মনে হইল, সে যেন যথার্থই পবিত্র, উন্নত ...।'

এরই ফলে বিহারীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে পেয়েছিল বিনোদিনী। এখানে মোহ ছিল না, অসংযম ছিল না, বরং ছিল শ্রদ্ধা। বিহারীর এই ভক্তিনম্র উপহার মুহূর্তে বিনোদিনীকে পবিত্র করে তুলেছিল যা মহেন্দ্র কোনোদিন তাকে দিতে পারে নি। বিনোদিনী কী চায় তা মহেন্দ্র কোনোদিনই বুঝবার চেষ্টা করে নি। কারণ 'পরের ইচ্ছার চাপ সে সহিতে পারে না।'

বিহারীর স্বীকৃতির আগে এমন কথা বিনোদিনী কোনোদিন শোনে নি বলেই তার মনে হয়েছিল : 'সে যাহা চায় তাহাতেই বাধা? কোনো কিছুতেই কি সে কৃতকার্য হইতে পারিবে না। সুখ যদি না পাইল, তবে যাহারা তাহার সকল সুখের অন্তরায়, যাহারা তাহাকে কৃতার্থতা হইতে ভ্রষ্ট, সমস্ত সম্ভবপর পদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, তাহাদিগকে পরাস্ত ধূলিলুণ্ঠিত করিলেই তাহার ব্যর্থ জীবনের কর্ম সমাধা হইবে।' মহেন্দ্রের প্রতি এই আক্রোশ থেকেই তার সংসারে অশান্তির আগুন জ্বলেছে।

গৃহপরিত্যক্তা বিনোদিনীকে নিয়ে বিহারী-মহেন্দ্রের মধ্যে ঝড় উঠেছে। একসময় বিনোদিনী মনে করেছিল হয়ত সে মহেন্দ্রকে ভালোবাসে। কিন্তু বিহারীর কাছে সে স্বীকার করেছে 'তাহা ভুল।' মহেন্দ্রকে সে বলেও-ছিল : "আমার কাছে কী চাও তুমি। ভালোবাসা? তোমার এ ভিক্ষাবৃত্তি কেন। জন্মকাল হইতে তুমি কেবল ভালোবাসাই পাইয়া আসিতেছ, তবু তোমার লোভের অন্ত নাই!

'... একসময় মনে করিতে তুমি আশাকে ভালোবাসিতেছ— সেও মিথ্যা। এখন মনে করিতেছ, তুমি আমাকে ভালোবাসিতেছ— এও মিথ্যা। তুমি কেবল নিজেকে ভালোবাস।

'... আমি তোমাকে বারংবার বলিতেছি, তুমি আমাকে ত্যাগ করো, আমার পশ্চাতে ফিরিয়ো না; নির্লজ্জ হইয়া আমাকে লজ্জা দিয়ো না। আমার খেলার শখও মিটিয়াছে; এখন ডাক দিলে কিছুতেই আমার সাড়া পাইবে না।'

এরপরও বিনোদিনীকে নিয়ে মহেন্দ্রের অশোভন টানাপোড়েনে ক্লান্ত বিনোদিনীর মনে হয়েছে : 'আর যেন কিছুরই দরকার নাই— ... মনে মনে সে কহিল, বেশ হইয়াছে, ভালোই হইয়াছে, নিজেকে লইয়া আর টানা-ছেঁড়া করিতে পারি না; এবারে সমস্ত ভুলিব, ঘুমাইব— পাড়াগাঁয়ের মেয়ে হইয়া ঘরের ও পল্লীর কাজেকর্মে সন্তোষের সঙ্গে আরামের সঙ্গে জীবন কাটাইয়া দিব।'

ধীরে ধীরে বিনোদিনীর মনে প্রশান্তির আকাঙ্ক্ষা জেগেছে। তাই রাজলক্ষ্মীর অসুস্থতার সময়ে বিহারী স্বেচ্ছায় বিনোদিনীকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে বিনোদিনী আর সম্মত হয় নি। জীবনে যে স্বীকৃতি সে চেয়েছিল তা সে বিহারীর কাছ থেকে পেয়ে গেছে। সে বলেছে : 'পরজন্মে তোমাকে পাইবার জন্য আমি তপস্যা করিব— এজন্মে আমার আর কিছু আশা নাই, প্রাপ্য নাই। আমি অনেক দুঃখ দিয়াছি, অনেক দুঃখ পাইয়াছি, আমার অনেক শিক্ষা হইয়াছে। সে শিক্ষা যদি ভুলিতাম, তবে আমি তোমাকে হীন করিয়া আরো হীন হইতাম। কিন্তু তুমি উচ্চ আছ বলিয়াই আজ আমি আবার মাথা তুলিতে পারিয়াছি— এ আশ্রয় আমি ভূমিসাৎ করিব না।

'... ভুল করিয়ো না— আমাকে বিবাহ করিলে তুমি সুখী হইবে না, তোমার গৌরব যাইবে— আমিও সমস্ত গৌরব হারাইব। তুমি চিরদিন নির্লিপ্ত, প্রসন্ন। আজও তুমি তাই থাকো— আমি দূরে থাকিয়া তোমার কর্ম করি। তুমি প্রসন্ন হও, তুমি সুখী হও।' কুন্দ ছিল কিশোরী বালিকা— সরলমতি, শিক্ষার অভাবে বুদ্ধি শাণিত ছিল না, তাই এমন করে ভাবতে পারে নি, আর সে কারণেই তাকে এমন করুণ পরিণতির শিকার হতে হয়েছিল। শিক্ষিতা বিনোদিনীর, যুবতী বিনোদিনীর, ঘা-খাওয়া বিনোদিনীর বিচারবোধই তাকে শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে দিয়েছিল।

কাহিনির শেষে বিনোদিনীর ঠাঁই হয়েছিল কাশীবাসিনী অন্নপূর্ণার কাছে। বস্তুত, এই শেষের বিনোদিনী আর গ্রামে ফিরে যেতে পারে না। গ্রামবাসীরা হয়ত অনেকেই তার জীবনের খবর রাখে কৌতূহলবশতই, তাই তারা তাকে গ্রহণ করবে না। বিনোদিনী মহেন্দ্রর সংসারেও থাকতে পারে না, তাতে আশার সন্দেহ কোনোদিনও নিঃশেষ হবে না। শহর কোলকাতায় যুবতী বিনোদিনীর একা নিরাপদে থাকাও সম্ভব নয় হয়ত, অতএব অন্নপূর্ণার আশ্রয়ে সে থাকতে চেয়েছিল। অন্নপূর্ণা যদি কাশীবাসিনী না হয়ে অন্য কোথাও থাকতেন তাহলেও বিনোদিনীর সেখানেই হত নিরাপদ আশ্রয়। সে কারণেই প্রখ্যাত সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য : 'যে-বিনোদিনী তার দৃপ্ত যৌবন, তার রুদ্ধ বাসনার চাপা আগুন নিয়ে মহেন্দ্রের সংসারে জট পাকিয়ে তুললো, 'চোখের বালি'র আগাগোড়া সেই রেখেছে উদ্দীপিত ক'রে, কাপুরুষ মহেন্দ্র নয়, গোবেচারা ভালোমানুষ আশা নয়, অমানুষ কি অতিমানুষিক বিহারী নয়। ... সমস্ত জীবন যৌবন বিসর্জন দিয়ে বিনোদিনী ব্রহ্মচর্য পালন করতে কাশী চ'লে গেলো, তখন আমাদের স্তম্ভিত মনে বারবার শুধু এই প্রশ্নই জাগে যে এত ঝড় বইলো, ঢেউ উঠলো, আমাদের অনুভূতিগুলির উপর দিয়ে এত যে টানা-হেঁচড়া গেলো, এই যে তুমুল বিপ্লবে এতক্ষণ আমরা আন্দোলিত হ'লাম— তা কি এই জন্যে, শুধু এই জন্যে? ... শেষ পরিচ্ছেদটি গল্পের আভ্যন্তরীণ উপাদান থেকে অনিবার্যভাবে গড়ে ওঠে নি, এটি উপর থেকে বসানো হয়েছে, ছাপার অক্ষরে যা ঘটলো জীবনেও তাই ঘটেছিলো এ আমাদের বিশ্বাস হয় না, মনে হয় এটুকু লেখকের মনগড়া।'

মজার কথা, *চোখের বালি* লেখা শেষ করার পর রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৬ সালে শৈলজারঞ্জন মজুমদার এবং প্রভাতচন্দ্র গুপ্তর কাছে বলেছিলেন : 'সাধনার যুগের পর আমি প্রথম উপন্যাস লিখি চোখের বালি। বইখানি যত্ন করে লিখেছিলুম এবং ভালই হয়েছে ব'লে আজও আমার বিশ্বাস।' অথচ বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনা পড়ে ১৯৪০ সালে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবকে চিঠি লিখেছিলেন : 'তোমাদের কবিতায় চোখের বালির সমালোচনার শেষ অংশে যে মন্তব্য দিয়েছ তা পড়ে খুব খুশি হয়েছি। চোখের বালি বেরবার অনতিকাল পর থেকেই তার সমাপ্তিটা নিয়ে আমি মনে মনে অনুতাপ করে এসেছি, নিন্দার দ্বারা তার প্রায়শ্চিত্ত হওয়া উচিত।' অথচ কোথাও তার জন্য কোনো অনুতাপ রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেন নি। নিজের রচনা সম্পর্কে এমন দ্বিধাগ্রস্ততা আমাদের ব্যথিত করে বৈকি।

তবে মনে করি, উপন্যাসের এই পরিণতির সূত্রপাত উপন্যাসেই হয়েছিল এবং তা দমদমের চড়ুইভাতির ঘটনা থেকেই। পূজারতা যে নারীকে বিহারী আবিষ্কার করেছিল তা কি মিথ্যা হয়ে যেতে পারে? তার যদি কোনো প্রয়োগ উপন্যাসের ভেতরে না-ই দেখানো যায় তবে চরিত্রের সেই বিশেষত্বের উল্লেখেরই বা প্রয়োজন কি? এ কী শুধু কথার কথা? কাপুরুষ মহেন্দ্রর ভালোবাসায় ছিল কামনার আসক্তি, প্রবৃত্তির স্থূলতা। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির খেলা চলে। কেবলমাত্র প্রবৃত্তি সাধারণ জৈব মানুষকে চালনা করে। কিন্তু একসময় প্রবৃত্তিরও পরিণতি আসে আর তখন নারী-পুরুষ যিনিই হোন, যদি নিবৃত্তিতে যেতে না পারেন তবে সংসারে ও জীবনে ধ্বংস অনিবার্য। নিছক আকাঙ্ক্ষা ও কামনায় জীবনে আসে ক্লান্তি। মানুষ তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংযমের প্রশান্তিতে মগ্ন হতে চায়। এইখানেই তো মানবেতর প্রাণীর থেকে মানবের উত্তরণ। *বিষবৃক্ষ* উপন্যাসে বিবাহিত নগেন্দ্রনাথ এই কামনার কাছেই আত্মসমর্পণ করে কুন্দকে বিবাহ করেছিলেন, তার যা ফল তা-ই ফলেছিল। জীবনের দীর্ঘদিনের সাথী, পুরুষের আকাঙ্ক্ষার ধন সূর্যমুখীর মতো স্ত্রী নগেন্দ্রনাথকে ত্যাগ করে গিয়েছিলেন, কুন্দকে আত্মহত্যা করতে হয়েছিল। সেই বিপর্যয় থেকে শেষপর্যন্ত বিনোদিনীকে মুক্তি দিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিহারীর সঙ্গে বিনোদিনীর বিবাহ দেখার জন্য বুদ্ধদেব বসুর মতো সেকালে অনেকেই হয়তো অপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু এ বিবাহ হলে কী হত? তা কি প্রবৃত্তির মধ্য দিয়ে আর পাঁচটি দাম্পত্য জীবনের সঙ্গে আর একটি সংযোজন হত না? বিনোদিনী বিহারীর স্ত্রী হয়ে উঠত হয়ত কিন্তু তাতে কি তার মনুষ্যত্বের কোনো শ্রীবৃদ্ধি ঘটত? যে কথা বিনোদিনী বিহারীকে বলেছিল : 'আমাকে বিবাহ করিলে তুমি সুখী হইবে না, তোমার গৌরব যাইবে— আমিও সমস্ত গৌরব হারাইব। তুমি চিরদিন

নির্লিপ্ত, প্রসন্ন। আজও তুমি তাই থাকো— আমি দূরে থাকিয়া তোমার কর্ম করিব।' ভালোবাসার মধ্যে যদি শ্রদ্ধা থাকে তবে তা সবসময় যে বাহ্যিক মিলনেই সমাপ্ত হবে— এমন না-ও হতে পারে। বিহারী- বিনোদিনীর কথোপকথন অংশ লক্ষ করার মতো :

'বিহারী কহিল, না, আমি সত্যই বলিয়াছি, তোমাকে আমি বিবাহ করিব।

'বিনোদিনী। এই পাপিষ্ঠাকে উদ্ধার করিবার জন্য?

'বিহারী। না আমি তোমাকে ভালোবাসি বলিয়া, শ্রদ্ধা করি বলিয়া।

'বিনোদিনী। এই আমার শেষ পুরস্কার হইয়াছে। এই যেটুকু স্বীকার করিলে, ইহার বেশি আর আমি কিছুই চাই না। পাইলেও তাহা থাকিবে না, ধর্ম কখনো তাহা সহ্য করিবেন না।

'বিহারী। কেন করিবেন না।

'বিনোদিনী। ছি, ছি, এ কথা মনে করিতে লজ্জা হয়। আমি বিধবা, আমি নিন্দিতা, সমস্ত সমাজের কাছে আমি তোমাকে লাঞ্ছিত করিব, এ কখনো হইতেই পারে না। ছি, ছি, এ কথা তুমি মুখে আনিয়ো না।'

বঙ্কিমচন্দ্র নগেন্দ্রনাথকে দিয়ে কুন্দকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, কিন্তু নীতিবোধের তাড়নায় তা ছিনিয়েও নিয়েছিলেন আর তাই তাকে আত্মহত্যা করতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীর ক্ষেত্রে এমন ভুল করতে চান নি। মানুষের জন্যই নীতি, নীতির জন্য মানুষ নয়। কামনা-বাসনা সাধারণ মানুষেরই বৃত্তি, কিন্তু তা থেকে উত্তীর্ণ হতে না-পারাটাই নিন্দনীয়। যে মানুষ সংযমের বাঁধনে আপন প্রবৃত্তিকে বাঁধতে পেরেছে, সংসারে তারই যোগ্যস্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। বিনোদিনীকে বিহারীর বিবাহ হত প্রথম বিবাহ, কিন্তু বিনোদিনীর ক্ষেত্রে এটি দ্বিতীয় বিবাহ। এমনতর বিবাহিত জীবনে সুখ যে চিরস্থায়ী হবে, তা না-ও হতে পারে। ভবিষ্যৎ বিবাহিত জীবনে ছুতোয়-নাতায় পারস্পরিক দোষারোপ জীবনকে বিষময় করে তুলতে পারে। রবীন্দ্রনাথ মনুষ্যত্বের মহিমায় বিশ্বাসী। *প্রাচীন সাহিত্য*-এর 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন : 'মানুষের দুর্বোধ্য প্রবৃত্তি এইরূপ ঝড় তুলিয়া থাকে। শাসন-দমন,পীড়নের দ্বারা এই সকল প্রবৃত্তিকে ... সংযত করিয়াও রাখিতে হয়। কিন্তু এইরূপ বলের দ্বারা বলকে ঠেকাইয়া রাখা, ইহা কেবল একটা উপস্থিতমত কাজ চালাইবার প্রণালীমাত্র। আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি ইহাকেই পরিণাম বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। সৌন্দর্যের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, মঙ্গলের দ্বারা, পাপ একেবারে ভিতর হইতে বিলুপ্ত বিলীন হইয়া যাইবে ইহাই আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির আকাঙ্ক্ষা। সংসারে তাহার সহস্র বাধা-ব্যতিক্রম থাকিলেও ইহার প্রতি মানবের অন্তরতর লক্ষ্য একটি আছে।' অনেক আঘাত-পাওয়া বিনোদিনীও পরিণামে যা মঙ্গলজনক তাকেই মেনে নিতে চেয়েছিল। নারীর ক্ষেত্রে এই আন্তরিক অভিপ্রায়কে বুঝতে না পারলেই নিছক স্থূল বস্তুগত পরিণাম অনুসন্ধানের প্রয়াস ঘটে। যে রবীন্দ্রনাথ সত্য-সুন্দর-মঙ্গলে আজীবন বিশ্বাসী, বুদ্ধদেব বসুকে তাঁর লেখা মন্তব্য বিস্ময় সৃষ্টি করে বৈকি!

# *ঘরে-বাইরে* : পুনশ্চ। মূল ও অনুবাদ-প্রসঙ্গ

## গোপিকানাথ রায়চৌধুরী

অনেক সুধী সমালোচক রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস নিয়ে মূল্যবান আলোচনা করেছেন। তবু বলব, 'ক্লাসিক' পর্যায়ের সব রচনাই নানা সময়ের দর্পণে বহুমাত্রিক আলোচনার অপেক্ষা রাখে। *ঘরে-বাইরে* প্রসঙ্গেও এ কথা সত্য। পাঠকমাত্রই আশা করি স্বীকার করবেন যে; *চোখের বালি*-র জনপ্রিয়তা এর নেই। *গোরা*-র 'এপিক'ধর্মী প্রসারিত মহিমাও নেই, এমনকি *চতুরঙ্গ*-এর মতো সুমিত আয়তনে মুখ্যচরিত্রের তীব্র আত্ম-অন্বেষণ চিত্রণে বহুমাত্রিক প্রকরণ-প্রয়োগের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা প্রকাশের নৈপুণ্যও হয়ত সেভাবে চোখের পড়বে না, তবু *সবুজপত্র* পর্বের *ঘরে-বাইরে* রবীন্দ্রনাথের এক অনন্য সৃষ্টি। সর্বাঙ্গ আত্মকথনরীতিতে মোড়া এই উপন্যাসে গল্পের টান হয়ত আদৌ তেমন জোরালো নয়, তবু স্বকীয়তায় এটি আজও স্মরণযোগ্য। উপন্যাসটির সেই স্মরণীয় বৈশিষ্ট্যগুলি এই নিবন্ধের সীমিত পরিসরে আমাদের বিবেচ্য।

বঙ্গভঙ্গ তথা স্বদেশি আন্দোলনের পর একশো বছর অতিক্রান্ত। পাঠকমাত্রই জানেন, সেই প্রেক্ষাপটে লেখা *ঘরে-বাইরে*। আজ শতাব্দীর অন্তরাল থেকে আরেকবার এই উপন্যাসটিকে অনুভব করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের দুটি বহুশ্রুত উক্তি এই প্রসঙ্গে আরেকবার স্মরণ করা যেতে পারে : (ক) লেখকের কাল লেখকের চিত্তের মধ্যে গোচরে ও অগোচরে কাজ করে। এবং (খ) আমাদের দেশের আধুনিক কাল গোপনে লেখকের মনে যে সব রেখাপাত করেছে, *ঘরে-বাইরে* গল্পের মধ্যে তার ছাপ পড়েছে।

উপন্যাসের, বিশেষত *ঘরে-বাইরে*-র পরিবেশের বাস্তব ভিত্তি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে দায়বদ্ধ ও সচেতন, ওই দুটি উদ্ধৃত থেকেই সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া চলে, তবু স্বীকার করতেই হয় যে, বাংলা দেশের বিশেষ কালের পটভূমিতে *ঘরে-বাইরে*-র প্রধান চরিত্রগুলি বিন্যস্ত হয়েছে বটে, তবু তারা শেষ পর্যন্ত আদৌ বাঙালি জীবনের কাহিনিতে পর্যবসিত হয় নি। রচনার অন্তর্নিহিত সমস্যা সমকালীন সমস্যা বলে মনে হয় না। উপন্যাসটির মুখ্য চরিত্ররা ঠিক সাধারণ পরিচিত বাঙালি নরনারী হয়ে ওঠে নি। চরিত্রগুলি সাধারণ পরিচিত মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত শ্রেণি থেকে উঠে আসে নি বলেই যে এদের সাধারণ বাঙালি হিসেবে চিনতে অসুবিধা হয়, তা নয়, আসলে এইসব চরিত্রের নিহিত অসাধারণত্ব এদের পরিচিত সংসারের সীমা বা চারপাশের বাঙালি নরনারী থেকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। এদের এই অসামান্যতা নিছক বাইরের কোনো দিক থেকে নয়, বস্তুত তা এদের অন্তশ্চেতনায়।

রবীন্দ্রনাথের প্রাক্-*সবুজপত্র* পর্বের গল্পে এবং *চোখের বালি, নৌকাডুবি* পর্যন্ত উপন্যাসে বাংলা দেশের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের বিচিত্রস্বাদী অপেক্ষাকৃত সহজ রসরূপের পরিচয় পাই। কিন্তু, *গোরা* থেকে চরিত্রসৃষ্টিতে এই অসামান্যতার সূত্রপাত হলেও *চতুরঙ্গ* থেকে এই অসামান্যতা যেন আরও পরিস্ফুট। শচীশ কিংবা বিমলা, অথবা নিখিলেশ যে 'অ-সাধারণ' হয়ে উঠেছে, তার মূল রহস্য নিহিত রয়েছে, এইসব নরনারীর আত্মসচেতনতায়, মননধর্মী আত্মসমীক্ষার মনোভাবে, *ঘরে-বাইরে*-তে ডায়েরির পৃষ্ঠায় বিগত ঘটনার দর্পণে প্রত্যেকেই যেন নিজেকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছে। আপন ব্যক্তিসত্তার গূঢ় স্বরূপটি তাতে

ক্রমশ নিজের কাছেই উন্মোচিত হয়ে উঠেছে। নিজের মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও স্ববিরোধ আছে তারই সমীক্ষার আলোয় তাদের ব্যক্তিত্বের 'সীমা' যেমন ধরা পড়েছে, তেমনি তার স্বকীয়তাও দোষে-গুণে, আলোয়-ছায়ায় একান্ত প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। এ সম্পর্কে ড. সুকুমার সেনের মন্তব্যটি প্রাণিধানযোগ্য : 'প্রায় সব মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে দ্বৈধ থাকে, ইংরেজিতে যাহাকে বলে 'স্প্লিট পার্সোনালিটি।' এই ব্যক্তিদ্বৈধের সংঘর্ষই ঘরে বাইরের সমস্যা।' বস্তুত বিমলার সংঘাত 'শ্রেয়ের সঙ্গে প্রেমের', 'সন্দীপ নিজের মধ্যে নিজেরই হারজিৎ বিচার করচে, নিখিলেশও নিজের feeling-এর সঙ্গে নিজের কর্তব্যের adjustment করচে, ... এদের আত্মানুভূতি নিজের record নিজে রাখচে।' [রবীন্দ্রনাথের চিঠি, *প্রবাসী*, বৈশাখ ১৩৪৮।]

*চতুরঙ্গ* বিষয় ও প্রকরণ-বৈশিষ্ট্যে এক অনন্য সৃষ্টি সন্দেহ নেই। কিনতু *ঘরে-বাইরে* একদিক থেকে *চতুরঙ্গ*-এর ফর্ম-বৈশিষ্ট্যকে অতিক্রম করেছে। *চতুরঙ্গ* মুখ্যত একজনের ডায়েরি বা আত্মকথনভঙ্গিতে বিবৃত, কিন্তু *ঘরে-বাইরে*-তে তিন প্রধান চরিত্রের ডায়েরি বা আত্মকথনরীতি ব্যবহৃত। *চতুরঙ্গ*-এ প্রধানত শ্রীবিলাসের মাধ্যমেই আমরা শচীশের অন্তশ্চেতনার, তার যন্ত্রণাদীর্ণ মনের পরিচয় পাই, কিন্তু তার পরবর্তী উপন্যাস *ঘরে বাইরে*-তে ডায়েরি রচনার মধ্য দিয়ে আমরা তিনটি নরনারীর খণ্ডিত সত্তার আত্ম-উন্মোচনের কঠিন প্রয়াস 'exploitation of the individual personality' উপলব্ধি করি। ঘটনা-নির্ভর বিশ্লেষণধর্মী 'চরিত্র' রূপায়ণের বদলে 'ব্যক্তিস্বরূপের' গূঢ় পরিচয় দেওয়াই এখানে ঔপন্যাসিকের অন্বিষ্ট। প্রচলিত বাস্তবনিষ্ঠ কাহিনি-চরিত্রধর্মী উপন্যাসের বদলে এই অন্তর্নিহিত তত্ত্বপ্রবণ উপন্যাস *সবুজপত্র*-উত্তর রবীন্দ্র উপন্যাসের অন্যতম মৌল লক্ষণ। বিখ্যাত পাশ্চাত্য মননজীবী ঔপন্যাসিক অল্ডাস্ হাক্স্লি যে ধরণের রচনাকে 'Novel of Ideas' অভিধায় চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, *ঘরে-বাইরে*-কে অবশ্যই সেই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

আগেই বলেছি, *গোরা* এবং *সবুজপত্র* পর্বের উপন্যাসে মুখ্য চরিত্রগুলিতে 'অসাধারণত্বে'র ছাপ পরিস্ফুট। এই 'অসাধারণত্ব' কেবল তাদের জীবনচর্যায় বা আচরণে নয়, তাদের মুখের ভাষাতেও প্রতিফলিত। সহজ সাধারণ মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, সেই সরল মসৃণ ভাষা *ঘরে বাইরে*-র মতো এই পর্বের কোনো রবীন্দ্র-উপন্যাসেই শোনা যায় না। এ রকম সংলাপের একটি দৃষ্টান্ত দিই। নিখিলেশ সন্দীপকে বলছে, 'উপায় নেই। প্রাণটা কলের চেয়ে অস্পষ্ট, তাই বলে প্রাণটাকে কল বলে সোজা করে জানলেই যে প্রাণটাকে জানা হয় তা নয়। তেমনি আত্মা ফলের চেয়ে অস্পষ্ট। তাই আত্মাকে ফলের মধ্যে চরম করে দেখাই যে আত্মাকে সত্য দেখা তা বলব না।' এ রকম metaphor, epigram ও paradox-এ অলঙ্কৃত করে এই পর্বের সব উপন্যাস-গল্পের প্রায় সকলেই কথা বলেছে। বস্তুত, এ ভাষা মানুষের মুখের সহজ স্বচ্ছন্দ ভাষা নয়, এ ভাষা বহুলাংশে বানানো সাজানো ভাষা। বস্তুত এই সংলাপ এদের একান্ত নিজস্ব নয়। এদের সকলেরই নেপথ্য-লোক থেকে শুনতে পাওয়া যায় একজন ব্যক্তিরই কণ্ঠস্বর। তিনি এইসব চরিত্রেরই স্রষ্টা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

*ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে ভাষার এই অতিরেক, এই 'কাব্যিকতা' যে এর প্রকাশরীতিকে কিছুটা কৃত্রিম করে তুলেছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু নিশ্চয় সর্বত্র নয়। সে সব ক্ষেত্রে নানা অলঙ্কারের সাহায্যে ভাষার দূর-সঞ্চারী ইঙ্গিতময়তা আভাসিত হয়েছে, যা চরিত্রের অন্তর্লোককে আলোকিত করে তোলে কয়েকটি মাত্র শব্দের ব্যঞ্জনা-উদ্ভাসে। প্রসঙ্গত উপন্যাসটির উপসংহারে বিমলার আত্মকথার একেবারে শেষ অংশটি স্মরণ-যোগ্য : 'আমি এই রাস্তার ধারে জানালা ছেড়ে এক পা কোথাও নড়তে পারলুম না। সামনেকার রাস্তা, গ্রাম, আরও দূরেকার শস্যশূন্য মাঠ এবং তারও শেষ প্রান্তে গাছের রেখা ঝাপসা হয়ে এল। রাজবাড়ির বড়ো দিঘিটা অন্ধের চোখের মতো আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। বাঁ দিকের ফটকের উপরকার নবতখানাটা উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে কী যেন একটা দেখতে পাচ্ছে।' এবং 'রাত্রিবেলাকার শব্দ যে কত রকমের ছদ্মবেশ ধরে তার ঠিকানা নেই। কাছে কোথাও একটা ডাল নড়ে, মনে হয় যেন কে ছুটে পালাচ্ছে। হঠাৎ বাতাসে একটা দরজা পড়ল, মনে হল সেটা যেন সমস্ত আকাশের বুক ধড়াস করে ওঠার শব্দ।'

স্বামী-স্ত্রী যৌথ পরিবার এবং অন্য পুরুষের প্রতি নায়কের স্ত্রীর গোপন আকর্ষণ— *ঘরে-বাইরে*-র এই সমস্যা আদৌ অভিনব নয়। সেদিক থেকে *চতুরঙ্গ*-এ শচীশের তীব্র আত্মজিজ্ঞাসা, তার ও দামিনীর উত্তরণ-প্রবণতা নিঃসন্দেহে অভিনব। *যোগাযোগ*-এও দাম্পত্য-জটিলতা মূল থিম। কিন্তু উপস্থাপনা বা বিন্যাসের আশ্চর্য মৌলিকতায় *ঘরে-বাইরে* উপন্যাস আধুনিকতার এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে। পূর্বোক্ত সমস্যাকে ঘিরে তিনটি চরিত্রের অন্তর্লোকে যে গভীরচারী অতলান্ত অবগাহন এবং তজ্জনিত গূঢ় যন্ত্রণা ও উত্তরণ-প্রয়াস— বাংলা সাহিত্যের এতাবৎ দাম্পত্যসমস্যা-ভিত্তিক উপন্যাসে তা নিঃসন্দেহে অভাবনীয়। উত্তমপুরুষের ভঙ্গিতে বিবৃত চরিত্রগুলির আপন মনের দর্পণে মুখোমুখির হওয়ার এই বিন্যাসরীতি নিছক শিল্পকৌশল মাত্র নয়, এই কাহিনি-আশ্রিত থিমের পক্ষে তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। *ঘরে বাইরে*-র প্রেক্ষাপটে যে রাজনৈতিক ঘটনা অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলন— সেটি ১৯০৫-০৬ খ্রিস্টাব্দের। আর এই উপন্যাসটি তার অনতিকাল পরেই ১৩২২ সালে *সবুজপত্র* পত্রিকায় বেরোতে শুরু করে। স্বল্পকালের ব্যবধানে লেখা এই উপন্যাসকে সাহিত্যের অমরাবতীতে স্থান দিতে গেলে পাঠক-চিত্তে একধরনের 'Distancing'-এর মাত্রা যোগ করা প্রয়োজন। সেই মাত্রা রচনায় সাহায্য করেছে 'আত্মকথা'র প্রকরণ। উপন্যাসটির গোড়াতেই বিমলার আত্মকথা স্মৃতিচারণের ভঙ্গিতে বলায় পাঠকমনে এক ধরণের দূরত্বের প্রতীতি জাগে, সন্দেহ নেই।

*ঘরে-বাইরে*-র প্রকরণ-বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথে দ্বিধা এবং দ্বিধামোচন সম্পর্কে দু-একটি কথা বলি। এরপর উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে মূলগ্রন্থটির স্বকীয়তা ও শিল্পমূল্য বিবেচনা করব।

টুকরো টুকরো 'সিচুয়েশন'-এর মধ্য দিয়ে ঘটনার গোটা অবয়ব গড়ে ওঠার ফলে আলোচ্য উপন্যাসটির ধারাবাহিকতা সত্ত্বেও তা কখনও পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত বা বিভক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে নি। যদিও *সবুজপত্র* -পাঠে (১৩২২) ১,২ ইত্যাদি সংখ্যা থেকে এ ধরনের চেষ্টার আভাস মেলে। অবশ্য *সবুজপত্র*-এ লেখক '১' থেকে '৭' পর্যন্ত পরিচ্ছেদ ভাগের চেষ্টার পর সম্ভবত এরকম বিন্যাস স্বাভাবিক ও সংগত নয় ভেবে তা পরিত্যাগ করেন। এই গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদে পরিচ্ছেদ ভাগের ও সেই সঙ্গে পরিচ্ছেদের উপ-বিভাগের যে পরিচয় পাই, তা লক্ষ করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, অনুবাদক উপন্যাসটির গল্পের কাঠামোর দিক থেকেই এর পরিচ্ছেদ ভাগ ও উপ-বিভাগ করতে চেয়েছেন। কিন্তু বলা বাহুল্য, যে গ্রন্থ আদৌ কাহিনিপ্রধান নয়, তার কাহিনি-অংশকে স্পষ্ট করে তোলার জন্য এ ধরণের প্রয়াস আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। কে জানে, হয়ত এই পরিচ্ছেদ-বিভক্ত অনুবাদ-উপন্যাসটি পড়ার ফলেই E. M. Forster তাঁর *Abinger Harvest* গ্রন্থে এই উপন্যাস সম্পর্কে অত্যন্ত বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন। বস্তুত, অনুবাদ-উপন্যাসটিতে কাহিনির দিকে পাঠকের দৃষ্টি বেশি আকৃষ্ট করতে চাওয়ার ফলে হয়ত এর যেটুকু নিহিত স্বাতন্ত্র্য ও সৌন্দর্য, তার অনেকটাই ওই ইংরেজ সমালোচকের চোখ এড়িয়ে গেছে।

প্রসঙ্গত এখানে পাণ্ডুলিপি, *সবুজপত্র*-এর পাঠ এবং মুদ্রিত গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণে পাঠের পার্থক্য নিয়ে কয়েকটি কথা বলতে যেতে পারে। পাণ্ডুলিপি ও *সবুজপত্র, ঘরে-বাইরে*-এর যে পাঠ পাওয়া যায়, উপন্যাসটির প্রথম সংস্করণে (১৯১৬) তা অনেক সংক্ষিপ্তরূপে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু পরে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের সংস্করণে আগের সেই বর্জিত অংশ আবার গৃহীত হয়। সমগ্র উপন্যাসে প্রথম সংস্করণের এই 'বর্জিত' অংশের পরিমাণ প্রচুর। লক্ষণীয়, উপন্যাসের একেবারে সূচনা অংশের (বিমলার আত্মকথার অনেকখানিই), যা পাণ্ডুলিপি ও *সবুজপত্র*-এ ছিল, গ্রন্থাকারে মুদ্রিত প্রথম সংস্করণে বর্জিত হয়, যেমন— 'মা গো, আজ মনে পড়ছে তোমার সেই সিঁথের সিঁদুর, চওড়া সেই লালপেড়ে শাড়ি, সেই তোমার দুটি চোখ— শান্ত, স্নিগ্ধ, গভীর।'

এই 'বর্জন' ও 'পুনঃসংযোজন' ব্যাপারটির তাৎপর্য নির্ণয় দুরূহ নয়। উপন্যাসের যে তিনটি চরিত্রের 'আত্মকথন' এর বিষয়বস্তু নির্মাণ করেছে, তাদের কথায় অনেকসময় অবাঞ্ছিত কবিত্বময় আবেগ-উচ্ছ্বাস

প্রকাশ পেয়েছে বলে একসময় হয়ত লেখক মনে করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, চরিত্রগুলির (যেমন বিমলার) মুখে যে প্রকাশভঙ্গির (ভাষা ইত্যাদির) অতিরেক মানায় না, তার অনেকখানি বাদ দিতে পারলে আত্মকথনের (ও সংলাপের) এবং তার ফলে চরিত্রের বাস্তবতা স্পষ্টতর হবে। অর্থাৎ উপন্যাস থেকে আবেগ উচ্ছ্বাস এবং সেইসঙ্গে হয়তো কিছুটা 'কাব্যিক' অতিকথন ইত্যাদির মেদ ঝরিয়ে ফেলে এর বাস্তব পরিবেশ ও চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক সংকটের বাস্তবতার ওপর লেখক যেন জোর দিতে চাইলেন গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময়।

প্রথম সংস্করণ (১৯১৬) ও পুনর্মুদ্রণের (১৯১৮) পর পরিবর্ধিত সংস্করণ (১৯২০) প্রকাশের আগে লেখক নিশ্চয় এই বিষয়টি নিয়ে পুনর্বিবেচনা করেন। তখন সম্ভবত তাঁর মনে হয়েছিল যে, এই 'ব্যাপক' বর্জনের ফলে *ঘরে বাইরে* উপন্যাসটির যে স্বাতন্ত্র্য, তা কখনোই পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হবে না। বস্তুত, চরিত্রের আবেগ তো অবাস্তব কিছু না। সেই আবেগসঞ্জাত ভাষার যে কাব্যব্যঞ্জনা, তা থেকে অনেকসময়েই ব্যক্তির অন্তর্লোকের সত্যের গূঢ় উপলব্ধির আভাস মেলে। আসলে এই উপন্যাসে 'কবি' ও 'ঔপন্যাসিক'— দুই রবীন্দ্রনাথের যে নিবিড় মেলবন্ধন, তা অনেকাংশে ব্যাহত হত, যদি ব্যাপক বর্জনের ফলে পাণ্ডুলিপিকে খণ্ডিত করে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত প্রথম সংস্করণের পাঠই পরবর্তী সংস্করণগুলিতে শেষ পর্যন্ত অপরিবর্তিত রাখতেন লেখক।

সবশেষে *ঘরে-বাইরে*-র অনুবাদ প্রসঙ্গ। *ঘরে-বাইরে* ইংরেজিতে অনুবাদ করেন রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অনুবাদ-গ্রন্থের নাম : *The Home and the World*। ম্যাকমিলান অ্যান্ড কোম্পানি-প্রকাশিত (মে ১৯১৯) এই অনুবাদ-গ্রন্থের গোড়ায় 'Publisher's Note' অংশে লেখা আছে : 'The story was translated by Mr. Surendranath Tagore and the translation was revised by the author'. এর শেষ অংশটি গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ এই অনূদিত গ্রন্থে মূল রচনার যা কিছু পরবির্তন ঘটানো হয়েছে, তা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অনুমোদিত। এ কথা মনে রাখলে অনুবাদ-গ্রন্থে সংঘটিত পরিবর্তনগুলির পরিচয় লাভ এবং তাদের কারণ ও তাৎপর্য সন্ধান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। কারণ, মূল গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদকালে উপন্যাসটির বিন্যাসরীতির এমন কিছু পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে, যার ফলে মূল *ঘরে-বাইরে* এবং ইংরেজি *দ্য হোম অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড* এর রসাবেদনের ক্ষেত্রে প্রভূত পার্থক্য লক্ষিত হয়। বলা বোধহয় নিষ্প্রয়োজন যে, এই পার্থক্যের ফলে ক্ষতি হয়েছে অনুবাদ-গ্রন্থেরই। মূল বাংলা উপন্যাসটিতে অবশ্যস্বীকার্য কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও পাঠক রবীন্দ্রনাথের জীবনদৃষ্টির যে গভীরতা এবং ব্যক্তিচরিত্রের উন্মোচন ও শিল্পরীতির ক্ষেত্রে যে সূক্ষ্ম নৈপুণ্যের সুনিশ্চিত পরিচয় লাভ করে মুগ্ধ হন, অনুবাদ-উপন্যাসটিতে তা অনেক পরিমাণেই অনুপস্থিত।

মূল উপন্যাসের সঙ্গে ইংরেজি অনুবাদের যে পার্থক্য সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল, অনুবাদ-গ্রন্থে উপন্যাসটির chapter বা অধ্যায় ভাগ। আর এই প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যই অনুবাদ-উপন্যাসে 'ঘটনাগত গুরুত্ব' আরোপের প্রবণতাকে অনেকাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে মনে হয়। এখন এই অধ্যায়-সংক্রান্ত পরিবর্তন ও তার শিল্পগত তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

আধুনিক বাংলা উপন্যাসে *ঘরে-বাইরে*-র বিশিষ্ট স্থান সম্পর্কে উপন্যাসটির মনোযোগী পাঠকমাত্রেই অবহিত। সর্বজ্ঞ লেখকের বস্তুনিষ্ঠ ন্যারেশনের বদলে এখানে অনুসৃত হয়েছে দুজন পুরুষ ও এক নারীর আত্মকথনের মাধ্যমে আত্ম-উন্মোচনের সূক্ষ্মতর মনস্তাত্ত্বিক রীতি। সবশুদ্ধ তেইশটি আত্মকথা এখানে লিপিবদ্ধ হয়েছে। নিখিলেশ সন্দীপ ও বিমলার এই তেইশটি আত্মকথা বস্তুত তেইশটি অধ্যায় বিশেষ। এইসব 'অধ্যায়'-র মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক চরিত্রগুলির ব্যক্তিসত্তার গূঢ় রূপান্তরের ক্রম অনুসরণ করতে চেয়েছেন। আর ব্যক্তিত্বের রূপান্তরের যথাযথ পরিচয় ফোটাতে চেয়ে *ঘরে-বাইরে*-র স্রষ্টা— ফিলিপ স্টেভিক -কথিত ('The Theory of Fictional Chapters' নিবন্ধে) ব্যক্তির অন্তর্লোকের যে বিভিন্ন স্তর-বিন্যাস, তার মানস-সংকটের পরিমাণগত তারতম্য ও অনুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ প্রকাশ করেছেন, সে সবই সংঘটিত হয়েছে মূল গ্রন্থের ওই আত্মকথা-আশ্রয়ী 'অধ্যায়'-বিভাজনের মাধ্যমে।

কিন্তু উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদে (যে অনুবাদ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক 'Revised') ওই আত্মকথাকে নিছক 'Story' বলে অভিহিত করে অনুবাদক তেইশটি Story বা কাহিনিকে বারোটি 'Chapter'-এ বিন্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ গড়ে প্রায় দুটি করে আত্মকথা নিয়ে একেকটি অধ্যায়। কোথাও-বা তিনটি, কোথাও আবার একটিমাত্র আত্মকথার সমবায়েও এক একটি অধ্যায় গড়ে উঠেছে। এই অধ্যায়-বিভাজনের তাৎপর্য বা দোষগুণ নির্ধারণ করতে হলে অনুবাদ-উপন্যাসটির অধ্যায়-বিভাগের পুরো ছবিটি চোখের সামনে রাখা দরকার। এখানে তা রাখা যেতে পারে। যে অধ্যায়ে যে যে ব্যক্তির আত্মকথা বা Story অন্তর্ভুক্ত, সেই ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করা হল : Chapters : I: Bimala; II: Bimala, Nikhil, Sandip; III: Bimala, Sandip; IV: Nikhil, Bimala, Nikhil; V: Nikhil, Bimala, Nikhil; VI: Nikhil, Sandip; VII: Sandip; VIII: Nikhil, Bimala; IX: Bimala; X: Nikhil, Bimala; XI: Bimala; XII: Nikhil, Bimala.

মূল বাংলা উপন্যাসে, আমরা জানি, অধ্যায় ভাগ-সংক্রান্ত কোনো জটিলতা নেই, সেখানে প্রধানত এক একজন ব্যক্তির অন্তর্লোকের আলোছায়ার রহস্যলীলা বা তার ক্রমবিবর্তনের ধারা প্রকাশের জন্যই ঘুরে ঘুরে এসেছে তাদের আত্মকথা। এই আত্মকথার মধ্য দিয়ে দ্বন্দ্বময় ঘটনার অগ্রগতির পথরেখাটি চিনে নেওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু মনে রাখতে হবে, 'আত্মকথা'র বিন্যাস নিছক সেই ঘটনাকে অনুসরণ করে বিন্যস্ত হয় নি। তা অনুসরণ করেছে চিত্তলোকের গূঢ় জটিল অন্তঃসংঘাতের ধারা-প্রবাহকে। প্রায় প্রতিটি আত্মকথার সূচনা হয়েছে এই আত্মস্মৃতিচারণ বা আত্মবিশ্লেষণ কিংবা আত্মজিজ্ঞাসার মনোভাব থেকে, নাট্যধর্মী কাহিনি-বিবৃতির আকাঙ্ক্ষায় নয়। কিন্তু ইংরেজি অনুবাদে অনেক ক্ষেত্রেই এর বিপরীত প্রবণতাই চোখে পড়ে যেন। সেখানে ঘটনার বস্তুনিষ্ঠ দ্বান্দ্বিক রূপটিকে প্রকট করার চেষ্টা দেখা যায়— বলা বাহুল্য, উপন্যাসের সমগ্র 'ন্যারেটিভ' অংশের তেমন কোনো বদল না ঘটিয়ে (অবশ্য অনেক জায়গায় মূলের কিছু অংশ বর্জিত হয়েছে অনুবাদে)। আর এই ব্যাপারে অনুবাদক অবলম্বন করেছেন অধ্যায় বিভাজনরীতি (chapter division)। আর সেই রীতি অনুসারে, আগেই বলেছি, এক একটি অধ্যায়ের মধ্যে অনেক সময়েই একাধিক 'আত্মকথা' স্থান পেয়েছে। এর দ্বারা, অনুবাদকের হয়ত মনে হয়েছে, কাহিনি অধিকতর দৃঢ়বদ্ধতা লাভ করবে, যে দৃঢ়বদ্ধতা মূল উপন্যাসের আত্মকথা-আশ্রয়ী বিভাজনের দ্বারা হয়ত অর্জিত হয় নি।

এই অধ্যায়-বিভাজন করতে গিয়ে অনুবাদক কোথাও কোথাও কোনো একটি আত্মকথাকে দুটি chapter-এ বিভক্ত করেছেন। মূল গ্রন্থে বিমলার যে প্রথম আত্মকথা, অনুবাদে সেটির এক অংশ হয়েছে chaper I, বাকি অংশ chapter II -এ প্রসারিত হয়েছে। এই chapter II আবার কেবল বিমলার প্রথম আত্মকথার শেষাংশ দিয়েই তৈরি নয়, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নিখিলেশ ও সন্দীপের আত্মকথাও। প্রসঙ্গত জানানো যায়, এই রীতি অনুসৃত হয়েছে ৫ ও ৬ সংখ্যক, ৮ ও ৯ সংখ্যক এবং ১০ ও ১১ সংখ্যক chapter বিভাজনের ক্ষেত্রেও।

এখন জিজ্ঞাস্য, অনুবাদক এই নতুন অধ্যায়বিন্যাস-রীতি গ্রহণ করলেন কেন?— আগেই বলেছি, উপন্যাসটির আখ্যানধর্মকে পাঠকের কাছে স্পষ্টতর করে তোলা এর অন্যতম অন্বিষ্ট বলে মনে হয়। মূল গ্রন্থে বিমলার প্রথম আত্মকথার সূচনাংশে আছে তার শ্বশুরবাড়ির প্রেক্ষাপট ও দাম্পত্য সম্পর্কের পরিচয়। ওই আত্মকথারই মধ্যভাগে সন্দীপের আবির্ভাব এবং শেষাংশে সন্দীপ-বিমলার পারস্পরিক গূঢ় আকর্ষণের সূচনা।

অনুবাদক এই আত্মকথার মধ্যভাগে— যেখানে সন্দীপের চমক-জাগানো আবির্ভাব ঘটছে— ঠিক সেখান থেকেই chapter II আরম্ভ করেছেন। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, অনুবাদকের অধ্যায়-বিভাজনের মুখ্যনীতি আখ্যানধর্মকেই গুরুত্ব দেওয়া, যা মূল উপন্যাসটির লক্ষ্য ছিল না নিশ্চয়। মোটামুটি এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই 'অনুবাদ-উপন্যাসে'র বাকি অধ্যায়গুলি বিন্যস্ত হয়েছে।

প্রসঙ্গত আরেকটি কথা। কেবল এই chapter বা অধ্যায়-বিভাজনেই নয়, আরও এক ধরণের 'উপবিভাগ' বা ক্ষুদ্রতর পরিচ্ছেদ-ভাগ এই অনুবাদ-গ্রন্থে আছে, যা মূল গ্রন্থে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত নয়। মূল গ্রন্থে প্রায় সব আত্মকথারই মাঝে মাঝে ফাঁক বা space রেখেছেন লেখক। অনুবাদক সেই স্পেস্-এর দ্বারা বিচ্ছিন্ন

অংশের অনেকগুলিকেই পরিচ্ছেদের মতো ক্ষুদ্রতর অংশে বা উপবিভাগে বিভক্ত করেছেন। এই উপবিভাগ অনুবাদ-গ্রন্থে প্রচুর। সমগ্র উপন্যাসে বিমলার আত্মকথায় ২৩টি, নিখিলেশের আত্মকথায় ১৬টি এবং সন্দীপের আত্মকথায় ১০টি উপবিভাগ আছে। প্রতিটি chapter-এ এই উপবিভাগ আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো স্পেস-এর পরের অংশ থেকে এই উপবিভাগ শুরু হয়েছে। এই উপবিভাগেরও উদ্দেশ্য মুখ্যত উপন্যাসটির আখ্যানধর্মের পরিস্ফুটনে সহায়তা করা। নিছক শূন্যস্থান বা স্পেস্-এর নিরঞ্জন ব্যঞ্জনায় যা আভাসিত মাত্র, তাকেই উপবিভাগের দ্বারা বিশেষভাবে পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন অনুবাদক।

অনুবাদের chapter I-এর গোড়ার দিকে আছে বিমলার পতিগৃহের যৌথ জীবন-পরিবেশের ছবি, এটি প্রথম উপবিভাগ। ২ সংখ্যক উপবিভাগ শুরু হয়েছে মূলের এই বাক্যটির অনুবাদের মধ্য দিয়ে—'আমার স্বামীর বড়ো ইচ্ছে ছিল আমাকে বাইরে বের করবেন।' অর্থাৎ পতিগৃহের পরিবেশের বর্ণনা শেষ হবার পর প্রসঙ্গান্তর ঘটছে এখান থেকে। অনুরূপভাবে, এই বাইরে বেরোনো নিয়ে বিমলা যখন নানা কথা ভাবছে, ঠিক তখনই এল ৩ সংখ্যক উপবিভাগ : স্বদেশি যুগ ও বিলিতি জিনিস বর্জন-আন্দোলনের আবির্ভাব-প্রসঙ্গ। প্রায় সর্বত্রই ঘটনাগত প্রসঙ্গান্তরগুলিই অনুবাদে উপবিভাগের দ্বারা বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েছে।

সবশেষে একেবারে গোড়ার প্রশ্ন।— *ঘরে-বাইরে*-র ইংরেজি অনুবাদে এ ধরনের অধ্যায়-ভাগের আদৌ কোনো প্রয়োজন ছিল কি? উপন্যাসটিতে তিনজনের আত্মকথা ঘুরে ঘুরে এসেছে 'ডায়েরি'র ভঙ্গিতে। আমরা জানি, নিছক ঘটনাকে ধরে রাখার জন্য ডায়েরি লেখা হয় না। ব্যক্তিমানুষের চেতনার এক গভীর দর্পণ হল ডায়েরি— যেখানে ফুটে ওঠে নিজেরই সত্তার নিগূঢ় নিরাবরণ সত্যরূপ। ব্যক্তিসত্তার গভীর পরিচয়বাহী সেই ডায়েরিগুলিকে অধ্যায় বিভাজনের সুতো দিয়ে বেঁধে বেঁধে এক একটি আলাদা বান্ডিল বানানোর সার্থকতা কিছু আছে কি? আগেই বলেছি, একমাত্র— ঘটনার উপর বিশেষ গুরুত্ব সৃষ্টির চেষ্টা ছাড়া এর আর তেমন কোনো গূঢ় কারণ তো খুঁজে পাইনে। *The Home and the World*-এর অধ্যায় বিভাজনরীতি লক্ষ করলে বোঝা যায় যে, অনুবাদকের হয়ত মনে হয়েছে যে, মূল উপন্যাসটির একটি সুস্পষ্ট কাহিনিরূপ (plot-structure) আছে, যেটি মূলের নিছক আত্মকথা (অধ্যায়-বর্জিত) রীতির দ্বারা পরিস্ফুট হয় নি। তাই তিনি অনুবাদে অধ্যায় (chapter) যোজনার এই নতুন প্রয়োগরীতি গ্রহণ করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সম্ভবত তিনি এ কথা ভুলে গেলেন যে, আধুনিক বাংলা উপন্যাসে *ঘরে-বাইরে*-র যে অনন্যতা, তার অন্যতম প্রধান কারণ— প্রথাবদ্ধ অধ্যায় বিভাজন-রীতি বর্জন করে এই আত্মকথা, তথা ডায়েরির প্রকরণের প্রয়োগ। *ঘরে-বাইরে*-তে বলাবাহুল্য, এই বিশেষ প্রযুক্তির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে উপন্যাসের 'কন্টেন্টে'র অনিবার্য গভীর তাগিদেই, বহিরঙ্গ পরীক্ষা নিরীক্ষার শৌখিন প্রয়োজনে নয়, সে কথা আগেই বলেছি।

কিন্তু অনুবাদক উপন্যাসটির সেই আশ্চর্য অনন্যতার উপর হস্তক্ষেপ করে তাকে আর-পাঁচটা নিতান্ত প্রথানুসারী উপন্যাসের মামুলি ছকে বেঁধে ফেললেন। মূল উপন্যাসটিতে যে এক বিশেষ মাত্রা যোগ করতে চেয়েছিলেন উপন্যাসিক তাকে প্রযুক্তির প্রথাবদ্ধতা থেকে মুক্তি দিয়ে, সেই বিশেষ মাত্রার সৌন্দর্য ও গূঢ় ব্যঞ্জনা যেন অনেকখানিই হারিয়ে গেল অনুবাদকের এক দুর্ভাগ্যজনক সিদ্ধান্তে। এই দুর্ভাগ্য আরও বেশি বিভ্রান্তি জাগায়, যখন জানতে পারি যে, এই অনুবাদ নাকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সংশোধন ('revise') করে দিয়েছিলেন।

*ঘরে-বাইরে* নিয়ে এর আগেও অন্যত্র আলোচনা করেছি। এই নিবন্ধেও কিছু কথা বললাম। নিশ্চয় সব বলা হল না। বস্তুত কোনো উপন্যাসের প্রথাধর্মী কাহিনি চরিত্র ইত্যাদি নিয়ে বিশদ আলোচনা এখানে করতে চাই নি। এই সীমিত-পরিসর নিবন্ধে প্রকরণ-প্রযুক্তি নিয়ে খুঁটিনাটি আলোচনা সম্ভব হয় নি। *ঘরে-বাইরে* রচনার পৃষ্ঠপটে সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের যে মনন, যে গূঢ় জীবনদৃষ্টি সক্রিয় ছিল, আমরা তারই আংশিক সন্ধান করেছি। আশা করি, *ঘরে-বাইরে* ও তার অনুবাদ *The Home and the World*-এর তুলনার মধ্য দিয়েও সেই অন্বেষণ-প্রবণতা সক্রিয় থেকেছে।

# *ঘরে-বাইরে* : বিদেশিদের চোখে

## রবিন পাল

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন *ঘরে-বাইরে* ১৩২২ সালের বৈশাখ থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় *সবুজপত্র* পত্রিকায়, গ্রন্থরূপে প্রকাশ পায় ১৩২৩ সালের গোড়ায়, কবি যখন জাপানে। অর্থাৎ ১৯১৫ এপ্রিল - মে থেকে শুরু। গ্রন্থ আকারে প্রকাশেব সময় অনেক অংশ বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ মুদ্রণের ব্যবস্থা করে যান। প্রকাশিত হয় ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে।

১৯১৯ সালে *ঘরে-বাইরে*-র অনুবাদ বের হল, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদ করলেন (লেখক-কর্তৃক 'সংশোধিত) *The Home and the World* নামে। প্রকাশ করলেন লন্ডনের ম্যাকমিলান কোম্পানি। জার্মান ভাষায় অনুবাদ ১৯২০-তে (অনু : Helene Meyer-Franck), ওই ১৯৬১, Emil and Helene Engelhardt-এর্ং অনুবাদ ১৯৬২, রুশ ১৯২৩ (S. A. Adrianov), ১৯২৩ (A. M. Karnaukhova), ওই ১৯৫৬, ডাচ ১৯২১ (W. Versluys), ফিনিস ১৯২২, ফরাসি ১৯২৬ (F. Roger Cornaz), গ্রিক ১৯৫১, হিব্রু ১৯২৮ (Sarah Reisen), হাঙ্গারিয়ান ১৯২১, ইটালিয়ান ১৯২৪ (M. Valli), পোলিশ ১৯২২ (B. Rudzki), ওই ১৯৫৮ (Wincenty Birkenmajer), পোর্তুগিজ ১৯৫৫ (*Na integra*), রুমানিয়ান ১৯২৪, সার্বো-ক্রোয়েশিয়ান ১৯৫৫ (Mira Vodvarska Sarajevo), ওই ১৯২৬, শ্লোভাক ১৯৪৬, শ্লোভেন ১৯৩০, স্পেনীয় (?) (Alicia Molina y Vedia), সুইডিশ ১৯২১। বেশিরভাগ পাশ্চাত্য আলোচনার ভিত্তি ইংরাজি অনুবাদ, ফরাসিও হতে পারে কোনো ক্ষেত্রে। সকলেই জানেন, *ঘরে-বাইবে*-র বাংলা ও ইংরাজি অনুবাদে বিন্যাসের পার্থক্য আছে।

প্রভাতকুমার আরো বলেন, 'রবীন্দ্রনাথের যেসব গ্রন্থ লইয়া রসিক ও অরসিকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক আলোচনা হইয়াছে, সে বোধ হয় 'ঘরে-বাইরে'।' কারণ, ক) সীতার প্রতি অসম্মান প্রকাশ, খ) বাস্তবতার নগ্নমূর্তি— নরনারীর অহরহ দ্বন্দ্ব, গ) স্বদেশ ভাবনা, তথা সমকালীন ভারতীয় রাজনীতি ও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি, ঘ) আইডিয়াল-এর সংঘাত— প্রাচীন ভারত ও নবীন য়ুরোপের টান, লোকহিত-এর ধারণা।

প্রভাতকুমারের আর একটি মন্তব্য শিরোধার্য করে আমরা আলোচনায় প্রবেশ করব। তা হল, ' 'ঘরে-বাইরে উপন্যাস লিখিবার উদ্দেশ্য কিছুই নাই— গল্প বলিবার জন্যই এ গল্পের সৃষ্টি— এ কথা খুবই সত্য। কিন্তু লেখকের কাল লেখকের চিত্তের মধ্যে গোচরে ও অগোচরে কাজ করে, বলিয়া গল্পাংশে সাময়িক সমস্যার অবতারণা আপনি আসিয়া গিয়াছে। দেশের কতকগুলি সমস্যা যাহা কবিচিত্তকে কিছুকাল হইতে উদ্‌বেলিত করিতেছিল, তাহা তাঁহার গোচরেই হউক আর অগোচরেই হউক উপন্যাসমধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে।' (*রবীন্দ্রজীবনী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪১৪।)[১]

আলোচ্য রচনায় আমরা বিদেশিদের দৃষ্টিদর্পণকে বেছে নিচ্ছি কেন তার একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। স্বদেশকে বিদেশের চোখে দেখার মধ্যে ভিন্ন রুচি, ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কারণে যেমন ভুল বোঝা / বোঝানোর অবকাশ থাকে, তেমনি ভিন্নতর মূল্যায়নের মূল্যবান মাত্রাও যুক্ত হতে পারে। তাই বিদেশি লেখক সম্পর্কে

স্বদেশি এবং স্বদেশি লেখক সম্পর্কে বিদেশি লেখক / সমালোচকদের মতামত উত্থাপন / আলোচনা পণ্ডশ্রম বলে মনে হয় না। এক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় বিদেশি মন্তব্যের সংকলনের, বিবলিওগ্রাফির অভাব। তবুও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু মন্তব্য, আপাতত *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসটি কেন্দ্র করে উপস্থিত করা যাচ্ছে।

প্রথমে ইংরেজ লেখক ও সমালোচকদের মন্তব্য। আমরা সকলেই জানি রবীন্দ্রনাথের *গীতাঞ্জলি* প্রসঙ্গে ইয়েট্স্-এর নাটকীয় ভূমিকার কথা। ম্যাকমিলান কোম্পানি যখন ১৯১৯ সালে *ঘরে-বাইরে*-র ইংরেজি অনুবাদ বার করে তখন ইয়েট্স্ এটি পাঠ করেন ও প্রশংসা করেন। ১৯২০ সালের জুলাই মাসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। ইয়েট্স্ বলেন, *ঘরে-বাইরে* বর্তমান সময়ের আইরিশ সমাজের পক্ষেও অত্যন্ত সত্য। এখানে যে সব সমস্যার কথা আছে তা তাঁর স্বদেশের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। তিনি জানতে চান উপন্যাসটি ভারতে প্রবল মতামত জাগিয়েছে কিনা। আয়ার্লণ্ডের বই হলে কোনো আইরিশ লেখক লিখলে সেখানে যে মতের প্রাবল্য দেখা দিত তাতে তাঁর কোনো সন্দেহ নেই। (রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *On the Edges of Time*-এ প্রসঙ্গটি এনেছেন।)[২]

বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক ই. এম. ফর্স্টার *ঘরে-বাইরে*-র একটি আলোচনা লেখেন *Athenaeum* (১ অগস্ট ১৯১৯) পত্রিকায়, পরে সেটি তাঁর *Abinger Harvest* (1936) প্রবন্ধ সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়। ফর্স্টার বলতে চান, রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন বিমলা পৃথিবীর দ্বারা প্রলুব্ধ হোক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এক পশ্চিমা কেনসিংটন বাবুর দ্বারাই সে প্রলুব্ধ হল। উপন্যাসটিকে অশ্রদ্ধেয় ভঙ্গিতে তাঁর 'বোর্ডিং বাড়ির ছলাকলা বিনিময়ের' (Boarding-house-flirtation) উপন্যাস মনে হয়েছে, যেটি মিস্টিক এবং স্বদেশি কথাবার্তার মুখোশে ঢাকা। উপন্যাসটির বিষয়ের পক্ষে ভাষা হয়েছে অত্যন্ত অনুপযুক্ত, হাস্যকর। উদাহরণ দিয়ে ব্যঙ্গ করে বলেন এ হল 'বাবু বাক্য'। এ বাক্যে চকিত স্যাটায়ার, সুসংস্কৃত মন্তব্য থাকলেও তা হয়ে ওঠে হাস্যকর।[৩] আর 'অশ্লীলতা' নিয়ে গুরুত্ব তাঁর মনে হয়েছে রুচিসঙ্গত নয়। মেরি লাগো মন্তব্য করেন, উপন্যাসটির অনুবাদের অনুৎকর্ষই ফর্স্টারের বিরক্তি উৎপাদনের কারণ। অন্যদিকে G. V. Raj মনে করেন স্বদেশি আন্দোলনের কালে ভারতীয় সমাজের অবস্থা বুঝতে না পারাতেই ফর্স্টারের এমন বিপত্তি। তাই তিনি উপরিতলের আলোচক, তাই তিনি তরঙ্গের মধ্যে আদর্শের, মূল্যবোধের প্রতীকায়িত স্বরূপ বুঝতে ব্যর্থ (*Tagore the Novelist*, p. 54)। ফর্স্টার সন্দীপকে 'পশ্চিমা কেনসিংটন বাবু' আখ্যা দেন, যিনি বুর্জোয়া চরিত্র, সঙ্গত প্রশ্নে গুরুত্ব আরোপ করে যিনি নিজেকে মহামানব আকারে উপস্থিত করতে প্রয়াসী। কিন্তু সে ফর্স্টারের মতে যথেষ্ট পরিমাণে মন্দ নয়, সে যদি ইয়াগো না হতে চায়, তাহলে তাকে অন্তত Iago Manqué হতে হবে কন্‌রাডের *The Secret Agent* উপন্যাসের Verloc চরিত্রটির মতো।[৪] সন্দীপের নীচতা এবং নকলসর্বস্বতা (shoddiness), অগভীরতা এবং সস্তা ভান ভেরলক চরিত্রের ক্ষেত্রে যতটা মাপসই এখানে তা নয়। কিন্তু উপন্যাসটিতে গুরুত্বভার অর্পিত হচ্ছে অন্তঃপুরবাসিনী ভারতীয় বধূর উগ্র জাতীয়তাবাদী কর্মকাণ্ডে খাপ খাওয়াতে না-পারার অক্ষমতার ওপর। কিন্তু এক্ষেত্রে সন্দীপের মোড়ক যথেষ্ট নয়, উইনি ভেরলকের বীরত্বপনা এখানে নেই।

ওপরের প্রসঙ্গ অনেকটাই Mary M. Lago-র আলোচনা থেকে। তাই লাগোর বক্তব্য এইখানে বলে নিই। লাগো রবীন্দ্রনাথের নানা রচনা নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁর *Rabindranath Tagore* (1976) বইটিতে। আমরা শুধু প্রাসঙ্গিক বক্তব্য তুলে ধরব। লাগো বলেন, *ঘরে-বাইরে*-তে বাঙালি জাতীয়তাবাদ আনা হল ব্যক্তিক ক্ষেত্রে, একটা বৃহৎ পরিসরের পরিবর্তে তিনটি ব্যক্তিত্বের ধারাবাহিক ডায়েরি, যারা ব্যক্তি হিসেবে স্মরণীয় হলেও আন্দোলনের প্রতিনিধি হিসেবে স্মরণীয় নয়। ফর্স্টারের মন্তব্য নিয়ে লাগো অনেকটা আলোচনা করছেন। সেই সূত্রে আরো খানিকটা বলি। *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে এই যে ভ্রান্তস্থাপিত গুরুত্ব চরিত্রস্থাপনে, তা উপন্যাসটিকে সাহিত্যগতভাবে অশালীন করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত যে পরিস্থিতি বেছে নিচ্ছেন তার থেকে ভিন্ন দিকে দৃষ্টি জাগ্রত করছেন পশ্চিমের লেখকরা। তবে ব্যর্থতা হতোদ্যম করে না বাঙালিকে— মনে

করেন ফর্স্টার,— বাঙালি বিশ্ববিধানে আগ্রহী। লাগো বলতে চান, যদি বাঙালি লেখকরা নির্মাণ-শিল্পের কথা ভাবেন, তবে অতটা না হলেও সাম্প্রতিক নির্মিতির পরিচায়ক বইটি, আর ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব, স্বদেশি মনোভাব ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দ্যোতক। তাই লাগোর সিদ্ধান্ত : *ঘরে-বাইরে*-র ইংরেজি অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের একটি দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে। তা হল ইতিবাচক পরিণতি কখনোই নেতিবাচক উপায়ের সমর্থক হতে পারে না। আর অনুবাদের অনুৎকর্ষ বেশ কিছু পশ্চিমা আলোচককে, যাঁরা রবীন্দ্রনাথ এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল তাঁদেরও সপ্রশংস করে তোলে না। এখানে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, লাগো কি বাংলা জানতেন, মূল এবং অনুবাদের ত্রুটি বিষয়ে সচেতন ছিলেন? লাগো বেশ কিছু পাশ্চাত্য আলোচনা তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, কিছু উদারনৈতিক পত্রিকা এই উপন্যাসটিকে সমাদর করেছিল তার বাস্তবিকতা ও কাব্যিকতার জন্য।

*The Saturday Review* পত্রিকা লেখে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আধুনিক ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাকে সত্য প্রকাশে নিষ্কুণ্ঠ থেকে প্রজ্ঞাশক্তি সহযোগে উচ্চ কাব্যিক মানে প্রকাশরূপ দিয়েছেন (*A Novel of Modern India,* 1919)। নিউ ইয়র্কের *Nation* পত্রিকা যারা মাঝে মধ্যে রবীন্দ্রবিষয়ে অসৌজন্য প্রকাশ করেছে, তারা বলেছে উপন্যাসটি সুগভীর প্রজ্ঞার সুন্দর পরিচায়ক (*New World and Old,* 1919)। *নিউ ইয়র্ক টাইমস* ঘোষণা করে বইটি আকর্ষণীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ, যাতে সমন্বয় ঘটেছে যান্ত্রিকতামুক্ত ন্যারেটিভ, স্যাটায়ার এবং কাব্যিকতার। এর চরিত্রগুলো সবই তো আছে নিউ ইয়র্ক, লন্ডন, শিকাগো, মেডিসিন হাট-এ, যেমন ভারতবর্ষে। এ এক অস্ত্রহীন নির্দোষ স্যাটায়ার। লাগো-র মন্তব্য, হয়ত স্যাটায়ার, অন্তত লেখক, দংশনহীন করতে চান নি। আলোচকদের ত্রুটি নিঃসন্দেহে। আরো কিছু ইংরেজি পত্রিকার আলোচনা তোলা যাক। সবচেয়ে দীর্ঘ আলোচনা *The Times Literary Supplement*-এ 'Idolatry, Old and New' শিরোনামে (২৯ মে ১৯১৯)। আলোচক আলোচনার শুরুতে বলে নেন কোনো হিন্দুর লেখা হিন্দু বিষয়ে উপন্যাস এই প্রথম তিনি পড়ছেন। তাছাড়া উপন্যাসটি স্বদেশি আন্দোলন বা জাতীয় আন্দোলনের প্রভাব এক রাজা ও তার স্ত্রীর জীবনে কীভাবে এল সে বিষয়ে লেখা। রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গটিকে শিল্পায়িত করেছেন, উপসংহারে আন্দোলন নিমজ্জিত করল চরিত্রগুলিকে। কাহিনি উপস্থাপিত হচ্ছে তিনটি পৃথক চরিত্রের কথায়, যে রীতি Wilkie Collins-এর লেখায়,[৫] কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা ব্যবহার করেছেন অতি নৈপুণ্যে শুধু প্লটবিস্তারে নয়, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের জন্যও। সূক্ষ্ম উপস্থাপনায় চরিত্রগুলি হয়ে ওঠে পরিচিত, শুধু হিন্দু নয়, জীবন্ত। শুধু তাদের পরিস্থিতি ও ধারণাই আমাদের অপরিচিত। এরপর চরিত্রবৈশিষ্ট্য তোলা হয়। আলোচকের সার্বিক মন্তব্য, চরিত্র তিনটি বর্ণসঙ্কর (Hybrid), আর তার মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত, সবচেয়ে আকর্ষণীয়— জাতীয়তাবাদী নেতা সন্দীপ— যে 'হিন্দু নীটশে পন্থী'।[৬] সে শক্তির পূজারী, সে দেখায় জার্মানরা কীভাবে শক্তিপূজক। জার্মানদের মতো সন্দীপও দেখায়, তার স্বদেশবাসী বিপথগামী, তারা দ্রষ্টা, বিনয়ী ও ভীরু। কারণ তারা পার্থিব বিষয়ে উদাসীন। নীট্‌শে উল্লিখিত নয়, কিন্তু মতামত আছে। সন্দীপ নির্মমতাকে বন্দনা করে, নিজেকে স্বদেশ-বাণীর মুখপাত্র করে তোলে। নিখিল দুর্বলতা, নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে লড়তে চায় তার নিজস্ব পদ্ধতিতে, তার ন্যায় ও স্বদেশপ্রেম বিপন্ন হয়, তার স্ত্রী সন্দীপের দ্বারা মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে। শেষ দিকে গল্পটি হয়ে পড়ে গোলমেলে (confused), কারণের বৈপরীত্য, চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি গোলমালে হারিয়ে যায়। পাঠকের অনেক প্রশ্ন অমীমাংসিত থেকে যায়। আলোচনার শেষে মন্তব্য করা হয়, সব দেশের সব কালের জনপ্রিয় রাজনৈতিক বক্তারা এটাই বোঝায় যে, মানুষ যতদিন না আত্মসচেতন রক্ষক হচ্ছে ততদিন মানবজাতির স্বাধীনতার সুযোগ নেই। এটাই বইটির 'থিম' আর বিষয়টি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে কারণ প্রতিপাদ্য শুধু কথা হিসেবে নয়, চরিত্র আচরণের অন্তর্গত হয়ে ওঠে। *The Church Times* পত্রিকার আলোচনাও বেশ বড়ো (১।৮।১৯১৯)। আলোচক বলেন, উপন্যাসটি যেন আধুনিক ভারতবর্ষের প্রতীকী চিত্র, তিনটি মুখ্য চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে। প্লট মারফৎ বিমলার ক্রমান্বয় বিচ্ছিন্নতা, সন্দীপের প্রতি ক্রমবর্ধমান আকর্ষণ, তার মোহভঙ্গ ও অনুশোচনা, এবং বিশ্বাসঘাতকতার ট্র্যাজিক পরিণতি তুলে ধরে। বিমলা তার স্বদেশের মানুষের মতোই জাগ্রত হয় পূর্বপুরুষ

থেকে বহমান ঐতিহ্য বন্ধন আধাআধি, কোনো নব্য ধারণায় সহজেই আপ্লুত হয়, স্বদেশি আন্দোলনের ঝড়ে তার পায়ের তলার মাটি ধসে যায়। এরপর সন্দীপ ও নিখিল চরিত্রের আলোচনা যা মোটের ওপর যথার্থ। আলোচক স্মরণ করিয়ে দেন উপন্যাসটি অনুবাদ, ভারতীয় পাঠকদের জন্যই রচিত। একমাত্র পঞ্চুই তুলি ধরে যথার্থ ভারতীয় বাস্তবতা। তবে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন বিপুল সাহিত্যিক আকর্ষণ ও নৈপুণ্য নিয়ে, আপন উৎকর্ষেই এটি হয়ে উঠতে পারে 'রাজনৈতিক অ্যালিগরি'। রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড পরিত্যাগের প্রসঙ্গ জড়িয়ে আলোচক এরপর ডস্টয়েভস্কির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা করেন। নিখিলেশের সঙ্গে আলোয়িশা, চন্দ্রবাবুর সঙ্গে আলোয়িশার বাবা জোসিমার সাদৃশ্য দেখেন ও বলেন ব্রিটিশ অপেক্ষা রুশ উপন্যাসের সঙ্গেই এর সাদৃশ্য এবং শেষোক্ত বিচারে ডস্টয়েভস্কির রচনা যেন ক্যাথেড্রাল অর্গান আর *ঘরে-বাইরে* 'ফ্লুট' বাঁশি।[৮] অথচ অন্য আলোচক ইংরেজি উপন্যাসের সঙ্গেই তুলনা করেন। আর অনেকসময়ই সাদৃশ্যায়নে একটু তাচ্ছিল্য সুপ্রকট। *The New Statesman* পত্রিকায় তিনটি উপন্যাসের একত্রিত আলোচনা বেরিয়েছিল যার একটি বই *The Home and the World*. (১১।১০।১৯১৯।) আলোচক ঠিকই ধরেন, উপন্যাসটির দ্বিবিধ আকর্ষণ-প্রবাহ— রাজনৈতিক ও ব্যক্তিক। সরাসরি সক্রিয় সন্দীপ এবং স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, স্থিতধী নিখিলেশের মধ্যকার নাট্যিকতা যথেষ্ট সরলতা, ভঙ্গি ও ভানবিরোধী ভাবেই উপস্থাপিত। নিখিলেশের নিস্তরঙ্গ আত্মবিশ্বাস, এই আলোচকও বলেন, মনে পড়িয়ে দেয় রুশ উপন্যাসের চরিত্র। এ ধরনের চরিত্র মারমুখি শক্তির সহায়তা নেয় না, যা মেলে ইংরেজি উপন্যাসে। এ সব বলার পর আলোচক রচনাশৈলির নিন্দেই করেন 'স্পষ্টত পুরাতন ঘরানা'র বলে। আর বলেন এখানে মনস্তাত্ত্বিকতার বিস্তার নেই; যা পাঠককে অনুধাবন করে নিতে হয়।

অধ্যাপক সুজিত মুখার্জি তাঁর *A Passage to America : The Reception of Rabindranath Tagore in the United States 1912-1941* (1964) বইতে আমেরিকায় রবীন্দ্রসাহিত্য-পাঠ নিয়ে কিছু মূল্যবান আলোচনা করেছেন। তাঁর কিছু কথা Mary Lago-র বইতে আছে, কিছু নতুন তথ্যও আছে। উনি আমেরিকার পত্রপত্রিকায় কয়েকটি আলোচনার উল্লেখ করেন। সেগুলো হল : *Bookman* পত্রিকায় August 1919, *Boston Evening Transcript* পত্রিকায় 9 July 1919, *Dial* পত্রিকায় June 14, 1919, *Nation* পত্রিকায় August 2, 1919, *New York Times* পত্রিকায় 8 June 1919, *Review* পত্রিকায় 22 November 1919, *Review of Reviews* পত্রিকায় October 1919 সংখ্যায় প্রকাশিত আলোচনা। দুঃখের বিষয় এই সবকটি আলোচনা আমার পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। সুজিত মুখার্জি-সূত্রে পরোক্ষ সহায়তায় কিছু কথা বলা যায়। সুজিতবাবু *Times* পত্রিকার 'Latest Fiction by Tagore', June 8, 1919 উল্লেখ করে বলেন, এখানে যে রাজনৈতিক সমস্যা অবলম্বিত তা ভারতবর্ষ, ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকা— সব দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তবে আলোচকের বিশ্বাস, পশ্চিমের প্রতি অঙ্গুলি প্রদর্শনই লেখকের লক্ষ্য— এ কথা মানা যায় না। সুজিত-বাবুও মনে করেন এ উপন্যাসের 'থিম' ভারতীয় বাস্তবতা-ভিত্তিক। তবে এই আলোচক বইটির রীতি পুরাতন বলেন নি। তাঁর মতে এটি অত্যন্ত আধুনিক, একেবারে হাল ফ্যাশান না-ও হতে পারে। আর এর সমস্যা ভারত, নিউইয়র্ক, লন্ডন, শিকাগো— সবক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সুজিতবাবু এই সূত্রে প্রভাতকুমারের সাহায্য নিয়ে বলে নেন উপন্যাসটি প্রকাশের পরই তৈরি করেছিল বিতর্ক। ইংরেজি অনুবাদ আমেরিকায় গৃহীত হয়েছিল ভালোভাবেই। *Nation* পত্রিকার আলোচক (পূর্ব-উল্লিখিত), যাঁরা রবীন্দ্র-প্রশংসাই করে থাকেন, বলেন বইটি গভীর প্রজ্ঞাশাসিত এবং সুন্দর আর সর্বায়ত কুশলীয়ানার প্রশংসা করেন। রবীন্দ্রনাথ জানেন কীভাবে প্রসঙ্গকে কাব্যিকভাবে, নাটকীয়ভাবে উপস্থিত করতে হয়। *The Review* পত্রিকায় H. W. Boynton বলেন প্রাঞ্জলতা তাঁর ভালো লেগেছে। তিনি রবীন্দ্র-রচনা-ঐতিহ্যে এটিকে সবচেয়ে সহজ ও দৃঢ়প্রোথিত মনে করেন (22 Nov. 1919)। বোস্টন-এর *Evening Transcript*-এর আলোচক স্বীকার করেন ভারতীয় গৃহজীবনের চিত্রে তিনি প্রথম পরিচয়ে বিমূঢ় হয়ে পড়লেও বিভিন্ন ন্যারেটরের কথনশৈলি তাঁর ভালো লাগে, কারণ এতে প্রতিটি চরিত্রের মনোজগৎ বুঝতে সাহায্য হয় (9 July 1919)।

এডওয়ার্ড থমসন ছিলেন রবীন্দ্র-নিবেদিত প্রাণ। একসময় তিনি রবীন্দ্রনাথের অতীব প্রিয় পাত্র ছিলেন, যদিও পারে সম্পর্কের দুঃখজনক পরিণতি ঘটে। তিনি রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে দীর্ঘ বছরের ব্যবধানে দুটি বই লেখেন— *Rabindranath Tagore, His life and work* (১৯২১) এবং *Rabindranath Tagore, Poet and Dramatist* (১৯৪৮। এই শেষ বইটি ১৯২৬-এ লেখা বইয়ের পরিবর্ধিত রূপ।) প্রথম বইটি মূলত জীবন-পরিচয়, যদিও তাতে এক জায়গায় *ঘরে-বাইরে*-র ইংরেজি অনুবাদকে 'সুন্দর উপন্যাস' বলেন এবং এ সময়ে রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিস্পৃষ্টতাকে 'দুর্ভাগ্যজনক' আখ্যা দেন (পৃ. ৪২)। দ্বিতীয় বইটিতে রবীন্দ্র-উপন্যাস অনুধাবন যে গভীর অভিনিবেশ দাবি করে তা বলেন। *ঘরে-বাইরে*-তে লক্ষ্য করেন এক দূরত্ববোধ (detachment) এবং 'বিষণ্ণতাহীন প্রকাশ' (remorseless exposure) এবং তা বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের, যাতে তিনি অংশ নিয়েছিলেন, যা এক নিচু মনোভাবেরই পরিচয় বহন করে। থমসন এটাও লক্ষ করেন যে, খুব কমসংখ্যক বুদ্ধিজীবীই এরূপ সমালোচনা করেছিলেন (পৃ. ৬৩)। এই বইয়েই আর এক জায়গায় তিনি মন্তব্য করেন যে, বয়কট আন্দোলনের উত্তেজনা পরিহার করেছিলেন তিনি এবং *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে স্বদেশ সম্পর্কে অন্ধভক্তিপ্রসূত অসহিষ্ণুতাকে অভিযুক্তই করেন (পৃ. ২০৩)। সুমিত সরকার অন্যভাবে উপস্থিত করেন ব্যাপারটা। আশিস নন্দী গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথকে a counter-modernist critic of the west আখ্যা দেন। সেই রবীন্দ্রনাথ পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে এবং ১৯০৭-০৮-এ রচিত একাধিক প্রবন্ধে দাঙ্গার জন্য শুধু ব্রিটিশকে দায়ী করার সমালোচনা করেন, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের সেতুবন্ধন না হলে সন্ত্রাসবাদে কাজ হবে না এটাও বলেন, আর আশা প্রকাশ করেন, জমিদাররা পিতৃসুলভ ভঙ্গিতে প্রজাকল্যাণে তৎপর হবে যদিও তখন সমাজ ও অর্থনীতিগত দিক থেকে জন-সংগঠিত করার কোনো সুস্পষ্ট প্রোগ্রাম তাঁর ছিল না। ফলে *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে এ সব কথার ঔপন্যাসিক প্রকাশ অরণ্যে রোদন হয়, নিখিলেশের মহৎ কিন্তু শান্ত সক্রিয় এবং বিচ্ছিন্ন ভূমিকা কোনো প্রেরণা জাগাতে পারে না (*Modern India*, পৃ. ১২২-২৩)।

উইলিয়াম রোদেনস্টাইন রবীন্দ্রনাথকে লেখা একটি পত্রে (১১ জুলাই ১৯১৯) *ঘরে-বাইরে*-র ইংরেজি অনুবাদের বিস্তর প্রশংসা করেন। রোদেনস্টাইন বইটির সৌন্দর্যে গভীরভাবে বিচলিত, বলেন, এতে আছে পরিণততম প্রজ্ঞার পরিচয়। যারা নৈতিক সংগ্রামে রত তারাই বুঝবে এর প্রতিটি পৃষ্ঠায় কত সত্য লুকিয়ে আছে। বইটি একটি 'মাস্টারপিস'— সরল ও সমঝোতাহীন এর মন্তব্য। প্রতিটি চরিত্র স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণভাবে অঙ্কিত, যেন গ্রিক মহাকাব্যের চরিত্র। পঞ্চু যেন ভারতীয় জীবনের প্রেক্ষাপটটি তুলে ধরে— তার গ্রাম, ভূমি, মন্দির, চাষি রমণী, তাদের কালচে লাল শাড়ি, চমকপ্রদ ভিখিরিপনা— সব কিছুই ভালো লাগে। বইটি পড়ে যেমন আনন্দ তেমনি আপনার মনের সমৃদ্ধি ও প্রজ্ঞার প্রসারের পরিচয় পাওয়া যায়, ইয়েট্‌সের মন্তব্য, অকারণ তোষামোদে পূর্ণ, রোদেনস্টাইনের মন্তব্যের মধ্যে খুঁটিয়ে পড়ার পরিচয় থাকলেও, উপন্যাসটিকে মাস্টারপিস বলা, গ্রিক মহাকাব্যের সঙ্গে তুলনা করা, রবীন্দ্রপ্রজ্ঞার প্রসার দেখা প্রভৃতি ভদ্র তোষামোদের সূক্ষ্ম নমুনা বলেই মনে হয়।

একটি ফরাসি আলোচনা পাওয়া গেছে। লেখক লুই জিলে, প্রবন্ধের নাম 'রবীন্দ্রনাথের ঘরে-বাইরে'। বইটির 'অবিশ্বাস্য সাফল্য', বহুল বিক্রি, মানবীয়তায় সাড়া প্রভৃতি দিয়ে রচনাটি শুরু। জিলে-র মতে, *ন্যাশনালিজম্* বইয়ের শেষাংশের বাস্তব প্রতিফলন যেন উপন্যাসটি, 'মনোমুগ্ধকর কাহিনিটি'র 'চিত্তাকর্ষক উপাদানে'র উদ্দেশ্য স্বজাতিকে 'নীতিশিক্ষা' দান। নীতিশিক্ষা বলতে আমরা যা বুঝি তা অবশ্য নয়, রাজনীতি সমাজনীতি শিক্ষা বললেই ভালো হত। এরপর এই 'হৃদয়গ্রাহী' কাহিনিটির তিনটি চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরেন লেখক। বিমলার সেবাধর্ম, নিখিলেশের ইংরাজি সাহিত্যে অনুরক্তি এবং প্রাচীনপন্থী মনোভাব, স্ত্রীকে নতুন যুগের ভাবধারায় দীক্ষিত করতে চাওয়ার পাশে স্বদেশি প্রচারক সন্দীপ, যে বাক্‌পটু, যে ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ, যে নীট্‌শে-পন্থী, যে 'এক শ্রেণির ভিলেন'। স্বদেশবক্তৃতার ও কথার মারপ্যাঁচের হিপ্‌নটিজম্-এ 'নিষ্পাপ মাদাম বোভারি'তুল্য বিমলা সর্বস্ব সঁপে দিতে রাজি হয়। স্বামী নিখিলেশ সাত্ত্বিক ও দার্শনিক প্রকৃতির, স্ত্রী স্বাধীনতায় শ্রদ্ধাশীল। তার নিষ্কাম নির্মল নির্লিপ্ত ভাব *আনা কারনিনা*-র বিখ্যাত চরিত্রটি মনে করিয়ে

দেয়। লেখক ঠিকই বলেন, 'উপন্যাসের মূল পটভূমি হল জাতীয় আন্দোলনের একটি দিক', রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে এসে মেশে এখানে অর্থনৈতিক বিপ্লব। লেখকের মতে, রবীন্দ্রনাথ এখানে জাতিগত অহংকে বর্জন করাতে চান। প্রাচ্যদেশে স্বদেশপ্রেম-সূত্রে এক অশুভ শক্তির জাগরণ বিষয়ে বলেন রবীন্দ্রনাথ জাপানের বক্তৃতায়। এ কথা এখানে। তবু লেখকের সিদ্ধান্ত, 'রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি তাই কপোলপ্রসূত মানসলোকের জীব বলে মনে হয়। বাস্তবজীবনের ছাপ তাতে কম। এই চরিত্রগুলি এখনো যেন প্রাপ্তবয়স্ক নয় বলে মনে হয়। স্বপ্নই তাদের একমাত্র আশ্রয়।' (আসলে এ রকম মনে হওয়ার কারণ ইংরেজি ও ফরাসি উপন্যাসে চরিত্রপাত্রের সক্রিয়তা, সমাজজীবনের নাট্যিক জঙ্গমতায় অভ্যস্তরুচি এরকম নিষ্ক্রিয় ভঙ্গিকে অবাস্তবই মনে করে।) যা হোক্, শেষ পর্যন্ত 'চমৎকার উপমারাজির ঐশ্বর্যে'র প্রশংসায় রচনাটি শেষ হয়।

রোমা রোলাঁ এ বইটি নিয়ে বিরূপ মন্তব্যই করেন। তা হল, রবীন্দ্রনাথ স্বদেশে বিচ্ছিন্ন। *ঘরে-বাইরে*-র মতো বইয়ের মধ্যে আজকের ভারতবর্ষ আর নিজেকে খুঁজে পায় না; এটি যে সামাজিক অবস্থা নিয়ে লেখা তা ইতিমধ্যেই অতীতের বস্তু হয়ে গেছে (*ভারতবর্ষ* : ডায়েরি)। মন্তব্যটি মানা যায় না, কারণ তিনটি চরিত্রের যেসব বৈশিষ্ট্য লেখক দেখান তা শুধু ১৯১৬ কেন আজও বিদ্যমান বলে মনে হয়।

জার্মান ভাষায় এই উপন্যাসটি নিয়ে খুব বেশি লেখালিখি হয়েছে বলে মনে হয় না। বিখ্যাত নাট্যকার বের্টল্ট ব্রেখট, তাঁর ডায়েরি-নোট-এ লেখেন ১৯২০-তে—'ঘটনাচক্রে আমি ঠাকুরের *ঘরে-বাইরে* পড়ছি, একটি চমৎকার, শক্তিমান, শান্ত বই।' হের্মান হেস্ এই বইটির পুস্তক আলোচনায় বলেছিলেন, এখানে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় সাহিত্যফর্ম যে আয়ত্ত করেছেন তার পরিচয় আছে। এতে যে অপরিচিত ছন্দ, যা ইংরেজি জনপ্রিয় উপন্যাসের ধাঁচে, তার শুদ্ধতা ও আভিজাত্য ভারতীয় পরিচয়ও বহন করছে। নিখিল চরিত্রে রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে পাওয়া যায় সহজেই, যিনি Supra-National Humanity-র ধারক। নারী চরিত্রচিত্রণও ভালো। বরং সন্দীপ গতানুগতিক। উপন্যাসটিতে কিছু দুর্বলতা থাকলেও এর প্রবল আবেদন অস্বীকার করা যায় না। হেস্ মনে করেন এক সময় এটিই হয়ে উঠবে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বহুপঠিত উপন্যাস (*Vivos Voco,* Leipzig, Vol. 1, Nov. 1920)। তথ্যপুঞ্জ থেকে মনে হয় হেসের অনুমান সত্য হয় নি। *ঘরে-বাইরে* জার্মান পাঠককে একাধিক অনুবাদ সত্ত্বেও খুব বেশি আকৃষ্ট করতে পেরেছিল বলে মনে হয় না। Alex Aronson তাঁর *Rabindranath through Western Eyes* (1943) বইতে নতুন কোনো আলোচনা সংযোজন না করলেও সাধারণভাবে তাঁর দুএকটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য— ক) রবীন্দ্র-রচিত উপন্যাস বিষয়বিচারে অস্বাভাবিকভাবে উদ্দীপক হলেও ফর্ম-বিচারে পুরোনো এবং ভিক্টোরীয়। খ) কিপলিং বা রুশ-উপন্যাস দিয়ে রবীন্দ্র-উপন্যাসের মূল্যায়ন সঠিক হবে না। গ) *গোরা* বা *ঘরে বাইরে* প্রচারে ইয়েট্স্ বা পাউণ্ড জাতীয় কোনো বিখ্যাত প্রচারক পাওয়া যায় নি। ঘ) তাঁর উপন্যাসের অধিকাংশ আলোচনা Half-Hearted এবং Unconvincing। আলোচকরা উপন্যাসগুলির শ্রেণি নির্ণয়ে সুচিন্তার পরিচয় দেন নি। তাই রবীন্দ্র-উপন্যাস বিষয়ে বলতে গিয়ে অনর্থক টলস্টয়, চেকভ, টুর্গেনিভ, ডস্টয়ভস্কি, মোপাসাঁ, জোলা, বালজাক বা কিপলিং-কে এনে ফেলেছেন (পৃ. ৯৭)। মন্তব্যগুলির সত্যতা অস্বীকার করা যায় না, তবে তুলনামূলকতা নিশ্চয়ই নতুন দেখার সুযোগ করে দিতে পারে। যদিও নানা আলোচনায় অধিক ক্ষেত্রে আত্মম্ভরিতাই সুপ্রকট।

এবার রুশ আলোচনা। আমরা আগেই জেনেছি রুশ ভাষায় *ঘরে-বাইরে*-র একাধিক অনুবাদ হয়েছে। প্রখ্যাত মানববিজ্ঞানী, লেখক V. G. Tan Bogoraz *New India and Rabindranath Tagore* নামে একটি বই লেখেন ১৯২২ সালে। এতে *ঘরে-বাইরে* এবং স্বদেশি আন্দোলনের অভিঘাত আলোচিত হয়েছে। প্রসঙ্গত টলস্টয় ও রবীন্দ্রনাথের মনীষা তুলনাক্রমে আলোচিত হয়েছে। বোগোরাজের মতে পুরাতন ও নূতনের দ্বন্দ্ব, আধুনিক ভারতীয় নারীত্বের স্বরূপ, স্বদেশির সমস্যা, জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন প্রভৃতি উপন্যাসটির মুখ্য 'থিম' হয়ে দেখা দিয়েছে। এই সূত্রে রাজনীতি থেকে রবীন্দ্রনাথের চলে আসা তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। আলোচক দেখান উপন্যাসটি তিনজনের পর পর ডায়েরি বিন্যাসে লেখা। বিমলা আধুনিক, তরুণী, আকর্ষণ-বিস্তারী,

তার পোশাক, কেশবিন্যাস পাশ্চাত্য ধাঁচের কিন্তু সিঁদুর পরে। সে ইংরেজি বলে, ইংরেজ গর্ভনেস তাকে শেখায়। কিন্তু ভারতীয় প্রথানুযায়ী স্বামীর পায়ের ধুলো নেয়। বিমলা কীভাবে সন্দীপের দ্বারা প্রভাবিত হল, স্বামীর সিন্দুক থেকে জাতীয়তাবাদীদের দেবার জন্য টাকা চুরি করল দেখানো হয়। শেষে সন্দীপের রূঢ়তায় মোহভঙ্গ, স্বামীর কাছে ফেরা। চরিত্রচিত্রণ স্মরণীয়। যেমন বড় রানী, নিখিল ও বিমলা যেন ৪০-এর দশকের রুশ দম্পতি, শক্তি ও মিথ্যা প্রয়োগে কার্যসিদ্ধিময় সন্দীপ যেন ১৮৬০ বা ১৮৮০-এর প্রতিভূ, মনে করিয়ে দেয় বাজারভ, মার্ক ভোলোকভ, নেচায়েভ-কে। সমলয় মেজাজ ভারতের বৈশিষ্ট্য। ৪০-এর দ্বন্দ্ব ৬০ বা ৮০-র সঙ্গে, আদর্শবাদীর সঙ্গে বিপ্লববাদীর আর বিপ্লববাদীও নানা প্রকারের— অভীতিসঞ্চারী, আত্মত্যাগী, অথবা অবিশ্বাস্য, শক্তিমান, হিংসাপন্থী, ম্যাকিয়াভেলিবাদী। এরপর আমরা উল্লেখ করতে পারি S.Vel'tman-এর ১৯২৩ থেকে ১৯২৮-এ লেখা কয়েকটি রবীন্দ্র-বিষয়ক প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক অংশ। ভেল্টম্যান বলছেন, রবীন্দ্রনাথের *ঘরে-বাইরে* অঙ্কন করছে ভারতের বিপ্লবী মেজাজকে, ১৮৯০ থেকে ১৯০০-র অর্থনৈতিক সংকটকে, স্বদেশি আন্দোলনের প্রধান উপাদানগুলিকে। রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি শুধু প্রধান আদর্শগত দ্বন্দ্ব-প্রবাহগুলিকেই তুলে ধরেন না, গ্রাম্য বুর্জোয়া সুদখোর, আধা-প্রলেতারিয়াত বুদ্ধিজীবী, তরুণ ছাত্র প্রভৃতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে এই আন্দোলনের সামাজিক চরিত্রকেও তুলে ধরেন (*Rabindranath Tagore : The Poet and Politician* বইয়ের 'East and West in Tagore's Works' প্রবন্ধ, ১৯২৮)। এই ধরণের তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য অবশ্য ভেল্টম্যান-এর বইটিতে স্বল্প বলেই মনে করেন A. P. Gnatyuk Danil'chuk। দানিলচুক সমালোচনা করে বলেন, ভেল্টম্যান রবীন্দ্ররচনার শিল্পসুষমা দেখতে পান না, আর ভ্রান্তিপূর্ণ তুলনা টানেন, যেমন রবীন্দ্রকবিতার সঙ্গে জার্মান ইম্প্রেশনিস্টদের কবিতার। সে যাই হোক্, এই ভেল্টম্যান 'Where is Indian Literature' প্রবন্ধে বলেন, *নৌকাডুবি, ঘরে-বাইরে* দুটি বই-ই অস্বাভাবিক সুরমূর্ছনাময়, এর হিমের সুষমা ও সতেজতা, পাঠকচিত্ত বন্দী করার ক্ষমতা, নিঃসন্দেহে লেখককে ইউরোপীয় সাহিত্যের মধ্যে স্থাপন করবে। আর একজন আলোচক অধ্যাপক V. A. Gurko Kryazhin, যিনি প্রাচ্যতত্ত্ববিদ সঙ্ঘের অন্যতম সদস্য, *ঘরে-বাইরে* নিয়ে আকর্ষণীয় কিন্তু ভ্রান্ত মন্তব্য করেন। যেমন, *ঘরে-বাইরে*-র সমস্যা (উনিশ শতকের শেষ, বিশ শতকের শুরু) এবং রাশিয়ার সমস্যা (৬০ ও ৭০-এর দশক) একই, বিপ্লবী চেতনার জাগরণ একই। সন্দীপের মধ্যে তরুণ ভারতীয় বুর্জোয়াজির প্রকাশ। কিন্তু তা সত্য নয়। তবে এ কথা সত্য, উপন্যাসটির মধ্যে আছে বিপুল মনস্তাত্ত্বিক ও শৈল্পিক উৎকর্ষ। উপন্যাসটি শুধু ব্যক্তিক নাটকে সীমাবদ্ধ না থেকে সামাজিক সম্পর্কগুলিকে তুলে ধরে, আদর্শগত দ্বন্দ্ব প্রকট করে, ফলে উপন্যাসটি নিছক সংকীর্ণ মনস্তাত্ত্বিক না হয়ে বরং হয়ে ওঠে সামাজিক উপন্যাস (*India in Rabindranath Tagore's Novel*, 1923)। তিনি বলেন, উপন্যাসটির ভাষা সূক্ষ্ম চিন্তা ও চমকপ্রদ মেটাফর ও সুন্দর কাব্যিকতা-প্রকাশী।

হাঙ্গারিতে রবীন্দ্রনাথের সমাদর হয়েছিল যথেষ্ট। ১৯২৪ সালে *ঘরে-বাইরে* হাঙ্গারিয়ান ভাষায় Ferene Kelen কর্তৃক অনূদিত হয় *বিমলা* নামে। Gyula Wojtilla তাঁর *Rabindranath Tagore in Hungary* (1983) বইতে *ঘরে-বাইরে* বিষয়ে যা লেখেন তার মধ্যে সংগত ও অসংগত (হাস্যকর) মন্তব্য মিলেমিশে আছে। উপন্যাসটিতে আছে রাজনৈতিক পটভূমি, বাংলাদেশের স্বদেশি আন্দোলনের বিস্তার, বিমলার প্রেম। নিখিল ও সন্দীপ দুই রাজনীতির— মডারেট ও র‍্যাডিক্যাল ধারক। বিমলা তার স্বামী ও স্বামীর আদর্শের কাছে ফিরে আসে। যে প্রশ্ন উপন্যাসটিতে উত্থিত তাতে হাঙ্গারির পাঠকসমাজের মধ্যে ভারতের রাজনীতির প্রতি সহানুভূতি জাগ্রত হয়, বিশেষত প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর অগ্রগতি বিষয়ে। এ পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু লেখক বলে বসেন, এটিই রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে ভালো উপন্যাস। সুকুমার সেনের ভাষায় 'আধুনিক ভারতবর্ষের মহাভারত।' তার পরের মন্তব্য আরও মারাত্মক। *ঘরে-বাইরে* ভারতীয় উপন্যাস যা রাশিয়ায় টলস্টয়ের *যুদ্ধ ও শান্তি* তাই।[৬] আর কোনো বই ভারতীয় জীবন-জটিলতার এমন দাপুটে বিশ্লেষণ করতে পারে নি, এর দ্বান্দ্বিকতা

ফোটাতে পারে নি। এই উপন্যাসে আছে আধুনিক বাস্তব উপন্যাসের যাবতীয় সুগুণ— বিষয় বিচারে, কায়া বিচারে। দুঃখের বিষয় হাঙ্গারির Ervin Baktay ছাড়া আর কেউ এই সুগুণ লক্ষ করেন নি এবং Antal Szerb-এর মতো বিদ্বান আলোচকও এই উপন্যাস এবং রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য গদ্য লেখার পার্থক্য অনুধাবন করতে পারেন নি। এই দুই কৃতবিদ্য আলোচকের লেখা পড়তে না পারায় মন্তব্য করা গেল না। কিন্তু *যুদ্ধ ও শান্তি*-র সঙ্গে তুলনা মোটেই সুপ্রযুক্ত নয়, আধুনিক বাস্তব বিষয় ও কায়া নির্মাণে কীভাবে আদর্শ সার্থকতা পায় বোঝা যায় না। আমরা তো দেখলাম কেউ কেউ কল্পনা-প্রাধান্য দেখেছেন (লুই জিলে), কেউ কেউ পুরানো রীতি দেখেছেন (*The New Statesman*-এর আলোচনা)।

এইখানে আমরা হাঙ্গারির শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী আলোচক Georg Lukács-এর *ঘরে-বাইরে* বিষয়ক একটি লেখার উল্লেখ করতে ইচ্ছা করি। লেখাটি বার্লিনের একটি পত্রিকায় (*Die Rote Fahne*) ১৯২২ সালে প্রকাশ পায়। প্রথম থেকেই লেখাটি আক্রমণাত্মক। জার্মানির বুদ্ধিজীবী মহলে রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা লুকাচের মনে হয় এক Cultural Scandal। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মতে কল্পনাপ্রবণ লেখক ও চিন্তাবিদ, ব্যক্তিত্ব হিসাবে গুরুত্বহীন, তাঁর 'সৃজনক্ষমতা' তেমন কিছু নয়। চরিত্রগুলি গতানুগতিক, কাহিনি অনাকর্ষণীয়। কথায় কথায় উপনিষদ ও গীতা আওড়ান। রবীন্দ্ররচনা পাঠে ইংরেজদের খুশি হওয়ার কারণ আছে, কারণ ইনি তাদের বৌদ্ধিক প্রতিনিধি হিসাবে ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রতিকূল ভূমিকা নিয়েছেন তাই তাকে নাইটহুড ও নোবেল দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজনীন মানবতার গভীর দর্শন আউড়ে ভারতীয় স্বাধীনতা যোদ্ধাদের ঘৃণাই করেছেন। *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে বৌদ্ধিক সংঘাতের জায়গাটা হল হিংসার ব্যবহার নিয়ে। লেখক ব্রিটিশ-দ্রব্যাদি বয়কটের লড়াইকে তুলে ধরেন। রবীন্দ্রনাথের কাজ শুধু ভারতীয়দের আধ্যাত্মিকভাবে রক্ষা করা, হিংসাপ্রভাবিত বিপদ থেকে ভারতীয়দের রক্ষা করা। ফলে ভারতীয়দের পদানত থাকার ওকালতি, বুদ্ধিজীবীদের এক রোমান্টিক আন্দোলনে সামিল করা আছে। লুকাচ ইটালির কার্বোনারি এবং রাশিয়ার নারোদনিকদের আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এরা রোমান্টিক ধর্মযুদ্ধে শুদ্ধতম আদর্শবাদ ও আত্মোৎসর্গের যাত্রী। এই পথকে তিনি গান্ধী-পথাদর্শী বলেন। মনে পড়বে আমাদের তরুণ লুকাচের মাথা গরম-করা এই লেখার দোসর বাংলাতেও কিছু কিছু হয়েছে বৈকি। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করাই ছিল রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য, *ঘরে-বাইরে*-তে তার দুর্বল প্রচার আছে— এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত দুঃখজনক। 'উপন্যাসের ভ্রষ্ট ... স্বদেশি নেতা ... এক গান্ধীর ন্যক্কারজনক ক্যারিকেচার' এবং সন্দীপ 'গান্ধীর ক্যারিকেচার' (শঙ্খ ঘোষ) লুকাচের এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত ভুল। শঙ্খ ঘোষ জানিয়ে দেন, 'উপন্যাসটির জার্মান অনুবাদও বেরিয়ে গেছে ভারতবর্ষের অসহযোগ আন্দোলনের আগে ১৯২০ সালেই'। তাছাড়া মূল রচনাটি যখন লেখা হচ্ছে তখন 'সেই বছরটিতেই ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীর সদ্য প্রবেশ?' ('লুকাচ-এর ঘরে-বাইরে', *ঐতিহ্যের বিস্তার*, পৃ. ১৩০) শঙ্খ ঘোষ লুকাচের এবংবিধ মূল্যায়ন থেকে 'চরমপন্থার বিপদ' সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করে দেন। এখানে আমরা স্মরণ করতে পারি, লুকাচ রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের চাপে মাঝে মাঝে মত পালটাতে বাধ্য হেন— বাস্তবতা সম্পর্কে তাঁর যে ধারণা *Studies in European Realism*-এ তা কিন্তু *The Meaning of Contemporary Realism*-এ বদলে যায়। তবে আমাদের এ কথাও মনে পড়বে খানিকটা লুকাচের মতোই (সবটা নয়) মন্তব্য মেলে কৃষ্ণ কৃপালনীর লেখায়। 'Although a poet's manifesto, the novel is equally a testament of Gandhi's philosophy of non-violence, of love and truth, of his insistent warning that evil means must vitiate the end, however nobly conceived. Reading it one understands, better than any exposition can demonstrate how akin Tagore was to Gandhi in spirit whatever the seeming differences in their forms.' (*Rabindranath Tagore : A Biography*, 1962, p. 252.) ব্যাপারটা হল এই যে, *ঘরে-বাইরে*-তে যে ভাবাদর্শ নিখিলেশের মারফৎ প্রতিষ্ঠাপ্রয়াস, তা ভারত ঐতিহ্যেরই অন্তর্গত, গান্ধী সেই ঐতিহ্য মান্য করেই রাজনীতির কার্যক্রমে তা আনতে চেয়েছিলেন। এটা মানলে অনেক ভুল বোঝাবুঝি কমে যায়।

অধ্যাপক V. Lesny রবীন্দ্রনাথের ওপর একটি বড়ো বই লেখেন। প্রাগের এই অধ্যাপকের, যিনি কিছুদিন শান্তিনিকেতনেও কাটিয়ে গেছেন, বইটির ইংরাজি অনুবাদের নাম *Rabindranath Tagore, His Personality and Work* (১৯৩৯)। এতে *ঘরে-বাইরে* বইটির বড়ো আলোচনাই আছে। তার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ। ১৯১৬ সালে প্রকাশিত এই উপন্যাসটির কাল সেই ঝটিকাক্ষুব্ধ ভারত, ১৯০৮-এর সেই দিনগুলি, যখন ভারতীয় রাজনীতিতে হিংসার অনুপ্রবেশ ঘটল।[১০] রবীন্দ্রনাথ তা চান নি, এক নব্য স্বাদেশিকতার কথা তিনি বললেন এই রাজনৈতিক উপন্যাসটিতে। নিখিল শিক্ষিত মহৎ ব্যক্তিত্ব, উচ্চমনা, যিনি বন্ধু সন্দীপের স্পষ্ট বিরোধী, যে নির্মমভাবে জনগণকে বিদেশি দ্রব্য বয়কটে টেনে আনে। নিখিলের সদয়হৃদয়া, খেয়ালি স্ত্রী বিমলা, যে স্বামীকে তার বিশ্বাসচ্যুত করতে চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত শুদ্ধতা নিয়ে বিমলা অনুতপ্ত চিত্তে স্বামীর কাছে ফিরে আসে যাবতীয় দোলাচলতা বিসর্জন দিয়ে। নিখিল মনে করে, দেশের সামর্থ্য সত্যনির্ভর, আর সন্দীপ মেফিস্টো সুলভ মন্তব্যে মাতে, বিবেকবিদ্ধ হয় সবশেষে। নিখিলের যাতনাময় চরিত্রায়ন পাঠক-হৃদয়কে টানে, সন্দীপের আদর্শ নিয়ে লোফালুফি চিত্রণে লেখক বঙ্গীয় মাথাগরম ব্যক্তিদের সমালোচনা করেন। গৌণচরিত্রগুলি জীবন্ত, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্ব পায় অনুগত অমূল্য, নিখিলের পুরোনো শিক্ষক, পঞ্চু, বিমলার জা ও তার ব্যঙ্গোক্তি। তাঁর সমালোচকরা যে নিন্দা করবে, অনেক সময় অসঙ্গতভাবেই, এটা ঠিক, হয়তো বলবে স্বদেশপ্রেমের অভাব তাঁর মধ্যে। এমনকি তাঁদের মনে হবে শৈল্পিক ত্রুটির কথাও। তবে লেসনির মনে হয় রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাসটি তাঁর অন্যান্য পরবর্তী সমাজ-বিষয়ক উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিমান পূর্বসূরি। লেসনির অনুধাবন, অনুমান, মোটের ওপর যে মানবার মতো তাতে সন্দেহ নেই বলে মনে হয়।

প্রাগের আর এক প্রাচ্যজ্ঞ Dusan Zbavitel যিনি শুধু নানা ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস লেখেন নি, বাংলা সাহিত্যেরও চমৎকার একটি ইতিহাস লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে তাঁর কয়েকটি অত্যন্ত মূল্যবান লেখা বের হয় তাঁরই সম্পাদিত *Archiv Orientalni* পত্রিকায় ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে। লেখাগুলি রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্য বিষয়ে কালানুক্রমিক। এরই একটিতে *ঘরে-বাইরে* বিষয়ে অত্যন্ত মূল্যবান লেখা আছে। জ্বাভিটেলের বৈশিষ্ট্য— তিনি সমাজ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে যথাবিস্তারী গুরুত্ব দিতে চান এবং রবীন্দ্র-উপন্যাসকে দেখেন তাঁর সমকালীন কর্মকাণ্ড, প্রবন্ধ, পত্র ইত্যাদির সূত্রেই। প্রথমেই বলে নেন ১৯১৫-১৬-তে *সবুজপত্র* পত্রিকায় উপন্যাসটি প্রকাশের কথা। সে সময় মডারেটরা (কংগ্রেসি) ব্রিটিশকে তাদের আনুগত্য বিষয়ে নিশ্চিন্ত করতে চাইছিল, ভারতীয়দের ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে অনুরোধ করছিল। অন্যদিকে চরমপন্থীরা যুদ্ধ থেকে ফায়দা লুটতে চাইছিল, তাই শাসানি ও বিব্রত করার কাজ নিয়েছিল। কিন্তু বুর্জোয়াজির এইসব কাজে জনতার তেমন সমর্থন ছিল না, তারা জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে বেশ কয়েক বছর উৎসাহ দেখায় নি। রবীন্দ্রনাথ কোনো পক্ষেই গেলেন না, কংগ্রেস ত্যাগ করে রাজনীতিই বর্জন করলেন। কারণ রাজনীতিতে ক্রমান্বয়ে হিংসা ঢুকে পড়ছিল। কিন্তু বিদেশি দ্রব্য বয়কট আন্দোলনের তিনি তীব্র নিন্দা করলেন ('সত্যের আহ্বান'), সন্ত্রাসবাদের সমালোচনা করলেন। শক্তির দর্শন বা পার্টি রাজনীতি যা মানবপ্রেম এবং মুক্ত বাককে, অনুধাবনকে পদদলিত করে তাতে তাঁর সায় ছিল না। এ সবই উপন্যাস-রূপ পেল *ঘরে-বাইরে*-তে। এ সব কথা নিখিলের উক্তিতে, যাকে বিমলার ভালোবাসা পুনরায় জয় করে নিতে হয়। বিমলা সন্দীপের স্বদেশি বাক্যস্রোতে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। নিখিল ছোটো দোকানির বিরুদ্ধে হিংসায় আপত্তি করে, বিদেশি দ্রব্য লুঠের সমালোচনা করে। শ্রমজীবীরা বাজে এবং দামি স্বদেশি কিনতে বাধ্য হচ্ছিল। জ্বাভিটেলও বলেন, উপন্যাসটির সাহিত্যগত মূল্য সন্দেহজনক, যদিও অমিয় চক্রবর্তী বলেছিলেন *ঘরে-বাইরে* রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উপন্যাস, যা নাকি ইউরোপীয় ক্রিটিকরা বলেছে। তিনি তাতে সন্দেহ পোষণ করেন (রেণু মিত্রের *রবীন্দ্রনাথের ঘরে-বাইরে* বইটির অমিয় চক্রবর্তী -কৃত ভূমিকা)। বরং উল্টোটাই সত্য। ভারতীয়রা এ উপন্যাসকে আক্রমণ করেছে অশালীন এবং অস্বদেশপ্রেমী বলে, সাহিত্যগত ত্রুটির জন্য ইউরোপীয় আলোচকরা আরো তীব্র সমালোচনা করেছে। তিনি শুধু ই. এম. ফর্স্টার-এর মন্তব্যই সমর্থনে তুলে ধরেন, যিনি বলেছিলেন, উপন্যাসটি 'বোর্ডিং হাউস-এর

ছলাকলা'র উপন্যাস। অতএব তাঁর সিদ্ধান্ত— উপন্যাসটির মূল্য যতটা ঐতিহাসিক ততটা সাহিত্যগত নয়, এটি জাতীয়তাবাদ থেকে রবীন্দ্রনাথের দ্রুত সরে আসারই আর একটা উদাহরণ।

এ পর্যন্ত যা সংগ্রহ করা গেল তার ভিত্তিতে কয়েকটি মন্তব্য করা চলে। ক. যাদের উদাহরণ দিলাম তাঁরা কেউই বাংলায় উপন্যাসটি পড়েন নি, ইংরেজি অনুবাদেও রদবদল ঘটেছে। আর, আরোনসন ঠিকই বলেছেন, বেশিরভাগ আলোচনাই half-hearted। এর মধ্যে চূড়ান্ত সার্থক থেকে চূড়ান্ত ব্যর্থ দুই শীর্ষবিন্দু পর্যন্ত গতায়াত লক্ষ করা গেছে। খ. উপন্যাস আলোচনা মানেই দেশ কাল সমাজের কিছু কথা আর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ। কিন্তু এটাই কি উপন্যাসের আলোচনা? গ. উপন্যাসের নির্মাণ নিয়ে আলোচনা নেই বললেই চলে। ভাষা, ডায়েরি প্যাটার্ন এ সব নিয়ে দুএকটি মন্তব্য মাত্র। ঘ. জ্বাভিতেল, লেসনি বা রুশ আলোচকদের কেউ কেউ সমাজপরিপ্রেক্ষিতকে গুরুত্ব দিয়েছেন সংগতভাবে, তাদের মানসগঠনের জন্যই। আরো সংগত, পূর্ণায়ত আলোচনার জন্য আমাদের অপেক্ষা করে থাকতে হবে পাশ্চাত্যের কাছে— গত্যন্তর নেই।

প্রসঙ্গ-নির্দেশ

১. *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে রাজনীতিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অমিয় চক্রবর্তীকে চিঠিতে লিখছেন, 'মানুষের অন্তরের সঙ্গে বাইরের এবং একের সঙ্গে অন্যের ঘাত-প্রতিঘাতে যে হাসিকান্না উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে এর মধ্যে তারই বর্ণনা আছে। তার চেয়ে বেশি যদি কিছু থাকে সেটা অবান্তর এবং আকস্মিক।' (চৈত্র ১৩২৬) *সবুজপত্র*-ও বলেছেন (অগ্রহায়ণ ১৩২২), 'ঘরে-বাইরে লেখার উদ্দেশ্য যা খুশি গল্প লেখা।' কিন্তু তবু উপন্যাসটি সংগত কারণেই রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার্য হয়েছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'উপন্যাসের মুখ্য অবলম্বন কিন্তু রাজনীতি'। আরও অনেকে এমন বলেছেন।

২. 'He [ Yeats ] said that of Father's recent works, *My Reminiscences* and *The Home and the World* had impressed him most. ... He said *The Home and the World* was very true of Irish Society at the present time. All the problems apply equally well to his country. He asked if it had not stirred up strong feelings in India, for he was sure it would have done so in Ireland, if a similar book were written by an Irish Writer.' (*On the Edges of Time* by Rathindranath Tagore, Orient Longman, 1958 p. 134.)
রথীন্দ্রনাথ আরো লিখেছেন যে, সুইট্‌জারল্যান্ডের ইটালি সীমান্তে এক গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে এক বাড়ির মালিকের সঙ্গে আলাপ হয়, যার বোন বিশেষ করে *চিত্রা, ঘরে-বাইরে* ও *ডাকঘর* খুবই পছন্দ করতেন। প্রতি সন্ধ্যায় তিনি গ্রামবাসীদের কাছে এই তিনটি বইয়ের কোনো না কোনো অংশ পাঠ করে শোনাতেন। তার জীবিকা ছিল চামড়ার আসন তৈরি, যাতে ভারতীয় ডিজাইন থাকত। (*Ibid.*, p. 164.)
ইয়েট্‌স্ একটা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে আপ্লুত ভঙ্গিতে জানাচ্ছেন, বলতে চাই যে আমি আজও আপনার সবচেয়ে বিনীত ছাত্র আর প্রশংসাকারী। আপনার কবিতা, আপনি তো জানেন, আমার কাছে বিপুল উত্তেজনা নিয়েই আসে; আর সাম্প্রতিক কালে আমি খুঁজে পেয়েছি প্রজ্ঞা ও সৌন্দর্য, দুটোই আপনার গদ্যে— *ঘরে-বাইরে*-র মধ্যে (*The Golden Book of Tagore* দ্রষ্টব্য)।

৩. যাকে ফর্স্টার বলেছেন 'বাবু বাক্য', হাস্যকর হয়তো সেটাই অন্যভাবে ব্যক্ত প্রাচ্য এক আলোচকের দ্বারা। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী বলেছেন *ঘরে-বাইরে*-র কোথাও কোথাও আছে 'আতিশয্য'— 'সেটি হল ভাষার ফেনায়িত ভাব অর্থাৎ বাগ্‌বাহুল্য এবং আবেগধর্মী কাব্যিক অতিরেক।' এবং 'ফেনায়িত বাগ্‌বাহুল্য, কাব্যিক বিলাস প্রসাধনী অলংকারের অতিরেক ও মনন পরিশীলিত সচেতনতার দরুণ সব মিলিয়ে যেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হল প্রধান পাত্রপাত্রীদের ভাষারীতিতে বৈচিত্র্যের অভাব।' (*রবীন্দ্র-উপন্যাসের নির্মাণশিল্প*, পৃ. ১৭০-৭১।)

৪. জোসেফ কনরাড-এর এই উপন্যাসটির (১৯০৭) অদ্ভুত গল্প, যা সুদক্ষ চরিত্রায়ণ, মেলোড্রামাটিক আয়রনি এবং মনস্তাত্ত্বিক চক্রান্তের জন্য খ্যাত। অ্যাডল্‌ফ ভেরলক এক জড়তাগ্রস্ত পূর্ব ইউরোপিয় সিক্রেট এজেন্ট,

লন্ডনে দোকানের মালিক, অ্যানার্কিস্ট, ডিনামাইট দিয়ে গ্রিনউইচ অবজারভেটরি উড়িয়ে দিতে চায়। ভেরলকের মানসিক অসুস্থ শ্যালক ঘটনাচক্রে বিস্ফোরণে নিহত হয়। ভেরলকের স্ত্রী উইনি ক্রোধে ভেরলককে হত্যা করে। তার স্বামীর অ্যানার্কিস্ট বন্ধু প্রতারণা করলে উইনি আত্মহত্যা করে।

৫. উইলকি কলিন্‌স্ (১৮২৪-৮৯) রহস্যগল্পের স্রষ্টা। আইনজ্ঞ হয়ে জীবিকায় অনাগ্রহী, প্রথম উপন্যাস *পিতৃস্মৃতি*। *বেসিল* (১৮৫২) উপন্যাসে মধ্যবিত্ত আবহে, বোঝাপড়াহীন বাস্তবতায় বর্ণিল প্রলুব্ধকরণ ও প্রতিশোধ বর্ণিত। ডিকেন্সের প্রভাব ছিল তাঁর উপন্যাসে যথেষ্ট।

৬. ফ্রিডরিশ নীট্‌শে (১৮৪৪-১৯০০) অন্যতম প্রভাববিস্তারী দার্শনিক। তিনি বলতেন, ইচ্ছাশক্তিই মানবপ্রকৃতির ভিত্তি, কর্মে এর অস্বীকারই বিরক্তি জাগায়। শক্তিমান মানুষ, যিনি প্যাশননিয়ন্ত্রক, যিনি আত্মচরিত্রকে সৃজনশৈলি দিতে সক্ষম। নীট্‌শে প্রভু এবং দাস নৈতিকতার বৈপরীত্য দেখান, অতিমানবতত্ত্বের, আত্মসৃষ্ট ব্যক্তিত্বের কথাও বলেন। একসময় জার্মানিতে এবং ভারতে নীট্‌শে-চিন্তা আকর্ষণ বিস্তার করেছিল।

৭. প্রমথ চৌধুরীর (বীরবল) মন্তব্য মনে পড়বে : 'ও উপন্যাসখানি একটি রূপককাব্য ছাড়া আর কিছুই নয়। নিখিলেশ হচ্ছে প্রাচীন ভারতবর্ষ, সন্দীপ নবীন ইউরোপ আর বিমলা— বর্তমান ভারত।' ('শিক্ষার নব আদর্শ', *সবুজপত্র*, মাঘ, ১৩২২।)

৮. ১৮৭২-এ প্রকাশিত এই উপন্যাসে (*The Possessed*) ডস্টয়েভস্কির বিশ্বাস, বিপ্লবীরাই রুশ আত্মার দর্পণ, রক্ষণশীল খ্রিস্টিয়ত্য এবং শুদ্ধ জাতীয়তাবাদের ভূত না তাড়ালে, তারা দেশটাকে উচ্চ চূড়ায় তুলে দেবে। মানব-পাপের বিশুষ্ক বিচারের দিক থেকে উপন্যাসটি ধ্রুপদী রূপে গণ্য হয়েছে। এক জীর্ণ শহরে বহিরাগত প্রতিবাদীরা ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ চালায়। বিভ্রান্তিকর স্টাভরোগিন উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র, যার চৌম্বক ব্যক্তিত্ব তার শিক্ষককে, উদারপন্থী বুদ্ধিজীবী স্টেফান ভেরখোভেনস্কিকে প্রভাবিত করে। শিক্ষকের ছেলে পিওতর এবং অন্যান্য র‍্যাডিকালরা প্রভাবিত হয়। স্টাভরোগিন দিগ্‌ভ্রান্ত সবল মানুষ, সততা ও মহত্ত্বের ধারক। শেষে স্টাভরোগিন আত্মহত্যা করে, ভেরখোভেনস্কিকে মৃত্যুশয্যায় গির্জায় নিয়ে যাওয়া হয়।

৯. ফরাসি লুই জিলে *আনা কারনিনা*-র এবং হাঙ্গারির ওয়াজটিলা *যুদ্ধ ও শান্তি*-র সাদৃশ্যের কথা বলেছেন। কিন্তু এটি কষ্ট-কল্পনা। টলস্টয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল মিনারস্পর্শী ব্যক্তিত্ব, বিপুল সৃজন-মনীযায় কিন্তু অমিল physical and moral passion-এ। লেনিন primaeval chunk of a man টলস্টয়ে দেখেছেন, রবীন্দ্রনাথে তা ছিল না। *যুদ্ধ ও শান্তি* (১৮৬৫) এপিক ঐতিহাসিক উপন্যাস, উনিশ শতকীয় রুশ সমাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তবতায়, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বৈচিত্র্যে পূর্ণ। পাঁচটি অভিজাত পরিবারের কাহিনির ধারাস্রোত চলছে নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধের (১৮০৫-১৪) আবহে। টলস্টয়ের একটা অস্তিবাচক জীবন-পিপাসা *আনা কারনিনা*-র (১৮৭৫-৭৭) বিষয়— নিষিদ্ধ প্রেম কারনিনের স্ত্রী আনা-র সঙ্গে তরুণ অবিবাহিত যুবক ভ্রনস্কির মধ্যে। অনুতপ্ত আনা সন্তানবতী হয়, মনোদুঃখে ট্রেনের তলায় ঝাঁপ দেয়। সমান্তরাল প্রেম-কাহিনি একটা আছে— তা কিটি ও লেভিনের মধ্যে। এই কালজয়ী উপন্যাসের সঙ্গে *ঘরে-বাইরে*-র মিল— দুটোতেই প্রেম আছে, নিষিদ্ধপ্রেম, এই মাত্র। পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবীদের পাঠনিষ্ঠা সম্পর্কে যাদের দুর্বলতা আছে, এবংবিধ তুলনা তা কথঞ্চিৎ দূর করতে সমর্থ হবে।

১০. ১৯০৫, ৫ জুলাই বঙ্গভঙ্গের সরকারি ঘোষণা। ১৩ জুলাই কৃষ্ণকুমার মিত্র-কর্তৃক *সঞ্জীবনী* পত্রিকায় সামগ্রিক বয়কটের কথা। ১৯০৩-০৫ প্রায় তিনশ প্রতিবাদ-সভা। ১৯০৫, ২৫ অগস্ট টাউন হল্-এর প্রতিবাদ-সভায় রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি। ১৯০৫, ২৮ সেপ্টেম্বর, কালীঘাট মন্দিরের সভায় বয়কটের শপথ। ছাত্রসমাজের এগিয়ে আসা। বিলেতি জিনিস, ইংরেজ— সামাজিক বয়কট। স্বদেশি আন্দোলন, স্বদেশি সামগ্রী উৎপাদনের চেষ্টা। ১৯০৬ বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ প্রতিষ্ঠা। ১৯০৬ কলকাতা অধিবেশনে কংগ্রেসি নরম ও চরমপন্থীদের তীব্র বিরোধ। মেদিনীপুরে, কলকাতায় ১৯০২ থেকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, ১৯০৭-০৮-এ কাজের পরিধিবিস্তার। ১৯০৮, ২ জুন, মানিকতলায় বোমার কারখানা আবিষ্কার। বাংলায় শাসক হত্যাপ্রয়াসের ব্যাপকতা। স্বদেশি ডাকাতি, খুন, জখম, দাঙ্গা ১৯০৭-এর পর। রবীন্দ্রনাথ স্বাস্থ্য শিক্ষা স্বনির্ভরতার আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে আনার কর্মযজ্ঞ শুরু করেন। বয়কট-নীতি তাঁর পছন্দের ছিল না। হিংসার রাজনীতি এবং বিপ্লবী সন্ত্রাস তাঁর অপছন্দ ছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেকে সব রকম আন্দোলন ও উত্তেজনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলেন।

# রবীন্দ্র-শরৎ-রামানন্দ প্রসঙ্গ :
## লেখক-সম্পাদকের বিতর্ক

### সুদীপ বসু

১ কবি ও সম্পাদক : একদা কী করিয়া মিলন হল দোঁহে...

লেখকের সঙ্গে পত্রিকা-সম্পাদকের গভীর প্রণয় নাকি দুর্লভ! প্রকাশ্যে উভয়েরই ওষ্ঠে মিষ্ট হাসি বিরাজ করে। কিন্তু অন্তরে পরিপক্ক হিসেবি বুদ্ধি— কী দিলাম আর কী পেলাম। এই তত্ত্ব অন্তত একটি ক্ষেত্রে পুরো সত্য হয় নি— রবীন্দ্রনাথ-রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের দীর্ঘকালীন বন্ধুত্ব আর্থিক লেনদেন ছাপিয়ে পৌঁছেছিল তাঁদের হৃৎমহলে।

সেই ইতিহাস বৃহৎ আকারে উপস্থিত করার সুযোগ বর্তমান প্রবন্ধে নেই। আমরা পরে অল্পভাবে সে কথা বলব। তার আগে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পত্রিকা-সাধনার প্রস্তুতি ও বিকাশ-পর্ব বিষয়ে কিছু কথা হাজির করা দরকার। বিশ শতকী বাংলা সাহিত্যের আগ্রহী পাঠকের কাছে এটি জ্ঞাত সত্য যে রামানন্দ পঞ্চাশ বৎসর ধরে *প্রবাসী* এবং *মডার্ন রিভিউ* নামক দুই পত্রিকা-অশ্বের সওয়ার ছিলেন। এবং নিঃসন্দেহে তিনি উত্তম সওয়ার। পত্রিকা পরিচালনায় যে যোগ্যতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন তার ভিত্তিভূমিও সযত্নে নির্মিত।

রামানন্দ বাঁকুড়ায় জাত, কিছু বছর পালিত। তারপর কলকাতায় বর্ধিত। এই দুই স্থানে অতিবাহিত তাঁর ছাত্রজীবন। প্রথমাবধি ভালো ছাত্রের সুনাম ছিল— ছাত্রবৃত্তি-প্রাপ্তি, প্রবেশিকা পরীক্ষায় চতুর্থ স্থানের অধিকারী, বি.এ. অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম, এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে চতুর্থ। এম.এ. পাসের পরে বাঙালি ছেলের লোভনীয় চাকুরি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটগিরি হেলায় ত্যাগ করেছেন (তার আগে বি.এ. পাস করে স্টেট স্কলারশিপ নিয়ে বিলাতযাত্রার উচ্চ আকাঙ্ক্ষাও)। জীবন-পথের সূচনাতে রামানন্দ দেখিয়েছিলেন তিনি দীর্ঘ লড়াইয়ের সৈনিক, আরামের জীবন তাঁর নয়। জুলাই ১৮৮৮ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৮৯০ পর্যন্ত দেড় বছর সিটি কলেজে অবৈতনিক অধ্যাপকের কাজ করার পর মার্চ ১৮৯০ থেকে ওখানেই বেতনভুক্ অধ্যাপনার কাজ শুরু। রামানন্দের সম্পাদক-জীবনের আরম্ভ এইকালে। *ইন্ডিয়ান মেসেঞ্জার*-এর সহকারী সম্পাদক, *ইন্ডিয়ান মিরর*-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য রচনা ছাড়াও কৃষ্ণকুমার মিত্রের পত্রিকা সাপ্তাহিক *সঞ্জীবনী*-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলেন।[১] শশিভূষণ বসুর মাসিক পত্রিকা *ধর্ম্মবন্ধু*-র অন্যতম লেখক তিনি। পরে সম্পাদনা-কার্যে যুক্ত।

ব্রাহ্মসমাজ পরিচালিত সিটি কলেজের সঙ্গে রামানন্দর সংযুক্তির কারণ সিটি কলেজেরই তিনি ছাত্র ছিলেন, তদুপরি কলেজটি ব্রাহ্মসমাজ পরিচালিত এবং ব্রাহ্মধর্মে তাঁর আসক্তির সূত্রপাত তাঁর ছাত্রজীবনে।[২] সিটি কলেজে অধ্যাপনার সময় ব্রাহ্মসমাজের নানা কাজে তিনি যুক্ত হয়েছিলেন; তার অন্যতম ক্ষীরোদচন্দ্র দাস ও মৃগাঙ্কধর রায়চৌধুরী নামক দুই ব্রাহ্ম যুবক-স্থাপিত জনহিতকর প্রতিষ্ঠান দাসাশ্রমের সঙ্গে যুক্ত থাকা এবং দাসাশ্রমের

মুখপত্র *দাসী*-র সম্পাদক পদে বৃত হওয়া। সম্পাদকের দায়িত্ব এবং কর্তব্য বিষয়ে রামানন্দ প্রথমাবধি কী পরিমাণে সচেতন তা *দাসী*-র প্রথম সংখ্যার প্রস্তাবনায় স্পষ্ট :

> বঙ্গসাহিত্য-সংসারে মাসিক পত্রিকার অভাব নাই। এতগুলি মাসিক পত্রিকা থাকিতে আমরা কেন আর একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রকাশ করিতেছি, এই প্রশ্ন সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। রাজনীতি, সাহিত্য, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব বা বিজ্ঞানের অনুশীলন আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বঙ্গীয় পুরুষ এবং রমণীগণের হৃদয়ে সেবার ভাব জাগাইয়া দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। (*দাসী*, ১২৯৯ আষাঢ়।)

আমরা পরে দেখেছি, *দাসী*-তে অনালোচিত এবং পরিত্যক্ত বিষয়গুলিকে যথা রাজনীতি সাহিত্য ইতিহাস বা বিজ্ঞান পরে *প্রদীপ* এবং *প্রবাসী*-তে তিনি সযত্নে স্থান দিয়েছিলেন। কারণ রামানন্দ জানতেন পত্রিকার চরিত্র বদলের সঙ্গে সম্পাদকের মন বদল হয়। অন্তত পত্রিকার স্বার্থে তা করে নিতেই হয়।

রামানন্দর কর্মজীবন কিছু কালের জন্য কলকাতা থেকে এলাহাবাদে সরে গিয়েছিল। ১৮৯৫-এর অক্টোবর থেকে ১৯০৬-এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি এলাহাবাদ কায়স্থ পাঠশালা কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮৯৭-এর ডিসেম্বরে কলকাতা থেকে তাঁর সম্পাদনায় *প্রদীপ* পত্রিকা প্রকাশিত হল। দুই বৎসর পরে *প্রদীপ* সম্পাদনার দায়িত্ব তিনি ত্যাগ করেছেন। কিন্তু পত্রিকা-সম্পাদনা রামানন্দকে ছাড়ে নি। সুতরাং দীপবর্তিকায় নতুন শিখা জ্বলল— ১৩০৮ বৈশাখে সচিত্র মাসিক পত্রিকা *প্রবাসী*-র আত্মপ্রকাশ। বলা বাহুল্য *প্রবাসী*-র সগৌরব প্রকাশনার পিছনে পত্রিকা-সম্পাদনায় রামানন্দর বহুতর অভিজ্ঞতা জলনিষেক করেছে।

লেখক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পাদক রামানন্দর বন্ধুত্ব *প্রদীপ* পত্রিকার সূত্রে। *প্রদীপ*-এ রবীন্দ্রনাথের 'শরৎ' কিংবা 'বিদায়'-এর মতো কবিতা বেরিয়েছে। প্রয়াত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু অসমাপ্ত রচনা (যার মধ্যে রবিবর্মা বিষয়ে লেখাটি আছে) সমাপ্ত করে *প্রদীপ*-এ রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছিলেন তাঁর কলমে *প্রদীপ* পত্রিকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পাওয়া গেছে।[৩] রবীন্দ্রনাথ-রামানন্দ আরো কাছাকাছি এলেন *প্রবাসী* পত্রিকার সূত্রে। ১৩০৮ বৈশাখে *প্রবাসী*-র প্রথম সংখ্যাটি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'প্রবাসী' কবিতাকে ধারণ করেছিল। তারপর বছরের পর বছর *প্রবাসী*-র শীর্ষে রবীন্দ্রলাঞ্ছিত কেতন উড়েছে।

কীভাবে *প্রবাসী*-কে রবীন্দ্রনাথ ভরিয়েছিলেন তার যৎসামান্য খতিয়ান এইরকম— 'মাষ্টারমশায়' (১৩১৪ আষাঢ়, শ্রাবণ), *গোরা* (১৩১৪ ভাদ্র-১৩১৬ চৈত্র), *জীবনস্মৃতি* (১৩১৮ ভাদ্র-১৩১৯ শ্রাবণ), *অচলায়তন* (১৩১৯ আশ্বিন), 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম' (১৩২৪ ভাদ্র), 'ছোট ও বড়' (১৩২৪ অগ্রহায়ণ), *মুক্তধারা* (১৩২৯ বৈশাখ), *রক্তকরবী* (১৩৩১ আশ্বিন), *শেষের কবিতা* (১৩৩৫ ভাদ্র-চৈত্র) ইত্যাদি।

'না, কোনোভাবেই প্রবাসীর কাছে রবীন্দ্রনাথ কী ছিলেন উপযুক্তভাবে বোঝানো যাবে না। এবং কিছু নীচু স্বরে, রবীন্দ্রনাথের জন্য প্রবাসী কত কি করেছে তাও কি বোঝানো যাবে? আদর্শের প্রেরণা, ভক্তির আনুগত্য, বন্ধুত্বের নিষ্ঠা এবং অবশ্যই ব্যবসায়িক স্বার্থ, সানন্দে মিলিত হয়েছিল রামানন্দর প্রবাসী-গত রবীন্দ্র-সাধনায়। রামানন্দ রবীন্দ্রনাথকে প্রথমাবধি চিনেছিলেন— সেই জ্ঞান অটুট ছিল শেষ পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে তাঁর মর্যাদারক্ষায় রামানন্দ-তুল্য অক্লান্ত সংগ্রামী এবং বিজয়ী যোদ্ধা আর কেউ ছিলেন না; রবীন্দ্রনাথও অপরের ঈর্ষাতুর চোখের সামনে নিজ ভাণ্ডার প্রবাসীর কাছে উন্মোচন করে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ সাহায্য ছিল পারস্পরিক।'[৪] *প্রবাসী*-র পৃষ্ঠা ওল্টালে দেখা যাবে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ, বিশ্বভারতী এবং শান্তিনিকেতনের সংবাদ রামানন্দ অবিরামভাবে হাজির করেছেন এবং রবীন্দ্রগ্রন্থের উপযুক্ত মূল্যায়নে *প্রবাসী*-র প্রয়াস অব্যাহত ছিল।

রবীন্দ্রনাথ-রামানন্দর সঘন ব্যক্তিসম্পর্কের কিছু দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া যায়। রবীন্দ্র-আকর্ষণে রামানন্দ শান্তিনিকেতনে বসতি করেছেন এবং সেখান থেকে দুবছর *প্রবাসী* ও *মডার্ন রিভিউ*-র সম্পাদনার কাজও। কায়স্থ পাঠশালায় প্রাক্তন অধ্যক্ষ রামানন্দ পুনশ্চ রবীন্দ্র-অনুরোধে বিশ্বভারতীর শিক্ষাভবনের গুরুদায়িত্ব কাঁধে

তুলে নিয়েছেন। নাইট উপাধি বিসর্জনের সময় রবীন্দ্রনাথ রামানন্দর সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন (দ্বিতীয় ব্যক্তি সি. এফ. এণ্ড্রুজ)। রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত *The Golden Book of Tagore* গ্রন্থের সম্পাদক রামানন্দ। রবীন্দ্র-তিরোধানের পর তিনি বিশ্বভারতী আশ্রমিক সংঘের সভাপতি।[৫]

রবীন্দ্রনাথ-রামানন্দর এই উত্থিত সম্পর্কের মধ্যে বৎসরকালীন পতনও ছিল। জীবনের ধর্মই তাই— অভ্যুদয়, পতন, পুনশ্চ অভ্যুদয়। তবে সে প্রসঙ্গ বর্তমানে আলোচ্য নয়।[৬] কারণ, রবীন্দ্রনাথ-রামানন্দর মাঝে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছেন তৃতীয় ব্যক্তি— শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্র বিষয়ে রামানন্দর প্রথমাবধি ধারণা, তাতে কিছু পরিবর্তন, *প্রবাসী* পত্রিকায় তার প্রতিফলন, নরেন্দ্র দেবের *সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র* গ্রন্থসূত্রে *প্রবাসী*-তে রামানন্দর মতপ্রকাশ, অতঃপর বিবাদবিতর্ক এবং পুরো ব্যাপারটিতে রবীন্দ্রনাথের জড়িত হয়ে যাওয়া— আমাদের আলোচনার লক্ষ্য তাই।

## ২ রবীন্দ্র-শরৎ সম্পর্ক : অনুরাগে ও বিরাগে

শরৎ-প্রতিভার যথেষ্ট সমাদরমূলক প্রশংসা রবীন্দ্রনাথ করেছেন। তাঁর চোখের উপর শরৎচন্দ্রের উদয় এবং অস্ত। তিনি দেখেছেন শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি 'বাঙালির হৃদয়রহস্যে' ডুব দিয়েছে। এ হেন মানুষটির লেখকজীবন সম্পর্কে তাঁর 'উজ্জ্বল আশা আর আনন্দ' ছিলই। এমনকি ব্যক্তি-মানুষটিকে নিয়েও তাঁর কৌতূহল কম নয়।[৭] *নিষ্কৃতি* উপন্যাসের ইংরেজি ভাষান্তর *Deliverence*-এর ভূমিকা-লেখক তিনি— সেখানে অপর্যাপ্ত প্রশংসা। আর সর্বোচ্চ প্রশংসা 'সাধারণ মেয়ে' কবিতাটির মধ্যে। সেখানে শরৎচন্দ্রের নায়িকা এলোকেশীর ভাগ্যোন্নতি দেখে ওই কবিতার নায়িকা শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করেছিল তাকে নিয়ে একটি গল্প লিখতে। বঞ্চিতা নারীর দীর্ঘনিশ্বাসপূর্ণ এই কবিতায় শরৎচন্দ্রের মানবপ্রেমিক লেখকসত্তা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি।

শরৎচন্দ্র বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের একাধিক গদ্যরচনা আছে। যেমন ১৩৩৮-এ প্রেসিডেন্সি কলেজের বঙ্কিম-শরৎ সমিতি আয়োজিত শরৎ-সংবর্ধনা উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকায় 'শরৎচন্দ্র' নামক প্রবন্ধ (*প্রবাসী*, ১৩৩৮ আশ্বিন); ১৩৩৯-এর ৩১ ভাদ্র কলকাতার টাউন হলে দেশবাসীর পক্ষ থেকে প্রদত্ত শরৎ-সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের প্রেরিত ভাষণ; ১৩৪৩-এ শরৎচন্দ্রের একষট্টি বছরে পদার্পণ উপলক্ষে সাহিত্যসংস্থা 'রবিবাসর'-আয়োজিত অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রভাষণ ('শরৎচন্দ্রের প্রতি', *বিচিত্রা*, ১৩৪৩ অগ্রহায়ণ); শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতর্পণ (*ভারতবর্ষ*, ১৩৪৪ চৈত্র)। মহাকবির কলমনিঃসৃত হওয়াই কেবল এই সব রচনার পরম গৌরব নয়, বাংলা সাহিত্যের এক কাল পেরিয়ে অন্য কালে কথাশিল্পীর মহিমা কীভাবে বিরাজ করবে— তার নিঃসংশয় উচ্চারণ এখানে আছে।

রবীন্দ্রনাথের মুগ্ধ ভক্ত শরৎচন্দ্রও। তাঁর সাহিত্যজীবনের ধ্রুবতারা রবীন্দ্রনাথ। শরৎ-স্মৃতিকথায় তার বিশেষ পরিচয় মেলে। সানন্দে তিনি বলেছেন, 'আমার মতন এমন করে রবিবাবুর বই বোধহয় কেউ পড়েনি। আমি গর্বের সঙ্গে বলে দিতে পারি কোন্ কথাটার পর ঠিক কোন্ কথাটা বইয়ে আছে।' *বলাকা* তাঁর প্রিয় কাব্য। জীবনের শেষ পর্বে ঢাকায় গিয়ে জ্বরের ঘোরে অবিরাম *বলাকা*-র কবিতা আবৃত্তি করেছেন। রেঙ্গুনে থাকার সময় অর্থকৃচ্ছ্রতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের *চয়নিকা* কিনে দান করেছেন রেঙ্গুন বেঙ্গল ক্লাবের লাইব্রেরিতে। একাধিক রচনায় শরৎচন্দ্রের রবীন্দ্রপ্রণাম নিবেদিত। ১৩৩৮-এ রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে লিখিত তাঁর অভিভাষণটি তার মধ্যে সেরা। বাঙালির জাতীয় সত্তা কীভাবে রবীন্দ্রপ্রতিভায় নির্মিত, কীভাবে তিনি জীবনের সর্বদিক থেকে আমাদের সম্পন্ন করেছেন, গম্ভীর মন্ত্রপাঠের সুরে শরৎ-কণ্ঠে তার উচ্চারণ :

কবি, তুমি অনেক দিয়েচ, এই দীর্ঘকাল তোমার কাছে আমরা অনেক পেয়েছি। সুন্দর, সবল, সর্বসিদ্ধিদায়িনী ভাষা দিয়েছ তুমি, তুমি দিয়েছ বিচিত্র ছন্দোবদ্ধ কাব্য, দিয়েছ অনুরূপ সাহিত্য, জগতের কাছে বাংলা ভাষা ও ভাবসম্পদের শ্রেষ্ঠ পরিচয়, আর দিয়েছ যা সকলের বড়— আমাদের মনকে তুমি দিয়েছ বড় করে।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে লিখিত মানপত্রটি শরৎচন্দ্রেরই রচনা যার মধ্যে দেশবাসীর অনিঃশেষ প্রণামের সঙ্গে শরৎচন্দ্র নামক বিশেষ ভক্তের প্রণামও আছে :

কবিগুরু, তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই। ... হাত পাতিয়া আমরা জগতের কাছে নিয়াছি অনেক, কিন্তু তোমার হাত দিয়া দিয়াছিও অনেক। হে সার্বভৌম কবি, এই শুভদিনে তোমাকে শান্ত মনে নমস্কার করি। তোমার মধ্যে সুন্দরের পরম প্রকাশকে আজি নতশিরে বারম্বার নমস্কার করি।

শরৎচন্দ্রের চিঠিতেও তাঁকে রবীন্দ্র-আবিষ্ট রূপে পেয়েছি। আত্মপ্রতিভার বিকাশে রবীন্দ্র-অবদানের মূল্য সেখানে ঘোষিত : 'আমার চাইতে তাঁকে কেউ বেশি মানেনি গুরু বলে— আমার চাইতে কেউ বেশি মক্‌সো করেনি তাঁর লেখা। ... আজকের দিনে যে এত লোক আমার লেখা পড়ে ভালো বলে, সে তাঁরই জন্য। এ সত্য, পরম সত্য আমি জানি।'[৮] এই কথাগুলি যে কেবল ভক্তির বাড়াবাড়ি নয়, তা নির্দেশ করে মনস্বী সাহিত্য সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার লিখেছেন :

... রবীন্দ্রনাথ যে মূল ভাবধারার প্রবর্ত্তন করিলেন, তাহারই ফলে, বঙ্কিম-যুগের বাংলা সাহিত্য পূর্ণ-যৌবনে পদার্পণ করিল, এবং বিংশ-শতাব্দীর প্রথম পাদে এ সাহিত্যের অভাবনীয় শ্রীবৃদ্ধি হইল। এই নব প্রবর্ত্তিত সাহিত্য সাধনারই একটি সুপরিপক্ব ফল— শরৎচন্দ্রের উপন্যাস; বস্তুত, পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের উদয় না হইলে শরৎচন্দ্রের উদয় সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। (*রবি-প্রদক্ষিণ*, মোহিতলাল মজুমদার, ১৩৪৫।)

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পারস্পরিক সমাদর সত্ত্বেও পরিচয়ের নৈকট্য ছিল না। কোথাও একটা বাধা লক্ষ করা গেছে। জীবনকালীন জনপ্রিয়তায় রবীন্দ্রনাথকে শরৎচন্দ্র ছাপিয়ে গেলেও ইন্টেলেকচুয়াল মহলে তাঁর রচনা যথেষ্ট সমাদৃত হয় নি বলে শরৎচন্দ্রের মনে ক্ষোভ ছিল। সেই হীনমন্যতাবোধের প্রতিক্রিয়ায় ক্রোধের সৃষ্টি। তাছাড়া সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিতে উভয়ের রীতিমতো বিভেদ। তাই রবীন্দ্রমুগ্ধতার কালেই শরৎচন্দ্রের মনে রবীন্দ্র বিরোধিতার সূচনা। রেঙ্গুনে থাকার সময় রবীন্দ্রনাথকে খোঁচা দিয়ে তিনি 'গুরু-শিষ্য সংবাদ' (*যমুনা*, ১৩২০ ফাল্গুন) লিখেছেন। ওখানে গুরুর মুখে 'রসো বৈ সঃ', 'ভূমানন্দ', 'ত্যাগানন্দ', 'বিশ্বমানবতা' ইত্যাদি শব্দ বসানো হয়েছে, যা রবীন্দ্রসাহিত্যে বহু বার পাওয়া গেছে। সোজা কথায় রবীন্দ্রনাথের বলা ওই সব কথা নিছক ভাবের কথা, সত্যবস্তু তাতে কিছুমাত্র নেই। শান্তিনিকেতনে গুরুর আসনে বসে বস্তুজগতের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রেখে রবীন্দ্রনাথ কেবল ভাবের ফানুস বাতাসে ওড়াচ্ছেন— শরৎচন্দ্র ইঙ্গিতে বলতে চেয়েছেন।

পরবর্তীকালে রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক বিষয়ে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ করে শরসন্ধান করেছেন। এ সব ঘটনায় রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল শরৎচন্দ্র তাঁকে অকারণে বারম্বার আঘাত করেছেন। এঁদের ব্যবধান কমিয়ে আনার জন্য দিলীপকুমার রায় শরৎচন্দ্রের অনুমতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে চিঠিতে লিখেছিলেন, ১৩৩৩-এর ২৫ বৈশাখ রবীন্দ্র-জন্মদিনে তিনি এবং শরৎচন্দ্র শান্তিনিকেতনে যাবেন রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম নিবেদনের জন্য। কিন্তু তাঁরা যান নি। নিদারুণ অপমানিত রবীন্দ্রনাথ জন্মদিনেই দিলীপকুমারকে চিঠিতে লিখেছেন : 'আমি জানতুম শরৎ আসবেন না। ... প্রত্যেক ছোট বিষয়েই তিনি আমাকে ভুল বুঝতেন, কেননা তাঁর মন বিমুখ হয়েছে। ... খুব সম্ভব আমার প্রকৃতিতে এমন কিছু আছে যার সঙ্গে তাঁর সুর মিলবে না।'[৯] কয়েক বছর পরে শরৎচন্দ্র যখন রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের মাত্রা' প্রবন্ধকে আক্রমণ করে ওই নামেই প্রবন্ধ লিখেছেন, তখন রাগে জ্বলে উঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথ : 'ইঙ্গিতে তোমাকে আক্রমণ করা যদি আমার উদ্দেশ্য হয়, তবে সেটাকে

অপরাধ বলেই স্বীকার করব। আমি এমন কাজ করিনি, সেটা বিশ্বাস করে নিয়ো।' পরের বাক্যটি যথেষ্ট কঠিন : 'তুমি আমাকে বারবার তীব্র ভাষাতেই আক্রমণ করেছ— আমি কোনোদিন তার প্রতিবাদ করিনি এবং কখনোই প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে তোমার নিন্দা ক'রে শোধ তুলিনি। এবারেও সেই ফর্দে আর একটি সংখ্যা বাড়ল।"[১০]

ব্যক্তিত্বের সংঘাত এমনই পর্যায়ে পৌঁছেছিল! *প্রবাসী*-তে শরৎচন্দ্রের লেখা মুদ্রিত না হওয়ায় সম্পাদকের বিরুদ্ধে উত্থিত অভিযোগের উত্তর যখন রামানন্দ পরম্পরায় সাজাচ্ছিলেন, তখন পাশে পেয়েছিলেন মহাকবি রবীন্দ্রনাথকেই।

### ৩ *প্রবাসী*-তে শরৎচন্দ্র নয়

মূল ব্যাপার তাহলে কী দাঁড়াল? *প্রবাসী*-তে শরৎচন্দ্রের রচনা কখনো প্রকাশিত হয় নি এবং না-হওয়াটা রামানন্দর পক্ষে ব্যবসায়িক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কেননা শরৎচন্দ্র তখন জনপ্রিয়তম ঔপন্যাসিক। বিক্রির নিরিখে পুস্তক-প্রকাশক ও পত্রিকা-সম্পাদক মহলে তাঁর ঘোর কদর। তবু রামানন্দ কখনো শরৎচন্দ্রের দ্বারস্থ হন নি। তার কারণ কি এই— 'যেই হাতে পূজিয়াছি দেব শূলপাণি...' ইত্যাদি? না, *প্রবাসী*-সম্পাদকের কাছে শরৎচন্দ্র খারিজ হয়েছিলেন নৈতিকতার মানদণ্ডে। দুনীর্তির অশরীরী আত্মা শরৎচন্দ্রকে দীর্ঘকাল তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। তাঁর সন্দেহজনক ব্যক্তিজীবন এবং রচনাদির আঁশটে গন্ধ তৎকালীন সংস্কৃতিমান ব্রাহ্মসমাজে গৃহীত হয় নি।

ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন নেতৃপুরুষেরা বিখ্যাত ছিলেন তাঁদের প্রবল নীতিবোধের জন্য, যা কার্যত সংস্কারে পরিণত। এঁদের কয়েকজনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে রামানন্দ এসেছিলেন (তার উল্লেখ ইতিমধ্যে আমরা করেছি)। সিটি কলেজে বি.এ. পড়ার সময় জগদীশচন্দ্র বসুর সূত্রে তাঁর আত্মীয় এবং সেকালের নামী ব্রাহ্মনেতা আনন্দমোহন বসুর সঙ্গে রামানন্দ পরিচিত হন। আনন্দমোহন এবং শিবনাথ শাস্ত্রী সিটি স্কুল (পরে স্কুল ও কলেজ) প্রতিষ্ঠার অল্পদিন পরে ছাত্রদের নৈতিক ও ধর্মীয় জীবন গঠনের উদ্দেশ্যে ছাত্র-সমাজ স্থাপন করেন। প্রতি রবিবারে ব্রাহ্মনেতৃবৃন্দ ছাত্রদের চরিত্র গঠনের উপদেশ দিতেন। সিটি কলেজের ছাত্র হিসাবে রামানন্দ এই ছাত্র-সমাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে গিয়েছিলেন এমন সঙ্গত অনুমান রামানন্দর জীবনীকার যোগেশচন্দ্র বাগলের। যোগেশচন্দ্র বলেছেন, 'চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, সমাজনেতা শিবনাথ শাস্ত্রীও তেমনি রামানন্দকে নিজের দিকে টানিয়া লইলেন। বস্তুতঃ রামানন্দ শাস্ত্রীমহাশয়ের দ্বারা বিশেষ অনুপ্রাণিত হন। শিবনাথের কঠোর শ্রমশক্তি দেখিয়া তিনি ত বিমোহিত হইলেনই, উপরন্তু ইহা তাঁহার মধ্যে ধীরে ধীরে অনুক্রমিত হইতে লাগিল। রামানন্দের পরবর্ত্তী জীবন ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে।' এই সঙ্গে সিটি কলেজে অন্যতম অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্রর কথাও যোগেশচন্দ্র জানিয়েছেন। রামানন্দ নিজেই তাঁর এই অধ্যাপক সম্পর্কে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেছেন, হেরম্বচন্দ্র 'সুনীতির কঠোর ও দৃঢ় সমর্থক ছিলেন।"[১১]

শরৎচন্দ্রের পরাভব এই মানদণ্ডে। তদুপরি তাঁর কোনো কোনো রচনায় ব্রাহ্মবিদ্বেষ আছে, এমন সংবাদ রামানন্দকে তাঁর প্রতি বিমুখ করেছিল।[১২] এই অপ্রসন্নতা রামানন্দর বিচারবোধকে আচ্ছন্ন করেছিল কিনা সে প্রশ্ন উঠবে। ব্রাহ্ম চরিত্রাঙ্কনকালে সমতা রক্ষায় শরৎচন্দ্রের চেষ্টা রামানন্দর চোখে পড়ে নি।[১৩] শরৎচন্দ্র সম্পর্কে রামানন্দর বিতৃষ্ণার অন্য পরিচয় প্রসঙ্গত উপস্থিত করা যায়। ১৩৩৫-এর ৩১ ভাদ্র শরৎচন্দ্রের ৫৩তম জন্মদিনে ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। সেই অনুষ্ঠানের সংবাদ *প্রবাসী* বা *মডার্ন রিভিউ* পত্রিকায় প্রকাশিত না হওয়ায় রীতিমতো ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে কলম বাঁকিয়ে *কালি-কলম* পত্রিকার সম্পাদক মুরলীধর

বসু লিখেছিলেন : 'নীরব শ্রদ্ধার বহর— পৃথিবীর সব চেয়ে বড় বড় জিনিসগুলি একান্ত নীরবে সমাধা হ'য়ে থাকে—যেমন সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবীর পরিভ্রমণ। আমাদের শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবুও শরৎচন্দ্রের প্রতি তাঁর নীরব গভীর শ্রদ্ধা বড় সুন্দর ক'রে নিবেদন করেছেন। তাই শরৎ-জন্মোৎসব সভাতেও তিনি উপস্থিত হন নি বা 'প্রবাসী' বা 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় এ-সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ করেন নি। বাঙ্‌লার বদরসিক লোক যদি অলিখিত বাণীর অর্থ গ্রহণ ক'রতে না শিখে থাকেন তা'হলে সে দোষ ও দুর্ভাগ্য তাঁদের।'[১৪]

*কালি-কলম*-এ প্রকাশিত এই সংবাদ লোক পরম্পরায় রামানন্দ পর্যন্ত পৌঁছেছিল কিনা বলা মুশকিল। তবে *শনিবারের চিঠি* থেকে 'শরৎচন্দ্র' রচনাটি অনতিবিলম্বে *প্রবাসী*-র ১৩৩৫ পৌষের কষ্টিপাথর অংশে মুদ্রিত হল। তারপরেই *কালি-কলম*-এর জোরালো খোঁচা : 'পৌষ সংখ্যা 'প্রবাসী'র 'কষ্টিপাথরে' হঠাৎ দেখি "শরৎচন্দ্র" নামে একটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত হয়েছে। পরম বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবতে লাগলাম, তবে কি রামানন্দবাবুর মনেও বার্দ্ধক্যোচিত দুর্ব্বলতা স্পর্শ করল! তাড়াতাড়ি শেষ পর্যন্ত উল্টে দেখি "শনিবারের চিঠি" থেকে উদ্ধৃত। পরম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচা গেল। প্রবন্ধটা যে শরৎচন্দ্র ব'লেই উদ্ধৃত হয়নি—"শনিবারের চিঠি"র লেখা হিসাবেই উদ্ধৃত হ'য়েছে— এটা বেশ বোঝা গেল। "Give the devil his due"—এই নীতি অনুসরণে রামানন্দবাবুকে কি আজ পর্য্যন্ত কেউ হারাতে পেরেছে?'[১৫]

নৈতিক কারণেই যে শরৎচন্দ্রের রচনা *প্রবাসী*-তে ছাপা হয় নি সে সাক্ষ্য দিয়েছেন *শনিবারের চিঠি*-র সম্পাদক (এবং একদা *প্রবাসী*-র কর্মী) সজনীকান্ত দাস। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে রামানন্দর মনোভাব সজনীকান্তর জানা ছিল। তিনি পরিষ্কারভাবে লিখেছেন : 'আমাদের পরস্পর ঘনিষ্ঠতা তখন খুবই বাড়িয়াছে। আমরা, অশোক চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ (রামানন্দবাবুর জামাতা) ও আমি ঘনঘন ট্রেনযোগে ও পদব্রজে দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়-পানিত্রাস ভবনে যাতায়াত করিতেছি এবং যে-শরৎচন্দ্রের মূল বাংলা রচনা **একদা নৈতিক কারণে প্রবাসী-পৃষ্ঠায় স্থান পায় নাই,** তাঁহারই গল্পের অশোক চট্টোপাধ্যায়-কৃত ইংরেজি অনুবাদ সাদরে মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় মুদ্রিত করিতেছি। **পিতার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত পুত্র করিতেছেন।**'[১৬]

শরৎচন্দ্রকে রামানন্দ এড়িয়ে থেকেছেন নিজস্ব পন্থায়— উপেক্ষার দ্বারা। লেখক হিসাবে শরৎচন্দ্র বিখ্যাত হতে পারেন, কিন্তু যাঁর লেখা রামানন্দ পড়েন না তাঁর রচনা *প্রবাসী*-তে ছাপা কিংবা তাঁর লেখার বিষয়ে মন্তব্য করা রামানন্দর স্বভাব নয়। তাঁর এই মনোভাব স্পষ্ট ধরা পড়ে শরৎ-প্রয়াণের পর তাঁর লিখিত শোকসংবাদ থেকে। যে রামানন্দ বাংলাদেশের সংস্কৃতিমান মানুষ, নামী-অনামী সাহিত্যিকদের মৃত্যুর পর *প্রবাসী*-র পৃষ্ঠা ভরিয়ে শোকমন্তব্য করেছেন (প্রতিভার সমাদর ছাড়াও ব্যক্তিসম্পর্কের উষ্ণতায় যেগুলি ভরপুর), শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে তাঁর কলমের কালি যেন শুকিয়ে এসেছিল। শরৎ-তিরোধানের পর তিনি সাধারণ ভদ্র কিছু শোকবাক্য উচ্চারণ করেছেন যেখানে ভালবাসার উত্তাপ ছিল না : 'সুপ্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তাঁহার বয়স মোটে ৬২ হইয়াছিল। সুতরাং আরও কয়েক বৎসর বাঁচিয়া থাকিয়া তিনি আরও কিছু গ্রন্থ রচনা করিতে পারিবেন, বাঙালী পাঠকের এই আশা ছিল। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যখন সাহিত্যাচার্য্য উপাধি পান, তাহার পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে অতঃপর তিনি বাঙালী মুসলমান সমাজকে অবলম্বন করিয়া কিছু উপন্যাস লিখিবেন। অনেকের সেইরূপ উপন্যাস দেখিবার আগ্রহ ছিল। তাঁহার ঔপন্যাসিক খ্যাতি যে ইউরোপে পৌঁছিয়াছে, তাহার এগার বৎসর পূর্ব্বে এদেশে জানা ছিল না। সেই সংবাদ প্রথমে মডার্ন রিভিউ ও প্রবাসীতে বাহির হয়।' (বিবিধ প্রসঙ্গ, *প্রবাসী*, ১৩৪৪ ফাল্গুন।) এই লেখায় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর একাধিকবার সাক্ষাতের কথা আছে। কিন্তু সে সবই দূর থেকে শরৎচন্দ্র-দর্শন।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর বছরখানেক পরে দেশবাসীর শোকাবেগ যখন স্তিমিত, রামানন্দ একটু অগ্রসর হয়ে বোঝালেন শরৎ-স্মৃতির প্রতি তিনি উদাসীন নন। তাই শরৎচন্দ্রের 'পাপসাহিত্যের পাপরহস্যগুলি উদ্‌ঘাটন' করার জন্য *প্রবাসী*-র জনৈক পাঠকের প্রস্তাবকে আমল দিতে তিনি অনিচ্ছুক, যে-কাজ ইচ্ছা করলে শরৎচন্দ্রের জীবনকালেই তিনি করতে পারতেন। 'শরৎবাবু যখন জীবিত ছিলেন, তখন তাঁহার কোন কোন বহির প্রতিকূল সমালোচনা আমাদের নিকট আসিয়াছিল। তাহা আমরা ছাপি নাই। ... এখনও প্রতিকূল সমালোচনা ছাপিব না।'

সমকালীনতা সাহিত্যের যথার্থ মূল্য নির্ধারণে কখনো কখনো বাধা সৃষ্টি করে। রামানন্দর সিদ্ধান্ত : 'আমাদের মনে হয়, শরৎবাবুর গ্রন্থগুলির ঠিক্ সমালোচনার সময় এখনও আসে নাই। তাঁহার কোন একখানা বহি সম্বন্ধেও আমাদের কোনও জ্ঞান নাই, এমন নয়। কিন্তু আমরা স্বয়ং তাহার কোন সমালোচনা করিব না, অন্যের সমালোচনাও ছাপিব না।' এ সব বাক্য পড়ে পাছে পাঠকের মনে হয় শরৎ-স্মৃতির উপর রামানন্দ ভদ্রতার পালিশ চড়াচ্ছেন, সে বিষয়ে সতর্ক রামানন্দর মন্তব্য : 'অবশ্য, তিনি কিংবা তাঁহার প্রকাশকেরা তাঁহার কোন বহি সমালোচনার জন্য যদি পাঠাইতেন, তাহা হইলে তাহা সমালোচিত হইত।' (বিবিধ প্রসঙ্গ, *প্রবাসী*, ১৩৪৬ জ্যৈষ্ঠ।)

## ৪ রামানন্দ ও নরেন্দ্র দেব— সম্মুখ সমরে পড়ি ...

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে *প্রবাসী*-র দীর্ঘ নীরবতার মোটামুটি উত্তর দেওয়া গেছে রামানন্দ হয়তো এমন ভেবেছিলেন। কিন্তু কালবৈশাখী অবিলম্বে এসে পড়ল। মেঘনাদের মতো আড়াল থেকে যুদ্ধ নয়— অস্ত্র হাতে রণভূমে আবির্ভূত মানুষটির নাম— নরেন্দ্র দেব।

নরেন্দ্র দেব এবং রাধারানী দেবী বিখ্যাত সাহিত্যিক-দম্পতি। দক্ষিণ কলকাতায় শরৎচন্দ্রের শেষ জীবনের প্রতিবেশী তাঁরা। প্রায় নিত্য সাক্ষাতের সম্পর্ক দাঁড়িয়েছিল। শরৎ-প্রয়াণের পর *সাহিত্যাচার্য্য শরৎচন্দ্র* লিখে নরেন্দ্র দেব যেমন সাহিত্যিক মহলে তোলপাড় ফেলে দিয়েছিলেন, তেমনি সত্তরের দশকে *দেশ* পত্রিকায় শরৎচন্দ্র বিষয়ে ধারাবাহিক লিখে একই কাজ করেছেন রাধারানী (লেখাটি পরে *শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প* নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত)। মনে রাখা দরকার, এঁরা দুজনে রবীন্দ্রনাথেরও স্নেহভাজন ঘনিষ্ঠ ছিলেন। *সাহিত্যাচার্য্য শরৎচন্দ্র* গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে নরেন্দ্র দেব লিখলেন, *প্রবাসী*-র পক্ষ থেকে শরৎচন্দ্রের লেখা চাওয়ার সময় বলা হয়েছিল রচনার চুম্বক অগ্রিম জমা দিতে। তাতে অপমানিত শরৎচন্দ্র *প্রবাসী*-র দপ্তরে লেখা পাঠান নি এবং সে কথা জেনে ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ *প্রবাসী*-তে লিখতে শরৎচন্দ্রকে বারণ করেন।

যে কথা বলে নরেন্দ্র দেব বিতর্কের দরজা হাট করে খুলে দিলেন, তার সূচনা দশ বছরেরও আগে। *কালি-কলম*-সম্পাদক মুরলীধর বসুর অভিযোগ ছিল, *প্রবাসী*-কর্তৃপক্ষ শরৎচন্দ্রের লেখা না-ছাপাই যথেষ্ট ভাবেন নি, পিয়ারসন অনূদিত *মহেশ*-এর মতো 'নিরীহ' 'সুবোধ' 'সুশীল' গল্পটিকেও *মডার্ন রিভিউ*-এর দপ্তর থেকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। (বিচিত্রা, *কালি-কলম*, ১৩৩৩ বৈশাখ।) আশ্চর্যের ব্যাপার এই, কয়েক মাস পরে শরৎ-ভক্তদের জন্য অতিশয় আশার সংবাদ *কালি-কলম*-এই লেখা হয়েছিল— *প্রবাসী*-তে শরৎচন্দ্রের রচনা প্রকাশিত হবার মুখে, 'নর-নারীর নিগূঢ় মর্ম্মকাহিনীর সুকুমার আলোকে 'প্রবাসী'র কলেবর মণ্ডিত করিয়া শরৎচন্দ্র দীর্ঘজীবন লাভ করুন এই আমাদের অন্তরের একান্ত কামনা।' (বিচিত্রা, *কালি-কলম*, মণিবজ্র ভারতী, ১৩৩৩ ফাল্গুন।) অনুমান করতে পারি, বিষয়টি নিয়ে সাহিত্যিক মহলে কানাকানি শুরু হয়েছিল। তবে রামানন্দর সচেতন নীরবতার জন্য আর তা এগোয় নি। কিন্তু এক দশক পরে বিতর্ক উসকে দিলেন নরেন্দ্র দেব। নরেন্দ্র

দেবের অভিযোগ রামানন্দর মাথায় বিপুল সমস্যাভার চাপিয়ে দিয়েছিল। অভিযোগের লক্ষ্য কেবল তিনি একাই নন, তাঁর পরম শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত! অন্তর্গহনে রামানন্দ কতখানি রক্তাক্ত হয়েছিলেন তা ১১ জুলাই ১৯৩৯-এ রবীন্দ্রনাথকে তাঁর লেখা চিঠি থেকে বোঝা যায় : 'কোন বিখ্যাত বা অবিখ্যাত লেখকের লেখা পাইবার আগ্রহ প্রকাশ করা আশ্চর্য্যের বা দোষের বিষয় নহে। কিন্তু আমি শরৎবাবুর লেখা পাইবার জন্য কখনও আগ্রহ প্রকাশ বা চেষ্টা করি নাই। কিন্তু নরেন্দ্রবাবুর বহির ঐ কথাগুলি অবলম্বন করিয়া **আমার উপর আক্রমণ হইয়াছে**। তাহা গত শনিবার রাত্রে দেখিয়া **আমি ক্ষুব্ধ হইয়া** আপনাকে চিঠি লিখিয়াছিলাম। আমার চিঠিতে একটা বাক্য আছে যাহা ঔদ্ধত্য প্রকাশক মনে হইতে পারে, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য অন্য রূপ ছিল। বাক্যটা এইরূপ : 'আমি জানি আমি কখনও আপনাকে এরূপ অনুরোধ করি নাই যে, আপনি শরৎবাবুকে প্রবাসীতে লিখিতে অনুরোধ করুন।' ইহার পর আমার লেখা উচিত ছিল, 'এই কারণে আমার মনে হয় আপনি কখনও তাঁহাকে প্রবাসীতে লিখিতে অনুরোধ করেন নাই।' কিন্তু **মনের চঞ্চল অবস্থায়** তাড়াতাড়িতে তাহা লেখা হয় নাই। এই ত্রুটি মার্জনা করিবেন। আপনি যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রবাসীর প্রতি মমতাবশতঃ তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া থাকেন, তাহা আপনার মহত্ত্ব। কিন্তু এ বিষয়ে আমি কিছু জানি না। এইজন্য, আপনি যাহা জানেন তাহা জানিতে চাহিয়াছি। জানাইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব। এ বিষয়ে প্রবাসীতে কিছু লেখা আবশ্যক মনে করি। কিন্তু আপনার এ বিষয়ে কি মনে আছে না জানিয়া কিছু লেখা উচিত হইতেছে না।'[১১]

অবিলম্বে রবীন্দ্রনাথের উত্তর এসে গেল। রামানন্দ হৃদয়ে বল পেলেন। নরেন্দ্র দেবের কথার প্রতিবাদ এবং সমর্থনে রবীন্দ্রনাথের চিঠি *প্রবাসী*-র ১৩৪৬ শ্রাবণ সংখ্যার 'বিবিধ প্রসঙ্গে' পেশ করলেন। রামানন্দর মত : 'আমি চিঠি লিখিয়া বা মৌখিক শরৎ বাবুকে কস্মিন্‌কালেও 'প্রবাসী'তে লিখিতে অনুরোধ করি নাই। সুতরাং, "তিনি যা লিখবেন তার একটি চুম্বক ক'রে পূর্বাহ্নে" আমাকে পাঠাইতে কখনও বলি নাই।' তাই *প্রবাসী*-তে "শরৎবাবুর উপন্যাস প্রকাশের জন্য আমার আগ্রহ প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথের তাঁহাকে 'প্রবাসী'তে লিখিতে অনুরোধ, শরৎবাবুকে তাঁহার উপন্যাসের চুম্বক পূর্বাহ্ণে আমাকে পাঠাইতে বলা, তাহাতে তাঁহার অপমানিত বোধ করা ও রবীন্দ্রনাথের ক্ষুণ্ণ হওয়া, এবং শরৎবাবুকে রবীন্দ্রনাথের, একবার নয় "বারংবার" 'প্রবাসী'তে লিখিতে নিষেধ করা সৰ্ব্বৈব মিথ্যা।'

আর গভীর দুঃখে রবীন্দ্রনাথ রামানন্দকে লিখেছেন :

> গল্প প্রকাশ করা নিয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে প্রবাসীর দ্বন্দ্ব ঘটেছিল সেই জনশ্রুতির উল্লেখ এই প্রথম আপনার পত্রে জানতে পারলুম। ব্যাপারটা যে সময়কার তখন শরতের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না। অনেক অমূলক খবরের মূল উৎপত্তি আমাকে নিয়ে, এও তার মধ্যে একটি। এই জন্যে মরতে আমার সঙ্কোচ হয়। তখন বাঁধভাঙা বন্যার মতো ঘোলা গুজবের স্রোত প্রবেশ করবে আমার জীবনীতে— আটকাবে কে?

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য উদ্ধার করেই রামানন্দ থামতে পারতেন। কিন্তু থামেন নি। তাঁর বক্তব্যের শেষাংশ ('এই কাল্পনিক ঘটনাবলীর উৎপত্তি সম্বন্ধে আমি কিছু সত্য কথা লিখিতে পারিতাম। কিন্তু লিখিতে গেলে যাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতে হইত, তাঁহারা পরলোকে, সুতরাং তাঁহাদের সহিত মোকাবিলার উপায় নাই।') অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়েছিল। নরেন্দ্র দেব সগর্জনে কলম হাতে আসরে নেমে পড়েছিলেন। সে আঘাত থেকে এমন কি রবীন্দ্রনাথেরও রেহাই ছিল না। রামানন্দর সম্পাদকীয় নিরপেক্ষতা এখানেই যে, প্রতিপক্ষের পুরো কথা ছেপে নিজের শাণিত অস্ত্রে তাকে খণ্ডন করেছেন। নরেন্দ্র দেব -কৃত রবীন্দ্র-অসম্মান তাঁর গায়ে কতখানি বেজেছিল তার পরিচয়ও সেখানে আছে। ('শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও "প্রবাসী" ', আলোচনা, *প্রবাসী*, ১৩৪৬ ভাদ্র।)

নরেন্দ্র দেবের অভিমত এইরকম : 'প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে 'সাহিত্যাচার্য্য শরৎচন্দ্র' গ্রন্থ প্রকাশের পরেই সমালোচনার জন্য প্রবাসীতে পাঠান হয়। যদি সে সময় গ্রন্থটির বর্তমান সমালোচনা রামানন্দ করতেন তাহলে

প্রবাসীর সম্পাদকীয় বিভাগের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক বন্ধুবর চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখনও জীবিত ছিলেন, তিনি এ ব্যাপারে কিছু সত্যের আলোকপাত করিতে পারিতেন। কারণ, প্রবাসীর পক্ষ হইতে লেখার জন্য শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করা এবং রচনার চুম্বক চাওয়া সম্পর্কে আমি শরৎচন্দ্রের নিজ মুখ হইতে যাহা শুনিয়াছিলাম, চারুচন্দ্রের দ্বারা তাহা সমর্থিত হইয়াছিল।' চারুচন্দ্রের জামাতা সমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ টেনে নরেন্দ্র দেব জানিয়েছেন, সমরেন্দ্রনাথ এবং 'চারুচন্দ্রের পুত্র কন্যাও চারুচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছেন যে শরৎচন্দ্রের রচনা প্রবাসীতে প্রকাশের সমস্ত ব্যবস্থাই তিনি করিয়াছিলেন কিন্তু প্রবাসী কর্তৃপক্ষের জন্য তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়।'

নিজ মতে অনড় নরেন্দ্র দেব শরৎ-মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-সহ সেকালের আরো কয়েকজন বিশিষ্ট মানুষকে নিজপক্ষে হাজির করিয়েছেন— গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যাপক সতীশচন্দ্র সিংহ, *মৌচাক* পত্রিকার সম্পাদক সুধীরচন্দ্র সরকার, কবিশেখর কালিদাস রায়, *বিচিত্রা* পত্রিকার সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *বাতায়ন* পত্রিকার সম্পাদক অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল। শরৎচন্দ্রের ভ্রাতা প্রকাশচন্দ্রের কথাও নরেন্দ্র দেব উদ্ধার করেছেন যিনি 'বলেন, প্রবাসীতে লিখিবার জন্য চারুচন্দ্রের আমোল হইতে এই সেদিনও পর্য্যন্ত একাধিকবার দাদাকে অনুরোধ করা হইয়াছিল।' প্রকাশচন্দ্র আরো যোগ করেছেন, 'কয়েক বৎসর পূর্ব্বে [শরৎচন্দ্রের] সামতাবেড়ের বাড়িতে রামানন্দবাবুর পুত্র অশোকবাবু, জামাতা কালিদাস নাগ মহাশয় এবং প্রবাসীর তদানীন্তন এক জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় দাদার নিকট প্রবাসীর জন্য লেখা চাহিতে আসিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল আমাদের উঁহারা প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ কাগজ দুইখানি বিনামূল্যে দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক দাদাকে লিখিত অনেক পত্রই আমাদের সামতাবেড়ের বাড়িতে আছে। আমি একদিন সময়মত সেখানে গিয়া সেগুলি খুঁজিয়া দেখিব। এ সম্পর্কে কবির লিখিত পত্রখানি যদি পাই; আপনাকে পাঠাইয়া দিব।'

প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরীর (যিনি *বঙ্গবাণী* পত্রিকার 'কর্ণধারস্বরূপ' ছিলেন এবং যাঁর 'অক্লান্ত চেষ্টায়' *পথের দাবী বঙ্গবাণী*-তে প্রকাশিত হয়) লিখিত সমর্থনের কথা নরেন্দ্র দেব বলেছেন। কিন্তু প্রসঙ্গ এখানেই শেষ নয়। রবীন্দ্রনাথ এবারে তাঁর লক্ষ্য। *প্রবাসী*-র ১৩৪৬ শ্রাবণের বিবিধ প্রসঙ্গ অংশে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের পত্র বিষয়ে তাঁর প্রশ্ন : 'পূজনীয় কবির চিঠির মধ্যেও একটি লাইনে একটু যেন গোল রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তিনি লিখিয়াছেন, 'ব্যাপারটা যে সময়ের', 'শরতের সঙ্গে তখন আমার আলাপ ছিল না।' কিন্তু ব্যাপারটা কোন্ সময়ের আমার গ্রন্থে তাহার কোথাও কোন উল্লেখ নাই। তাই মনে হয় আপনার পত্র পড়িয়া কবি সম্ভবতঃ কোথাও কিছু বুঝিতে ভুল করিয়া থাকিবেন। কবিকে লিখিত আপনার পত্রখানি এই প্রতিবাদের অন্তর্ভুক্ত থাকিলে এ সমস্যার হয়ত কতকটা সমাধান হইতে পারিত। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে সবিশেষ জানিবার জন্য আমি শীঘ্রই কবির সহিত সাক্ষাৎ করিব।'

এরপর রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে নরেন্দ্র দেবের কটাক্ষ বেশ ধারালো। তিনি লিখেছেন : 'বহুদিন পূর্ব্বের এই এক তুচ্ছ ঘটনা বহুকার্যে-ব্যাপৃত কবির স্মৃতি হইতে অপসৃত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।' তাঁর ইঙ্গিত— রবীন্দ্রনাথ ব্যাপারটিকে তুচ্ছ মনে করে ভুলে যেতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যরসপিপাসু অগণিত মানুষ এবং শরৎ-ভক্তদের কাছে তা আদৌ তুচ্ছ নয়। তবে নরেন্দ্র দেবের দৃঢ়তার পরিচয়ও এখানে পেয়েছি যখন তিনি লিখেছেন যদি ব্যাপারটি সত্য না হয় তাহলে *সাহিত্যাচার্য্য শরৎচন্দ্র গ্রন্থের পরবর্তী* সংস্করণে তা বাদ দেওয়া হবে। রামানন্দকে কার্যত ডুয়েট লড়ার আহবান জানিয়ে নরেন্দ্র দেব তাঁর বক্তব্য শেষ করেছিলেন : 'আপনার বক্তব্যের মধ্যে দেখিলাম আপনি এ সম্বন্ধে কিছু সত্য পরিজ্ঞাত আছেন এরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ পরলোকগত বলিয়া তাহা বলিতে বিরত হইয়াছেন। আমার মনে হয় আপনার এ-যুক্তি ঐতিহাসিক ও জীবনীকারগণের সত্যসন্ধানে বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উহা প্রকাশ করিয়া বলাই বোধ হয় সঙ্গত।'

নরেন্দ্র দেবের শরাঘাত রামানন্দর আত্মমর্যাদায় যথেষ্ট আঘাত করেছিল। প্রত্যুত্তরে তিনিও অগ্রসর। জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের চিঠির ঐ অংশটি ('ব্যাপারটি যে সময়কার তখন শরতের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না') *প্রবাসী*-তে না ছাপানোর কথাই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর সেক্রেটারি অনিল চন্দের একাধিক পত্র যখন রামানন্দর হস্তগত হয় তার আগেই ১৩৪৬ শ্রাবণের *প্রবাসী* প্রকাশিত হয়ে গেছে। 'এক্ষণে রবীন্দ্রনাথের সেই আদেশের উল্লেখ করিলাম।' রামানন্দ লিখলেন, নরেন্দ্র দেবের প্রতিবাদ পত্রে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ থাকায় তাঁর অনুমতি নিয়ে পত্রটি তিনি ছেপেছেন, 'নতুবা তাঁহার নাম এরূপ ব্যাপারে আমি জড়িত হইতে দিতাম না।'

লক্ষণীয়, নরেন্দ্র দেবের প্রতিটি বক্তব্যের যথোচিত উত্তর দেবার চেষ্টা রামানন্দ করেছেন। যেমন, *সাহিত্যাচার্য্য শরৎচন্দ্র* গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের কোনো গ্রন্থ তিনি পান নি এবং 'প্রবাসীর সহকারী সম্পাদক মহাশয়েরা আমাকে জানাইয়াছেন যে, ঐ বহি তাঁহাদিগকে কেহ দিয়াছিলেন বা তাঁহারা উহা দেখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের মনে পড়ে না। নরেন্দ্রবাবুর পুস্তকের আলোচ্য প্যারাগ্রাফটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হইবার পর আমি উহার দ্বিতীয় সংস্করণের একখানি বই কিনাইয়া আনাইয়াছিলাম।'

স্পষ্ট ভাষায় রামানন্দ বলেছেন চারু বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রকে *প্রবাসী*-তে লেখার জন্য কখনো অনুরোধ করেছিলেন কিনা সে বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। অন্তত সম্পাদক হিসাবে সে কাজ তিনি করেন নি। তাছাড়া 'চারুবাবু' 'যথেষ্ট সৌজন্য ও শিষ্টাচারসম্মত' ব্যক্তি। কাউকে লিখতে অনুরোধ করে তাঁকেই আবার 'চুম্বক' পাঠাতে বলার মতো অশিষ্ট আচরণ করবেন— এটি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। বিদ্রূপের ঠোঁট বেঁকিয়ে রামানন্দ লিখলেন, দ্য মডার্ন রিভিউ-তে যে-কর্তৃপক্ষ *বিন্দুর ছেলে*-র অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন, সেই একই কর্তৃপক্ষ চারুবাবুর মধ্যস্থতায় *প্রবাসী*-তে শরৎচন্দ্রের রচনা প্রকাশের 'সমস্ত ব্যবস্থা' হওয়া সত্ত্বেও তা বাতিল করে দিলেন— এটিও কি বিশ্বাসযোগ্য? একই কর্তৃপক্ষ *পথের দাবী* বাজেয়াপ্ত হবার পর *মডার্ন রিভিউ*-তে সম্পাদকীয় লিখে প্রতিবাদ করেছিলেন যার মধ্যে এই তথ্য ছিল, জেনিভায় ফরাসী মনীষী রোঁমা রোঁলার সঙ্গে রামানন্দর আলাপচারিতায় শরৎপ্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়। রামানন্দ লিখেছেন, 'ফরাসী মনীষীর সহিত আমার কথোপকথনের এই অংশ জেনিভা হইতে প্রেরিত ও ১৩৩৪ সালের জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে প্রকাশিত সম্পাদকের চিঠিতেও বাহির হইয়াছিল সেই প্রসিদ্ধ বিদেশীর কাছে শরৎবাবুর কোন গ্রন্থের এই আদরের কথা ইহার আগে বঙ্গে বোধ হয় কেহ জানিত না।'

রামানন্দ তাঁর প্রতিবাদপত্রে বারবার একটা কথাই বলতে চেয়েছেন : 'কোন লোকের কাছে লেখা চাওয়া দোষের বা লজ্জার বিষয় নহে। আমি শরৎবাবুর কাছে লেখা চাহিয়া থাকিলে তাহা অস্বীকার করিতাম না।' শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়িতে যাবার আগে তাঁর পুত্র বা জামাতা তাঁকে জানান নি অথবা লেখার জন্য তাঁর অনুরোধ বহন করেও তাঁরা শরৎচন্দ্রের কাছে যান নি। নরেন্দ্র দেবের ভঙ্গিতে রামানন্দও জামাতা কালিদাস নাগকে সাক্ষী মেনেছেন যিনি 'আমাকে ইহাও জানাইয়াছেন যে প্রবাসীতে লেখা দেওয়া না-দেওয়া সম্বন্ধে তাঁহার সহিত সাহিত্যাচার্য্য শরৎচন্দ্রের কোন কথাই হয় নাই।' রামানন্দর মনোবেদনা এতদূর হয়েছিল যে নিজেকে 'আসামী' পর্যন্ত ভাবতে বাধ্য হয়েছিলেন যার 'কথা নির্ভরযোগ্য না হওয়াই বোধ করি আইনসঙ্গত।'

কিন্তু তাঁর সর্বাধিক যন্ত্রণা এই যে, উক্ত বিতর্কে রবীন্দ্রনাথের নাম যুক্ত হয়ে যাওয়া। তাঁর মর্মস্পর্শী ভাষা : 'আমার পক্ষে ইহা অত্যন্ত ক্ষোভ ও লজ্জার বিষয় যে এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের বিস্মৃতি অনুমান করিয়া, তাঁহার কথা নির্ভরযোগ্য নহে, কার্য্যতঃ ইহাই বলা হইতেছে— যদিও তিনি এখনও নিজের জীবনের বহু কথা বলিতেছেন এবং জড়বিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ বহি লিখিতেছেন। ভুলিয়া যাওয়া সকলের পক্ষেই সম্ভব, কিন্তু বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই তাহা সম্ভব অথবা নিশ্চিত— নরেন্দ্রবাবু সম্ভবতঃ ইহা বলিবেন না; কিন্তু তাঁহার প্রতিবাদ পড়িলে এরূপ ধারণা হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না।'

রামানন্দর ক্লান্ত কণ্ঠস্বর : 'রবীন্দ্রনাথকে এই উপলক্ষ্যে কিছু বলা অনাবশ্যক। তিনি জানেন, ইহা গণতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী যুগ। এখন পাটীগণিতের প্রাধান্য যতটা স্বীকৃত হয়, কোন বৈরক্তিক বৈশিষ্ট্য ও অসাম্য সেরূপ স্বীকৃত হয় না।' রবীন্দ্রনাথের আরো একটি চিঠি রামানন্দ তাঁর কথার শেষে ছাপলেন। সেখানে রবীন্দ্রনাথ তীক্ষ্ণ ভাষায় বলেছেন : 'শরৎ কখনো কোনো বিষয়েই আমার পরামর্শ চান নি, আমিও তাঁকে উপদেশ দিই নি।'

না, শরৎ-রামানন্দ প্রসঙ্গের ইতি এখানেই টানা যাবে না। শরৎচন্দ্রের বিশেষ একটি রচনা সম্পর্কে তাঁর মমতামেদুরতা ছিল। বইটি *পথের দাবী*। রামানন্দর প্রখর স্বাজাত্যবোধ এই বইটির স্বদেশভাবনার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর নানা বিষয়ে মতভেদ থাকলেও বাজেয়াপ্ত বইটি পড়ে *মডার্ন রিভিউ* পত্রিকায় ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী কুৎসিত মনোভাব প্রকাশের আগ্রহ তাঁর ছিল। তাই সজনীকান্ত দাসকে তিনি শরৎচন্দ্রের কাছে পাঠিয়েছিলেন বাজেয়াপ্ত বইটির এক কপি সংগ্রহের জন্য।[১৮] তারপর ফেব্রুয়ারি ১৯২৭-এর *মডার্ন রিভিউ* পত্রিকায় তিনি লেখেন, সুইট্জারল্যান্ডে ফরাসী মনীষী-লেখক রোঁমা রোঁলার সঙ্গে আলাপচারিতায় *পথের দাবী*-র প্রসঙ্গ ওঠে; '... রোমা রোঁলা আমাদের বলেছিলেন যে, তিনি শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের ইংরেজি অনুবাদের ইতালিয় অনুবাদ পড়েছেন; তার থেকে তাঁর মনে হয়েছে, এই লেখক প্রথম শ্রেণীর শিল্পী। ... কিন্তু বাংলা সরকারের কিছু কর্তাব্যক্তি শরৎচন্দ্রের একটি উপন্যাসে রাজদ্রোহের গন্ধ পেয়েছেন। সুতরাং এটি এমন বই যা সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক। নাকি এটি আমলাতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক?'

১৩৩৫ শ্রাবণের *প্রবাসী*-তে রামানন্দ পুনশ্চ *পথের দাবী*-র প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। বঙ্গীয় শাসন রিপোর্টে উক্ত গ্রন্থ বিষয়ে লেখা হয়েছিল : 'The most popular novelist, Babu Sarat Chandra Chatterjee, found a new vent for his morbid sentimentalism in a bitterly virulent attack on the alleged land-grabbing propensities of the European powers and the suspected political aims of the various Christian missions in Asia.' রামানন্দর কলমে এর প্রতিবাদ ধারালো : 'ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের অন্য জাতির ভূমি দখল করিবার প্রবৃত্তি অতি সত্য কথা, ইহা মিথ্যা আরোপিত ('alleged') দোষ নহে। ইতিহাস ইহার সাক্ষী। ... খ্রীস্টিয়ান মিশন সম্বন্ধে শরৎবাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তিনি প্রথম বলেন নাই ; বাইবেল, বোতলের ও ব্যাটেলিয়নের পরে পরে আবির্ভাব সম্বন্ধে ইংরেজিতেই উক্তি আছে।'

এর ঠিক আগে শিলচরের সুরমা সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে *পথের দাবী*-র বাজেয়াপ্তির বিরুদ্ধে প্রস্তাব রামানন্দ উত্থাপিত হতে দেন নি। তাঁর যুক্তি ছিল— সম্মেলনটি রাজনৈতিক নয়, সাহিত্যিক। নানা রাজনৈতিক মতের লোকেরা এই সম্মেলনের সভ্য, সরকারি কর্মচারীরাও। 'সাহিত্যিক সম্মেলনে রাজনীতি ঢুকাইলে তাহা হইতে সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে পরোক্ষভাবে কার্য্যত তাড়াইয়া দেওয়া হয়। তাহাতে লাভ নাই, ক্ষতি আছে।' (সুরমা সাহিত্য-সম্মেলনে পথের দাবী, বিবিধ প্রসঙ্গ, *প্রবাসী*, চৈত্র ১৩৩৪।)

অল্পদিন পরে রামানন্দ তাঁর ভ্রম সংশোধন করে *প্রবাসী*-তে লিখলেন : '... শিলচরে সুরমা সাহিত্য সম্মিলনীতে যে-রাজনৈতিক প্রস্তাবটি আলোচনা হইতে দিই নাই, তাহার বিষয় মনে পড়িল। মনে হইল, সাহিত্য বিষয়ক সভাতে রাজনৈতিক কোন প্রস্তাবের আলোচনা সাধারণত অযৌক্তিক ও অনাবশ্যক বটে, কিন্তু রাজনীতি যদি সাহিত্যকে আঘাত করে, তাহা হইলে তাহার প্রতিবাদ করার অধিকার সাহিত্যের অবশ্যই থাকা উচিত। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী' রাজনৈতিক বহি বটে কিনা জানি না, তাহা আলোচনারও প্রয়োজন নাই, কিন্তু গভর্ণমেন্ট কর্তৃক উহা রাজনৈতিক কারণেই বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। এবং বিনা প্রকাশ্য বিচারে উহা বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। সাহিত্যের উপর গভর্ণমেন্টের এই অবিচারিত আক্রমণের প্রতিবাদ সাহিত্যসভার পক্ষ হইতে হওয়া সঙ্গত। আমি যখন সুরমা সাহিত্য সম্মিলনীতে প্রস্তাবটি আলোচনা হইতে দিই নাই, তখন এই যুক্তি আমার মনে উদিত হয় নাই। ... এখন যে যুক্তির উল্লেখ করিলাম, তখন তাহা মনে আসিলে এই মীমাংসা করিতাম যে, প্রতিবাদটির আলোচনা সম্মিলনীর সভায় হইতে পারিবে। ... এখন আমি যেরূপ বুঝিতেছি

তাহাতে আমার ভ্রম হইয়াছে মনে হইতেছে। তাহার প্রতিকার করার সাধ্য আমার নাই, কিন্তু কর্ত্তব্যবোধে আমার বর্ত্তমান মত প্রকাশ করিলাম।' (বিবিধ প্রসঙ্গ, *প্রবাসী*, ১৩৩৫ আষাঢ়।)[১১]

শরৎপ্রসঙ্গে রামানন্দ-নরেন্দ্র দেব বিতর্কের এখানেই পরিসমাপ্তি। রামানন্দ জানিয়েছিলেন, *প্রবাসী*-র নিয়ম অনুসারে এ বিষয়ে আর কোনো বাদপ্রতিবাদ *প্রবাসী*-তে ছাপা হইবে না।

সাহিত্যজগতে মাঝে মাঝে এমন কিছু সমস্যা তৈরি হয় যার মীমাংসাসূত্র নেই। শরৎচন্দ্রের কাছে *প্রবাসী*-র পক্ষ থেকে শর্তসাপেক্ষে রামানন্দর লেখা চাওয়া এবং সেই অপমান শরৎচন্দ্রের মতো রবীন্দ্রনাথেরও গায়ে বাজা তেমনি একটি ঘটনা যার সত্যতা নির্ধারণ সেকালে হয় নি, একালে প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিতর্কের মূল্য এখানেই যে, শরৎচন্দ্র বিতর্কের কেন্দ্রস্থলে, আর রবীন্দ্রনাথ বিবদমান দুই পক্ষেরই সাক্ষী হয়ে গিয়েছিলেন। সাহিত্যবিতর্কের প্রেক্ষায় এ এক মণিকাঞ্চন যোগ। আমরা এটুকু বলতে পারি সাহিত্যিকের কলম যেমন কালজয়ী তাঁকে ঘিরে রচিত বিতর্ক তেমনি কাল থেকে কালান্তরে যাত্রা করে। ফলে রচিত হয় সাহিত্যের নতুন ইতিহাস।

প্রসঙ্গ-নির্দেশ

১. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদক-জীবনের সূচনার ইতিহাস যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন (*রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়*, যোগেশচন্দ্র বাগল, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ পৌষ ১৩৭১, পৃ. ৩১-৩২ দ্রষ্টব্য। অতঃপর গ্রন্থটি 'যোগেশচন্দ্র' নামে অভিহিত হবে)।

২. বাঁকুড়া জেলা স্কুলে পড়বার সময় রামানন্দ অঙ্কের শিক্ষক কেদারনাথ কুলভীর দ্বারা প্রভাবিত হন। কেদারনাথ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন। তাঁর চরিত্র ও শিক্ষাগুণে আকৃষ্ট রামানন্দ স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনায় যোগ দিতেন। তবে কেদারনাথের উদারতাও ছিল। তিনি ছাত্রদের সাধু-সন্তদের আদর্শ জীবনের কথা শোনাতেন যাঁদের মধ্যে রামকৃষ্ণ পরমহংস আছেন। (যোগেশচন্দ্র, পৃ. ১৫-১৬।)

৩. *প্রদীপ* পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের রচনা ছাড়াও শিবনাথ শাস্ত্রী, স্বর্ণকুমারী দেবী, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, দীনেশচন্দ্র সেন, জলধর সেন, দীনেন্দ্রকুমার রায়, সখারাম গণেশ দেউস্কর, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখের লেখা প্রকাশিত হত। এ প্রসঙ্গে যোগেশচন্দ্র লিখেছেন, রামানন্দ 'প্রতিটি লেখা নিজে দেখিয়া প্রয়োজন হইলে সংস্কার ও সংশোধন করিয়া তবে প্রেসে দিতেন। কখনও কখনও পাণ্ডুলিপি লেখকদের নিকট ফেরত পাঠাইতেন, যথাস্থানে কোন কোন বিষয় সংযোজনের নিমিত্ত।' (যোগেশচন্দ্র, পৃ. ৭৭।)
*প্রদীপ* পত্রিকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে রবীন্দ্রনাথ রামানন্দকে চিঠিতে লেখেন : 'আমি ইতিপূর্ব্বেই প্রদীপের সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণতা লইয়া অভিনন্দনজ্ঞাপন পূর্ব্বক আপনাকে পত্র লিখিব স্থির করিয়াছিলাম। উহার প্রত্যেক গদ্য প্রবন্ধই সুপাঠ্য হইয়াছে। ... সর্ব্বশুদ্ধ বলিতে পারি ... প্রদীপের মত এমন একখণ্ড বাংলা সাময়িক পত্র ইতিপূর্ব্বে আমার হস্তগত হয় নাই।' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, দ্বাদশ খণ্ড বিশ্বভারতী, ২৫ বৈশাখ ১৩৯৩, পৃ. ১। অতঃপর *চিঠিপত্র*।)

৪. রবীন্দ্রনাথ-রামানন্দর সম্পর্ক বিষয়ে শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও প্রবাসী' রচনাটি দ্রষ্টব্য (*দেশ* সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৯৭)। *প্রবাসী*-সম্পাদকের বন্ধুত্বকে রবীন্দ্রনাথ কী পরিমাণ মূল্য দিতেন তা তিনি স্বয়ং লিখিতভাবে স্বীকার করেছেন। তাঁর সেই কথা অবশ্য উদ্ধারযোগ্য : 'প্রবাসী-সম্পাদক সর্বদা তাঁর লেখার দ্বারা, নিজের দ্বারা, পরামর্শ দ্বারা মমত্বের বহুবিধ পরিচয়ের দ্বারা বিশ্বভারতীর যথেষ্ট আনুকূল্য করেছেন। আমি নিশ্চিত জানি সেই আনুকূল্য দ্বারা তিনি আমার এই অতিভারপীড়িত আয়ুকেই রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন। দুঃসাধ্য কর্ত্তব্যভারে অর্থদানের চেয়েও সঙ্গদান, প্রীতিদান অনেক সময়ে বেশি মূল্যবান। সুদীর্ঘকাল আমার ব্রতযাপনে আমি কেবল যে অর্থহীন ছিলেম তা নয়, সঙ্গহীন ছিলেম; ভিতরে বাহিরে বিরুদ্ধতা ও অভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ একা সংগ্রাম করে এসেছি। এমন অবস্থায় যাঁরা আমার এই দুর্গম পথে ক্ষণে ক্ষণে

আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁরা আমার রক্তসম্পর্কগত আত্মীয়ের চেয়ে কম আত্মীয় নন, বরঞ্চ বেশি। বস্তুত আমার জীবনের লক্ষ্যকে সাহায্য করার সঙ্গে সঙ্গেই আমার দৈহিক জীবনকেও সেই পরিমাণে আশ্রয় দান করেছেন। সেই আমার স্বল্পসংখ্যক কর্ম্মসুহৃদের মধ্যে প্রবাসী সম্পাদক অন্যতম। আজ আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।' (*সবুজপত্র*, ১৩৩৩ আশ্বিন, পৃ. ৬-৭; আকর : *চিঠিপত্র*, পৃ. ৪৪৫-৪৬।)

৫. রবীন্দ্র-রামানন্দর ব্যক্তিক সম্পর্কের বিষয়ে কয়েকটি তথ্য হাজির করা যায়। যেমন, কনিষ্ঠ পুত্র মুলু বা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় আশ্রয়-বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। সেকারণে ১৯১৭-১৯ পর্যন্ত রামানন্দ সপরিবারে শান্তিনিকেতনবাসী। পরে রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছানুসারে ১৯২৫-এর জুলাই থেকে নব-প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাভবনের অবৈতনিক অধ্যক্ষ পদে রামানন্দ যোগ দেন। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আরোপিত নিয়মকানুন তিনি স্বীকার করতে না পারায় ওই পদ ত্যাগ করেন। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে লেখা রামানন্দর দুটি চিঠি দ্রষ্টব্য (*চিঠিপত্র*, পৃ. ৩৬৩-৬৫)। যোগেশচন্দ্র বাগল জানিয়েছেন সিটি কলেজের ছাত্রসংগঠন 'ছাত্রসমাজ' ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক রামানন্দর মাধ্যমেই হয়েছিল (যোগেশচন্দ্র, পৃ. ১৩২-৩৩)। রামানন্দর পুত্র মুলুর মৃত্যুর পর শোকাহত রবীন্দ্রনাথ রামানন্দকে একাধিক শোকজ্ঞাপক পত্র লেখেন। একটি পত্র রামানন্দ-কন্যা সীতা দেবীকেও লিখিত। আর মুলুর শ্রাদ্ধবাসরে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতাটি গভীর বেদনায় পূর্ণ। এই সমস্ত তথ্য থেকে বোঝা যায় কেবল রামানন্দ নন, তাঁর সমগ্র পরিবারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্নেহসম্পর্ক ছিল।

৬. 'রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও প্রবাসী', শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *দেশ* সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৯৭ দ্রষ্টব্য।

৭. ব্যক্তি-শরৎচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কোন্ আগ্রহ ছিল তা রাধারানী দেবী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন (*শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প*, রাধারানী দেবী, আনন্দ পাবলিশার্স, অক্টোবর ১৯৭৬, পৃ. ১৬৮, ১৭১-৭২।)

৮. অমল হোমকে লেখা শরৎচন্দ্রের চিঠি, গোপালচন্দ্র রায় সম্পাদিত *শরৎচন্দ্র* (৩য় খণ্ড), সাহিত্যসদন, ১৩৬৯, পৃ. ২৭৫। অতঃপর 'গোপালচন্দ্র'।

৯. গোপালচন্দ্র, পৃ. ৩১৭-১৮। শরৎচন্দ্র নিজেই একটি চিঠিতে লিখেছেন কেন তিনি শান্তিনিকেতনে যান নি : 'আমার ধারণা ছিল তিনি [রবীন্দ্রনাথ] আমার প্রতি বিরক্ত, তাই ১লা বৈশাখে বোলপুর যাবার জন্যে আমাকে তুমি অনুরোধ করলেও আমি যাই নি।' (ঐ, পৃ. ৩১৫।)

১০. 'শরৎ-রবি', অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সংকলিত, শারদীয় *দেশ* ১৩৮২, পৃ. ৪৭।

১১. যোগেশচন্দ্র, পৃ. ২৭-২৯।

১২. ব্রাহ্মবিরোধী কিছু কথা লেখার জন্য শরৎচন্দ্র রামানন্দর পছন্দের মানুষ ছিলেন না— এমন কথা রামানন্দ সরাসরি না বললেও আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়েছেন। *প্রবাসী*, ১৩৪৬ জ্যৈষ্ঠের বিবিধ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন : 'শরৎবাবু যখন জীবিত ছিলে, তখন তাঁহার কোন কোন বহির প্রতিকূল সমালোচনা আমাদের নিকট আসিয়াছিল। তাহা আমরা ছাপি নাই। ছাপিলে, আমরা সাম্প্রদায়িক বা ব্যক্তিগত কারণে তাঁহার নিন্দা রটাইতেছি, এই অপবাদ রটিত ...।' রামানন্দর এই কথা থেকে পরিষ্কার শরৎচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর এই মনোভাব নানা মহলে চলিত ছিল।

১৩. ব্রাহ্মচরিত্র চিত্রণে তিনি পক্ষপাতদুষ্ট নন, এ কথা প্রমাণে শরৎচন্দ্র সচেষ্ট ছিলেন। *দত্তা*-র রাসবিহারী যেমন স্বার্থান্বেষী, ঘোর বিষয়ী ভণ্ড মানুষ, তাঁর উল্টোদিকে আছেন *পরিণীতা*-র গিরীন, *পথনির্দেশ*-এর গুণীন্দ্র— এঁরা উদার মহৎ মানুষ। মধ্যভাগে আছেন ভালোমন্দয় জড়ানো *গৃহদাহ*-র কেদারবাবু। *দত্তা*-র উগ্র ব্রাহ্ম বিলাসবিহারীর মধ্যে অবশ্যই ভণ্ডামি ছিল না। গ্রামে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর আকুলতা আন্তরিক। সত্যকার ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্ম-আচার্যের চরিত্র দয়ালের মধ্যে দেখা যায়। তাঁর ধর্মবোধে সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। তুলনায় নারী চরিত্র অন্য মাত্রার। *দত্তা*-র বিজয়ার মধ্যে ব্রাহ্মনারীর বিশেষ লক্ষণ চোখে পড়ে না। *গৃহদাহ*-কে আদ্যোপান্ত মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস করে তোলায় শরৎচন্দ্রের আগ্রহ ছিল বলে এই উপন্যাসের নায়িকা অচলা মানবমনের অবদমিত আকাঙ্ক্ষার মূর্ত রূপ।

১৪. 'আর্টের আটচালা', *কালি-কলম*, বিরূপাক্ষ শর্মা, ১৩৩৫ কার্ত্তিক। বিরূপাক্ষ শর্মা পত্রিকা-সম্পাদক মুরলীধর বসুর ছদ্মনাম।

১৫. ওই, ১৩৩৫ পৌষ।

১৬. *আত্মস্মৃতি* (প্রথম খণ্ড), সজনীকান্ত দাস, ডি এম লাইব্রেরি, অগ্রহায়ণ ১৩১৬, পৃ. ২৪৯-৫০।

১৭. রবীন্দ্রনাথকে লেখা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের চিঠি, *চিঠিপত্র*, পৃ. ৪০৭-০৯।

১৮. বাজেয়াপ্ত *পথের দাবী*-র একটি কপি সংগ্রহের জন্য রামানন্দ সজনীকান্ত দাসকে শরৎচন্দ্রের কাছে পাঠান। সজনীকান্তকে শরৎচন্দ্র উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে পুনরায় পাঠিয়েছিলেন একটি পত্রসহ। পত্রটি পড়ে বোঝা যায় বাজেয়াপ্ত গ্রন্থটি প্রকাশ্যে নিঃশেষিত হলেও প্রয়োজনে দু-এক কপি গুপ্ত ভাণ্ডার থেকে বেরিয়ে আসে। শরৎচন্দ্র উমাপ্রসাদকে লিখেছেন : 'সজনীবাবু আমার চিঠি নিয়ে তোমার কাছে যাচ্ছেন একখানা বই পাবার আশায়। শ্রীযুক্ত রামানন্দবাবু বইখানা পড়তে চান মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় ভালো করে দেবার জন্যে। যাই হোক যদি পারো দিও।' (গোপালচন্দ্র, পৃ. ৪১৪।) শরৎচন্দ্র অবশ্য আইন বাঁচিয়ে চিঠির মধ্যে কোথাও *পথের দাবী* কথাটি উল্লেখ করেন নি।

১৯. সুরমা সাহিত্য সম্মেলনে *পথের দাবী*-র বাজেয়াপ্তির বিরুদ্ধে প্রস্তাব উত্থাপিত করতে না দেওয়ার ত্রুটি শুধরে নেওয়ার পরেও রামানন্দ *ধূপছায়া* পত্রিকার দ্বারা ভর্ৎসিত হন। শ্রীগ্রহাচার্য নামক লেখকের হুলবিদ্ধ মন্তব্য : 'শরৎবাবুর কোনও রচনা প্রবাসী-তে স্থান পাবার যোগ্যতা না পাক, তাঁর কোনও পুস্তকের অথবা প্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনাও প্রবাসীতে প্রকাশিত না হোক, এমন কি প্রবাসীর দলের কেহই তাঁহার পথের দাবী বা অন্য কোনও লেখা কষ্ট করে পড়ে তাঁকে কৃতার্থ না করলেও রামানন্দবাবুরই কলম থেকে এই আলোচনা এবং ভ্রম সংশোধনের ফলে তাঁর [শরৎচন্দ্রের] নামটা অন্ততঃ বার চার পাঁচ ছাপা হয়ে গেল—[শরৎ-] জন্মের সুফল বুঝতে হবে।—অন্ততঃ প্রবাসীর পাঠকেরা এটুকু জানলেন যে শরৎবাবু বলে একজন লেখক আছেন, তিনি বই লেখেন, এবং পথের দাবীটা তাঁরই লেখা।' ('ঘরে বাইরে', *ধূপছায়া*, শ্রীগ্রহাচার্য, ১৩৩৫ আষাঢ়।)

# রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে প্রকৃতি

## সুতপা ভট্টাচার্য

'তুমি জড় প্রকৃতি! তোমায় কোটি কোটি প্রণাম!'—এই বাক্য দিয়ে শুরু করে দীর্ঘ একটি প্রকৃতি-স্তুতি রচনা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, *চন্দ্রশেখর* উপন্যাসের একটি অধ্যায়ের মাঝখানে। বহিঃপ্রকৃতিকে জড় বলে ধারণা করেছিলেন পশ্চিমি যুক্তিবাদী তথা বস্তুবাদীরা। প্রকৃতির নিয়মতন্ত্রে এঁরা কোনো নৈতিক কিংবা আধ্যাত্মিক তাৎপর্য সন্ধান করেন নি। অন্যদিকে, পশ্চিমি ভাববাদীরা প্রকৃতিকে জড় বলে মানতে রাজি ছিলেন না, অধ্যাত্ম-চেতনার সঙ্গে সম্পর্কিত করেই তাঁরা প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। এঁদের মতে প্রকৃতি শুধু মানুষের বহির্জগৎ নিয়ন্ত্রিত করছে তাই নয়, মানুষের অন্তর্জগৎকেও অবিরত প্রভাবিত করে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ সেভাবেই দেখেছিলেন প্রকৃতিকে। ব্যক্তিগত জীবনে প্রকৃতি তাঁকে কীভাবে নন্দিত করেছে, তার অজস্র নির্দশন ছড়িয়ে রয়েছে *ছিন্নপত্রাবলী*-তে। সে আনন্দ রূপ নিয়েছে তাঁর সৃষ্টিতে। গান, কবিতা, ছবি— সবকিছুতেই রয়েছে তার নিদর্শন। স্বভাবতই, সে নিদর্শন বিরল নয় তাঁর উপন্যাসেও।

তরুণ রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসকে আশ্রয় করেই রচনা করেছিলেন প্রথম দুটি উপন্যাস, সেকালের অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের মতোই। কিন্তু সূচনাপর্ব থেকেই তিনি স্বতন্ত্র। তাঁর স্বাতন্ত্র্য যে যে দিক থেকে, তার মধ্যে প্রধান হল প্রকৃতির ব্যবহার। *শকুন্তলা* নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'কালিদাস তাঁহার নাটকে যে বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাকে বাহিরে ফেলিয়া রাখেন নাই, তাহাকে শকুন্তলার চরিত্রের মধ্যে উন্মেষিত করিয়া তুলিয়াছেন।' তাঁর নিজের উপন্যাসেও এমনভাবেই বহিঃপ্রকৃতিকে নিছক বাইরে রাখা হয় নি, নিছক পটভূমি করে রাখা হয় নি, চরিত্রের সঙ্গে প্রকৃতির সংযোগসাধন করা হয়েছে।

*বউ-ঠাকুরাণীর হাট* (১৮৮৩) উপন্যাসের পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে দীর্ঘ একটি প্রকৃতি-বর্ণনা আছে, যার প্রথম অংশ শুধুই পটভূমি বর্ণনা, শুধুই 'আঁধারের উপর আঁধার' ঘনানোর কথা, দিগন্ত থেকে দিগন্ত আচ্ছন্ন হবার কথা। কিন্তু তারপর, যখন অন্ধকার একটি মূর্তি ধারণ করে, তখন তা আর পটভূমির বিষয় থাকে না, তাকে পুরোভূমিতেই স্থাপিত হতে দেখি : 'ঠিক মনে হইতে লাগিল যেন সহস্র দীর্ঘ পায়ের উপর ভর দিয়া একটা প্রকাণ্ড বিস্তৃত নিস্তব্ধ অন্ধকার দাঁড়াইয়া আছে।' সে অন্ধকার ক্রমে 'চরিত্রের মধ্যে উন্মেষিত' হয়ে ওঠে : 'যতই আঁধার বাড়িতেছে ততই তাহার মনে হইতেছে যেন পৃথিবীকে কে তাহার কাছ হইতে কাড়িয়া লইতেছে ... অতলস্পর্শ অন্ধকারের সমুদ্রের মধ্যে সে পড়িয়া গিয়াছে।' তখন সেই চরাচরব্যাপী অন্ধকার আর শুধুই বাইরের প্রকৃতিতে থাকে না, সে যেন হয়ে ওঠে বিভার অদৃষ্টলিপি। বিভা, এ উপন্যাসের ক্ষমতার হাতে মার-খাওয়া একটি চরিত্র, সেই বায়ুহীন শব্দহীন দিনরাত্রিহীন জনশূন্য তারাশূন্য দিগদিগন্তশূন্য মহান্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে চারিদিক থেকে কান্না শুনতে পায়, শুনতে পায় বাতাসের হূ হূ শব্দ।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র, ক্ষমতাচাপে পিষ্ট, বেদনার্ত উদয়াদিত্য, কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে যখন বসন্ত রায়ের আশ্রয়ে ছিলেন, তখন প্রকৃতির শুশ্রূষা যেন তাঁকে নবজীবন দান করছিল, অনেকদিন পর গাছপালা, আকাশ, ভোরের আলো, রাতের আকাশের তারা দেখছিলেন তিনি, শুনছিলেন পাখির গান, সর্বাঙ্গে পাচ্ছিলেন

উদ্বেল অরণ্য। রামকিঙ্কর বেইজ

বাতাসের স্পর্শ, জ্যোৎস্না-প্রবাহে ডুবে যেতে পারছিলেন। প্রকৃতি এখানে দাতার ভূমিকায়, গ্রহীতা মানুষ। উদয়াদিত্য তাঁর পিতা প্রতাপদিত্যের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে, ক্ষমতাচাপ থেকে মুক্তি পেয়েই চরিতার্থ হয়েছিলেন। উপন্যাসের আখ্যান জুড়ে কত-না ষড়যন্ত্র, কত-না ক্ষমতার চোখ-রাঙানির দৃশ্য! কিন্তু এক ক্ষমতার জয় অন্য ক্ষমতার পরাজয় দেখানো হয় নি এ উপন্যাসে, দেখানো হয় নি পরাজিতের মর্মভেদী ট্র্যাজেডি। রবীন্দ্রনাথ মাত্র বাইশ বছরের তরুণ লেখক, তাঁর স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রাখেন সেইখানে, যেখানে উপন্যাসের সমস্যাপট নির্দেশিত হয় মানবরচিত ক্ষমতাতন্ত্রের বিপরীতে প্রকৃতির সহজতাকে স্থাপিত করে। ক্ষমতার অনৈতিকতার বিপরীতে স্থাপিত বলে প্রকৃতির নৈতিক তাৎপর্যও যেন ব্যঞ্জনায় থেকে যায়। রাজতন্ত্র থেকে বহিষ্কৃত উদয়াদিত্যের পিছনে থাকে 'ষড়যন্ত্র, যথেচ্ছাচারিতা, রক্তলালসা, দুর্বলের পীড়ন, অসহায়ের অশ্রুজল', আর সামনে থাকে 'অনন্ত স্বাধীনতা, প্রকৃতির অকলঙ্ক সৌন্দর্য, হৃদয়ের স্বাভাবিক স্নেহমমতা'। একদিকে মানবনির্মিত সভ্যতা, কবির ভাষায় 'What man has made of man', আর তার বিপরীতে, প্রকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্য। প্রকৃতির 'বিমল প্রশান্ত পবিত্র প্রভাত-মুখশ্রী' দেখে উদয়াদিত্যের প্রাণ পাখিদের সঙ্গে 'স্বাধীনতার গান' গেয়ে ওঠে। সে মনে মনে বলে : 'জন্ম জন্ম যেন প্রকৃতির এই বিমল শ্যামল ভাবের মধ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারি।' সমস্যাপটের দিকে তাকালে গৌণ হয়ে যায় বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণ, *বিষবৃক্ষ*-এর হীরার ছাঁচে গড়া মঙ্গলা চরিত্র, স্পষ্ট হয়ে ওঠে নবীন ঔপন্যাসিকের নিজস্বতা।

২

উদয়াদিত্য ক্ষমতাতন্ত্রে প্রথমাবধি অনুপস্থিত রাখতে পেরেছিলেন নিজেকে, তাই ক্ষমতাতন্ত্র থেকে বহিষ্কৃত হওয়া তাঁর পক্ষে ততটা অবস্থান্তর নয়। কিন্তু *রাজর্ষি* (১৮৮৭) উপন্যাসের গোবিন্দমাণিক্য ছিলেন ক্ষমতাতন্ত্রের শীর্ষে। শীর্ষস্থান থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে চাওয়া সহজ নয়, তার জন্য সাধনার প্রয়োজন। গোবিন্দমাণিক্যকে তাই সাধক হতে হয়েছিল, রাজা হয়েও তাই তিনি ঋষি। তাঁর সাধনার পথে তিনি শিক্ষা নিয়েছেন প্রকৃতির কাছ থেকে। প্রকৃতি তাঁর শিক্ষক। উপন্যাসের শুরুতে গোবিন্দমাণিক্যের উপলব্ধিতে শিশুর পবিত্রতা আর প্রকৃতির বিরাটত্ব মিলে যেতে থাকে। প্রকৃতির সৌন্দর্য গোবিন্দমাণিক্যের চোখে নিছক নান্দনিক নয়, তার যেন এক অধ্যাত্মবিভা আছে। এক দিকে ক্ষমতাতন্ত্রের 'বিষয়ের সহস্র-কুটিলতা', তার বিপরীতে শিশুর সরলতা তাঁকে 'বিশ্বজগতের মধ্যবর্তী অনন্তের দিকে প্রসারিত একটি উদার সরল বিস্তৃত রাজপথে' দাঁড় করিয়ে দেয়, সেখানে 'ভূলোক ভুবর্লোক স্বর্লোক সপ্তলোকের সঙ্গীতের আভাস' শোনা যায়। শিশুর মুখের আধো-আধো বাণী শুনে তাঁর 'প্রাণ আনন্দে নিমগ্ন' হয়ে যায়, 'প্রভাত দ্বিগুণ মধুর' হয়ে ওঠে, 'চারিদিকে নদী কানন তরুলতা' হাসতে থাকে। কিন্তু শুধু সেইটুকু নয়, 'কনকসুধাসিক্ত নীলাকাশে' তিনি 'কাহার অনুপম সুন্দর সহাস্য মুখছবি' দেখতে পান, নিজেকে এবং নিজের 'চারিপাশের বিশ্বচরাচরকে যেন কার কোলের উপর' দেখতে পান। রাজ্যহীন গোবিন্দমাণিক্য যখন আরাকান রাজ্যে কুটির বেঁধে বাস করছেন, তখন কুটিরটির অবস্থান যে প্রকৃতি-পরিবেশে, তার দীর্ঘ বর্ণনা আছে— দুই কৃষ্ণবর্ণ পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে বহমান ক্ষুদ্র এক নদী, নদীজলে ছোটোবড়ো শিলাখণ্ড, তার উপর নানা রঙের শ্যাওলা, বড়ো বড়ো গুল্মের নানা ধরণের পল্লব, দুধারে ঘনসবুজ অরণ্য, কোথাও না স্নিগ্ধশ্যামল কলাবন, আর এ সবের মাঝখানে স্রোতস্বিনীর কলহাস্য। দীর্ঘ এই প্রকৃতিছবি নিছক পটভূমি-পরিচয় নয়, এ প্রকৃতি পটভূমিতে নেইও, আছে পুরোভূমিতে। 'নির্জন প্রকৃতির সান্ত্বনাময় গভীর প্রেম' গোবিন্দমাণিক্যের হৃদয়ের মধ্যে ঝরে পড়ছিল, আত্মগুহা থেকে অভিমানগুলি মুছে ফেলতে সাহায্য করছিল। শিক্ষকের ভূমিকা এখানে প্রকৃতির : 'শৈলাসনবাসিনী অতি পুরাতন প্রকৃতির অবিশ্রাম কার্যশীলতা অথচ চিরনিশ্চিন্ত প্রশান্ত নবীনতা' দেখে গোবিন্দমাণিক্যও যেন তেমনই পুরাতন, বৃহৎ, প্রশান্ত হয়ে উঠলেন। নদী যেমন পর্বত থেকে যা পায়, তা সমতলে বিতরণ করে, গোবিন্দমাণিক্যও, তার থেকে শিক্ষা

নিয়ে, পার্বত্যপ্রদেশ ছেড়ে দক্ষিণ সমুদ্র অভিমুখে যাত্রা করলেন। তাঁর চোখে প্রকৃতি অত্যন্ত বৃহৎ বলে প্রতিভাত হল, তিনি যেন বৃক্ষলতায় এক নতুন শ্যামল বর্ণ, সূর্যের এক নতুন কনককিরণ, প্রকৃতির এক নতুন মুখশ্রী দেখতে লাগলেন। এই সমস্ত নূতনতার উৎস গোবিন্দমাণিক্যেরই চৈতন্য, প্রকৃতি সেই চৈতন্যেই অভিষিক্ত। প্রকৃতি-চৈতন্যের যে বিরোধিতা আধুনিক মননে ধরা পড়ে, রোমান্টিক আত্মতাবোধে তার স্বীকৃতি নেই।

গোবিন্দমাণিক্যের রাজা থেকে ঋষি হয়ে ওঠা *রাজর্ষি* উপন্যাসের আখ্যানের কেন্দ্রে আছে, পরিধিতে রয়েছে অন্য এক আখ্যান— জয়সিংহ রঘুপতির সম্বন্ধের ট্রাজিক পরিণতির আখ্যান। গোবিন্দমাণিক্য যদি সাধকের দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে দেখে থাকেন, তবে জয়সিংহ প্রকৃতিকে দেখেন প্রেমিকের দৃষ্টিতে। মন্দির-প্রাঙ্গণে নিজহাতে রোপিত গাছপালাগুলি ছিল তাঁর সঙ্গী, তাঁর ভালোবাসার ধন। প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখে আনন্দিত হন জয়সিংহ, শুধু সৌন্দর্যই দেখেন, দেখেন বৃষ্টিদিনে গোমতী নদীর কলোচ্ছ্বাস, 'চারিদিকে মেঘের স্নিগ্ধ অন্ধকার, বনের ছায়া, ঘন পল্লবের শ্যামশ্রী, ভেকের কোলাহল, বৃষ্টির অবিশ্রাম ঝরঝর শব্দ'— এ সব দেখে জয়সিংহের প্রাণ জুড়িয়ে যায়। নিভৃত এই ভালোবাসার জগৎ থেকে রঘুপতি তাকে সম্পূর্ণ বিপরীত এক রণরক্ত রাজনীতির জগতে নিক্ষেপ করতে চান, তাও জয়সিংহের আরাধ্য দেবীর দোহাই দিয়ে! একদিকে রঘুপতির সংহাররূপিণী নিষ্ঠুর শক্তির শিক্ষা, অন্যদিকে, তার বিপরীতে, জয়সিংহ দেখেন, সৌন্দর্যে পূর্ণ প্রেমে পূর্ণ প্রকৃতিলোক, আষাঢ়-প্রভাতে 'জীবময়ী আনন্দময়ী ধরণী'। সে আনন্দকে গ্রাস করতে চায় যে রক্তলিপ্সা, কথক তার ব্যঞ্জনা আনেন অন্ধকারের ছবিতে। প্রকৃতিছবি প্রতীকী তাৎপর্য পেয়ে যায়। ভাইয়ের হাতে ভাইয়ের হত্যার ষড়যন্ত্রের কথা যখন জয়সিংহ জানায় রাজাকে, তখন থেকে অন্ধকারের সূচনা, তখনই মেঘ এসে সূর্যকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, নদীর উপর কালো ছায়া পড়ে। এই কালো ছায়া পটভূমিগত নয় শুধু।

সে অন্ধকার আরো অন্ধকার হয়, যখন নক্ষত্ররায়কে নিয়ে গোবিন্দমাণিক্য অরণ্যে প্রবেশ করেন। তখন সন্ধ্যা হতে বিলম্ব আছে, কিন্তু মেঘের অন্ধকারে সন্ধ্যা বলে ভ্রম হচ্ছে, কাকেরা চিৎকার করছে, যদিও দু-একটি চিল তখনও আকাশে। অরণ্যের মধ্যে বড়ো বড়ো গাছগুলো জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে ... যেন তারা নিজের ছায়ার দিকে, তলার অন্ধকারের দিকে, অনিমেষনেত্রে তাকিয়ে আছে। এই ছায়া এই অন্ধকার মানুষেরই অচেতনের গভীর তলের আদিরূপ। ভাইয়ে ভাইয়ে বোঝাপড়া সমাপ্ত হয়, কিন্তু গোপন রক্তলিপ্সায় পূর্ণচ্ছেদ পড়ে না। নক্ষত্ররায় রাজার হাত ধরে যখন অরণ্য থেকে ফিরে আসছেন, তখন আকাশ থেকে অল্প অল্প আলো এলেও অরণ্যের নীচে অত্যন্ত অন্ধকার— 'যেন অন্ধকারের বন্যা আসিয়াছে, কেবল গাছগুলোর মাথা উপরে জাগিয়া আছে।' অন্ধকার যে আরও বাড়বে, তার ইঙ্গিতও আছে তারপর 'ক্রমে তাহাও ডুবিয়া যাইবে ; তখন অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া আকাশে পৃথিবীতে এক হইয়া যাইবে।' সেই পূর্ণ অন্ধকারও ঘনালো— 'আকাশের কানায় কানায় অন্ধকার।' সে অন্ধকার শুধু বহিঃপ্রকৃতির নয়, অন্ধকারের মধ্যে জয়সিংহ এসে জানায় রাজাকে— 'আমি গুরুতর অন্ধকারে পড়িয়াছি', তার নীরব কান্নায় 'স্তব্ধ স্থির অন্ধকার বায়ুচঞ্চল সমুদ্রের মতো' কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

রাজার উপদেশ নিয়ে পরদিন সকালে জয়সিংহ তার মন্দির-প্রাঙ্গণের বাগানের মধ্যে গিয়ে বসে, তার চারিপাশে 'পুষ্পখচিত পল্লবের স্তর, শ্যামল স্তরের উপর স্তর, ছায়াপূর্ণ সুকোমল স্নেহের আচ্ছাদন, সুমধুর আহ্বান, প্রকৃতির প্রীতিপূর্ণ আলিঙ্গন।' প্রাকৃতিক অন্ধকার প্রতীকী হয়ে ওঠে বলেই তার বিপরীতে প্রকৃতির শুশ্রূষাও এত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

জয়সিংহ যখন অন্ধকার থেকে পরিত্রাণ পেতে চেয়ে আত্মাহুতি দেয়, তার পটভূমিতে অন্ধকারের পাশে চাঁদও থাকে— 'গোমতীতীরের অরণ্যগুলি চাঁদের দিকে চাহিয়া তাহাদের গভীর অন্ধকাররাশির মর্মভেদ করিয়া মাঝে মাঝে নিশ্বাস ফেলিতেছে।' কেন? সে কি জয়সিংহের আত্মাহুতির বেদনায়? সে আত্মাহুতি

শহীদের আত্মাহুতি বলে কি জয়সিংহের মৃত মুখের উপর চন্দ্রালোক পড়ে? কিন্তু সে আত্মাহুতি তো অন্ধকারকে সমূলে বিনাশ করতে পারে নি? বরং রঘুপতির শোণিতলিপ্সা তীব্রতর হয়ে উঠেছিল, প্রথমে শিশুহত্যার পরিকল্পনা, তারপর যুদ্ধের পরিকল্পনা— বহু হত্যার পরিকল্পনা। এক রাতে, যখন সৈন্যরা অরণ্যে সুপ্তিমগ্ন, তখন মাঝে মাঝে যে আগুন জ্বালানো হয়েছে, সে যেন 'অন্ধকারই বহু কষ্টে নিদ্রাক্রান্ত রাঙা চক্ষু মেলিয়াছে।' রঘুপতি যে অন্ধকারের আয়োজন করেছেন, মানব-রচিত সে অন্ধকার বহিঃপ্রকৃতির অন্ধকার দ্বারা লালিত হচ্ছে : 'কালপেচক তাহার সদ্যোজাত শাবকের উপর যেমন পক্ষবিস্তার করিয়া বসিয়া থাকে, তেমনি অরণ্যের বাহিরকার বিরাট রাত্রি অরণ্যের ভিতরকার গাঢ়তর রাত্রির উপর চাপিয়া ডানা ঝাঁপিয়া নীরবে বসিয়া আছে— অরণ্যের ভিতরে এক রাত্রি মুখ গুঁজিয়া ঘুমাইয়া আছে, অরণ্যের বাহিরে এক রাত্রি মাথা তুলিয়া জাগিয়া আছে।' বহিঃপ্রকৃতি আর অন্তঃপ্রকৃতি এইভাবে একই প্রতীকে একত্র হয়েছে এখানে।

৩

রবীন্দ্রনাথের পূজার গানে প্রকৃতি যেভাবে আসে, সেভাবেই প্রকৃতি এসেছে *বউ-ঠাকুরাণীর হাট* কিংবা *রাজর্ষি* উপন্যাসে। উপন্যাস বলেই বিপরীতের প্রাবল্য রচিত হতে পেরেছে, গানে যার প্রয়োজন হয় না। মানবসভ্যতার হানাহানি, তার কৃত্রিমতার বিপরীতে প্রকৃতির অধ্যাত্ম্য তাৎপর্য নানাদিক থেকে ব্যক্ত হয়েছে উপন্যাসদুটিতে। পরবর্তী দুটি উপন্যাস— *চোখের বালি* আর *নৌকাডুবি* সামাজিক পটে রচিত। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানে প্রকৃতি যেভাবে আসে, এ উপন্যাসদুটিতে সেভাবেই এসেছে প্রকৃতি প্রধানত।

*চোখের বালি*-র (১৯০৩) আখ্যানের অল্প কয়েকস্থানে রসসৃষ্টি উপযোগী পটভূমি রচনা করেছে প্রকৃতি। দমদমের বাগানে বিহারীর কাছে বিনোদিনী মন খুলে নিজের পুরোনো দিনের কথা বলছিল, বিহারীর প্রতি তার অনুচ্চারিত ভালোবাসার ব্যঞ্জনায় প্রকৃতি-পটভূমি রমণীয় হয়ে উঠেছে সেখানে : 'ক্ষণে ক্ষণে উষ্ণ মধ্যাহ্নের বাতাস তরুপল্লব মর্মরিত করিয়া চলিয়া গেল, ক্ষণে ক্ষণে দিঘির পাড়ে জামগাছের ঘনপত্রের মধ্য হইতে কোকিল ডাকিয়া উঠিল।' কখনো-বা মনের অবস্থান্তর বুঝিয়ে দেয় প্রকৃতিপরিবেশ, 'নূতন ফাল্গুনের প্রথম বসন্তের হাওয়া' দিতে আশা বারান্দায় মাদুর পেতে বসে বই পড়ছিল, মহেন্দ্র এলে তাকে গল্প শোনাবে, এই প্রত্যাশা ছিল তার মনে। কিন্তু মহেন্দ্র এসেই তাকে কাশী পাঠাবার প্রস্তাব করে, সে রাজি না হওয়ায় অকারণেই তিরস্কার করে তাকে। হতবুদ্ধি নিশ্চুপ আশার আশাহত হওয়ার বেদনা প্রকাশ পায় প্রকৃতি পরিবর্তনে— সূর্যাস্তের আভা যখন অন্ধকারে মিলিয়ে যায়, তখন সন্ধ্যারম্ভে ক্ষণিক বসন্তের বাতাস চলে গিয়ে শীতের হাওয়া বইতে থাকে। হৃদয়াবেগ তার নিজের রঙে প্রকৃতিকে রাঙায়— এর দৃষ্টান্ত তো অনেক উপন্যাসেই খুঁজে পাওয়া যায়, *চোখের বালি*-তেও তা বিরল নয়। বিনোদিনীর কাছে ভালোবাসার সমর্থন পেয়ে যে প্রভাতে মহেন্দ্রর হৃদয় 'মধুর আবেগে পূর্ণ', সে 'প্রভাতের সূর্যালোক যেন তাহার সমস্ত ভাবনায় বাসনায়' সোনা মাখিয়ে দেয়। তার হৃদয়াবেগের আভায় পৃথিবী হয় সুন্দর, আকাশ হয় মধুময়, বাতাস যেন পুষ্পরেণুর মতো। অথচ এই হৃদয়াবেগই তো মহেন্দ্রর স্ত্রীর সঙ্গে, মায়ের সঙ্গে অপ্রতিকার্য বিচ্ছেদও ঘনিয়ে তুলছে। এক রাতে ছাদের উপর আশা মাটিতে পড়ে আছে, মহেন্দ্রকে দেখে উঠে বসেছে, কিন্তু উভয়েই বাক্যহীন— এই ট্রাজিক মানবিক পরিস্থিতি প্রকাশ করতে কথক প্রকৃতি-ছবিরই সাহায্য নিয়েছেন : 'কৃষ্ণপক্ষের আকাশে তখনও চাঁদ ওঠে নাই— ছাদের কোণে একটা ছোটো গামলায় রজনীগন্ধার গাছে দুইটি ডাঁটায় ফুল ফুটিয়াছে। ছাদের উপরকার অন্ধকার আকাশে ঐ নক্ষত্রগুলি— ঐ সপ্তর্ষি ঐ কালপুরুষ, তাহাদের অনেক সন্ধ্যার অনেক নিভৃত প্রেমাভিনয়ের নীরব সাক্ষী ছিল, আজও তাহারা নিস্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।'

প্রেমের সঙ্গে প্রকৃতির এই নিবিড় যোগ তাঁর গানে যেমন তেমনি তাঁর কথাসাহিত্যেও কতভাবেই না ব্যক্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথ! *চোখের বালি*-তে কখনো দেখি মহেন্দ্রর প্রেমাবেগের আনন্দ প্রভাত-প্রকৃতিতে ছড়িয়ে পড়ছে, কখনো-বা বিহারীর প্রতিহত প্রেম বর্ষার অন্ধকারময় প্রকৃতিছবিতে ঝরে পড়ছে : 'আষাঢ়ের গঙ্গা সম্মুখে বহিয়া চলিয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া পরপারে নীলমেঘ ঘনশ্রেণী গাছপালার উপরে ভারাবনত নিবিড়ভাবে আবিষ্ট হইয়া উঠে; সমস্ত নদীতল ইস্পাতের তরবারির মতো কোথাও-বা উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে, কোথাও-বা আগুনের মতো ঝকঝক করিতে থাকে।' এই বর্ষাদিনের সঙ্গে মিলিয়ে বিনোদিনীর ছবি বিহারীর মনপ্রাণ ভরিয়ে তুলেছে যখন, তখনই সে পায় মহেন্দ্রর সঙ্গে বিনোদিনীর পলায়ন-সংবাদ! এক নিষ্ঠুর আঘাতে তার প্রেমস্বপ্ন চুরমার হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যা হয়ে যায় প্রকৃতি-সৌন্দর্য। হাহাকার-ভরা তার মনের কথা বলে দেন কথক : 'হায় মেঘাচ্ছন্ন আষাঢ়ের সন্ধ্যা, হায় গতবৃষ্টি পূর্ণিমার রাত্রি, তোমাদের ইন্দ্রজাল কোথায় গেল।'

প্রেমের সঙ্গে প্রকৃতির সংযোগ অবশ্য শুধু রবীন্দ্রসাহিত্যেই নয়, যুগ যুগ ধরে বহু কবির বহু কাব্যেই ছড়িয়ে আছে তার নিদর্শন। কবিতার ভিতর দিয়ে কোনো কোনো প্রকৃতি-প্রসঙ্গ চিরকালীন প্রেমাবেগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। এমনি একটি প্রসঙ্গ যমুনা নদী। সেই যমুনাতীরের নগরী এলাহাবাদে মহেন্দ্র আর বিনোদিনী এসে উপস্থিত হয়। যমুনাতীরে একা বসে মহেন্দ্র যেন প্রেমের তীর্থ বৃন্দাবনেই পৌঁছে যায়। বর্ষার মেঘ যমুনাপুলিনকে আরো কাব্যিক করে তোলে, 'পরপারবর্তী বালুকার অস্ফুট পাণ্ডুরতা, নিস্তরঙ্গ জলের মসীকৃষ্ণ কালিমা, ঘনপল্লব বিপুল নিম্ববৃক্ষের পুঞ্জীভূত স্তব্ধতা, তরুহীন ম্লান ধূসর তটের বঙ্কিমরেখা', সবই যেন সেই আষাঢ়-সন্ধ্যার অন্ধকারে অনির্দিষ্ট অপরিস্ফুট আকারে মিলিত হয়ে মহেন্দ্রকে বেষ্টন করে নেয়। এক তিমিরাভিসারিকাকেও সে কল্পনার চোখে দেখতে পায়। তারপর তৃতীয়ার চাঁদ ওঠে, জ্যোৎস্নার মায়ামন্ত্রে সেই নদী, নদীতীর, আকাশ, আকাশের সীমান্ত সবই যেন অপার্থিব হয়ে ওঠে, অতীত ভবিষ্যৎ লুপ্ত করে শুধু 'রজতধারা প্লাবিত' বর্তমানটুকু যেন বেঁচে থাকে। বিনোদিনীর কাছ থেকে চূড়ান্ত আঘাত পাবার আগের মুহূর্তটুকু মহেন্দ্রর কাছে প্রকৃতি-সংস্পর্শে যে এমন রমণীয় হয়ে ওঠে, সে হয়তো তার আঘাতের তীব্রতাকে বৈপরীত্যে তীব্রতর করার উদ্দেশ্যেই।

*নৌকাডুবি*-তে ঘটনা-জটিলতায় প্রেম প্রতিহত। তাই বিপরীতের সংস্থাপনেই এ উপন্যাসের প্রকৃতি-প্রসঙ্গ তাৎপর্যময়। প্রকৃতিকে সংসারের বৈপরীত্যে রাখে এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র রমেশ। তার অন্তরুক্তিতে একদিকে থাকে জীবনের রণক্ষেত্রে সংগ্রামের চিন্তা, আর তার বিপরীতে থাকে আকাশ, যেখানে চিন্তার রেখা নেই, জ্যোৎস্নায় নেই চেষ্টার চাঞ্চল্য, রাত্রি নিস্তব্ধ শান্ত, 'বিশ্বপ্রকৃতি ঐ অগণ্য নক্ষত্রলোকের চিরকর্মের মধ্যে চিরবিশ্রামে বিলীন।' প্রকৃতির মধ্যে নিত্য শান্তি আর সংসারের নিত্য সংগ্রাম— এ দুয়ের বিরোধকে কথক উপস্থিত করেছেন রমেশের বয়ানে। আবার, কমলার দিক থেকে এ বিরোধকে দেখানো হয়েছে উলটোভাবে। জাহাজ থেকে কমলা দেখছে শূন্য তীর ধূ ধূ করছে, প্রকাণ্ড আকাশ দিগন্ত থেকে দিগন্তে স্তব্ধ, কমলার মতো ক্ষুদ্র বালিকার পক্ষে এই 'অন্তহীন বিশালতা অপরিসীম অনাবশ্যক', তার আবশ্যক কেবল একটিমাত্র ঘর। প্রকৃতি আর মানবসংসারের বৈপরীত্য তবে কি পুরুষের দিক থেকে একরকম আর নারীর দিক থেকে আরেকরকম?

*নৌকাডুবি*-র প্রকৃতি-ছবিতে দেখি দুই বিরোধী ভাবের ক্রমান্বয় উপস্থিতি। নৌকাডুবির ঘটনাটি ঘটে নদীবক্ষে এক প্রচণ্ড ঝড়ের দাপটে, তারই বিপরীতে, বসন্ত-বর্ষার মতো কবিখ্যাত কোনো ঋতু নয়, পাওয়া যায় শরৎ ঋতুর উল্লেখ, কখনো শরতের 'আনন্দ-ভাণ্ডারের সোনার সিংহদ্বার', কখনো 'আশ্বিনের পীতাভ রৌদ্রপট'। কমলাকে নিয়ে রমেশ যখন গঙ্গাবক্ষে তখনও একাধিকবার থাকে শরৎকালের কথা— 'শারদরৌদ্র রঞ্জিত দুই তীরের শান্তিময় বৈচিত্র্য' কিংবা 'শরৎমধ্যাহ্নের সুমধুর স্তব্ধতা' কিংবা 'আশ্বিনের সুন্দর দিনগুলি'। কমলার প্রতি রমেশের মনোভাব প্রেমের নয়, কোমল এক স্নেহ-বিধুরতার। শরৎ-ছবিতে তারই দ্যোতনা। এই শান্তি

এই সৌন্দর্যের পটে জেগে ওঠে বিপরীত ছবি— রাশি রাশি কালো মেঘ দলে দলে চলে আসে এক সকালে, মেঘবিচ্ছুরিত একটা রুদ্র আলোক পড়ে জলের উপর, তারপর ঝোড়ো হাওয়া 'শরবিদ্ধ জন্তুর মতো' চিৎকার করে দিগ্‌বিদিকে ছুটে বেড়ায়, 'মেঘ সত্ত্বেও শুক্লচতুর্দশীর আকাশ ক্ষীণ আলোকে অশান্ত সংহারমূর্তি অপরিস্ফুটভাবে প্রকাশ' করে— 'উর্ধ্বে নিম্নে, দূরে নিকটে, দৃশ্যে-অদৃশ্যে একটা মূঢ় উন্মত্ততা, একটা অন্ধ আন্দোলন যেন অদ্ভুত মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া যমরাজের উদ্যতশৃঙ্গ কালো মহিষটার মতো মাথা-ঝাঁকা দিয়া দিয়া উঠিতেছে।' প্রকৃতিছবির ভয়ালতা এখানে ভয়ালতর হয়ে ওঠে পুরাণ-প্রতিমা প্রত্ন-প্রতিমার সহযোগে, নৌকাডুবির রাতকে আরো একবার ফিরিয়ে আনা হল রমেশ-কমলার জীবনে, তাদের সম্বন্ধের নঞর্থকতাকে স্পষ্ট করে তুলতে।

৪

*গোরা* (১৯১০) উপন্যাসের আছে এক মহাকাব্যিক বিস্তার, সে বিস্তারেও প্রকৃতি-প্রসঙ্গ পরিহার্য বলে মনে করেন নি লেখক, বরং সে প্রসঙ্গের ব্যবহার যেন তুলনারহিতই বলতে ইচ্ছে করে। এ উপন্যাসে প্রকৃতিকে কোনো বিপরীতের পটে স্থাপিত করা হয় নি। প্রকৃতির সঙ্গে ব্যক্তির আত্মতার যোগ, যা হয়ত রবীন্দ্রনাথের নিজেরই অভিজ্ঞতা, তারই উপস্থাপন আছে এ আখ্যানে। সেই আত্মতার সূত্রেই এসেছে প্রেম, ফলে প্রেমের সঙ্গে প্রকৃতির যোগ এ উপন্যাসে যেভাবে প্রদর্শিত হয়েছে, *চোখের বালি, নৌকাডুবি* থেকে তা কিছুটা স্বতন্ত্র। 'নরনারীর প্রেমের মধ্যে একটি অত্যন্ত আদিম প্রাথমিক ভাব আছে; তাহা বহিঃপ্রকৃতির অত্যন্ত নিকটবর্তী, তাহা জলস্থল আকাশের গায়ে সংলগ্ন'— 'কেকাধ্বনি' প্রবন্ধে (*বিচিত্র প্রবন্ধ*) বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। *গোরা* উপন্যাসে দেখি সেই 'জলস্থল আকাশে'র ভাষাই ব্যবহৃত, গোরা ততদিন তাদের লক্ষ্যই করে নি, যতদিন তার মনে জাগে নি প্রেমের অনুভব। যেদিন সেই অনুভব জেগেছে, সেদিনই সে গেছে গঙ্গার ধারে, সেখানে নদীর উপরকার আকাশ 'আপন নক্ষত্রালোকে অভিষিক্ত অন্ধকার দ্বারা গোরার হৃদয়কে বারংবার নিঃশব্দে স্পর্শ করছিল। নিবিড় গাছগুলির মধ্যে অন্ধকার, তার উপরে বৃহস্পতি গ্রহ— 'সেই বৃহৎ নিস্তব্ধ প্রকৃতি' গোরার শরীর-মনকে অভিভূত করে দিয়েছিল। 'প্রকৃতি এতকাল ধৈর্য ধরিয়া স্থির হইয়া ছিল— আজ গোরার অন্তঃকরণের কোন দ্বারটা খোলা পাইয়া সে মুহূর্তের মধ্যে এই অসতর্ক দুর্গটিকে আপনার করিয়া লইল। এতদিন নিজের বিদ্যা বুদ্ধি চিন্তা ও কর্ম লইয়া গোরা অত্যন্ত স্বতন্ত্র ছিল— আজ কী হইল! আজ কোনখানে সে প্রকৃতিকে স্বীকার করিল এবং করিবামাত্রই এই গভীর কালো জল, এই নিবিড় কালো তট, ঐ উদার কালো আকাশ তাহাকে বরণ করিয়া লইল! আজ প্রকৃতির কাছে কেমন করিয়া গোরা ধরা পড়িয়া গেছে।' প্রকৃতির এই নীরব স্পর্শের কথা প্রকৃতির বরণ করে নেবার কথা আগের উপন্যাসগুলিতে কোথাও নেই। প্রকৃতির সঙ্গে এই নিবিড় সংযোগ ঘটছে যে প্রেমানুভবের মধ্যে দিয়ে, সে-ও যেন এর ফলে অন্য এক মাত্রা পেয়ে যায়, সাধারণ নর-নারীর প্রেমোচ্ছ্বাসের সঙ্গে একে আর মেলানো যায় না। বিনয় আর ললিতা যখন এক স্টিমারে ফিরছে, তখন বিনয় দেখছে ঘুমন্ত ললিতাকে প্রকৃতির আবেষ্টনীতে, আবার ললিতাও দেখছে, ঘুমন্ত বিনয়কে হেমন্তের প্রত্যুষে 'অন্ধকারজড়িত অপরিচিত নদীদৃশ্যের মধ্যে'। সকালে দুজনের যখন দেখা হয়, তখন 'শিশিরসিক্ত কাশবনের পরপ্রান্তে আসন্ন সূর্যোদয়ের স্বর্ণচ্ছটা উজ্জ্বল' হয়ে উঠছিল। তারা যেন এমন প্রভাত আর কখনো দেখেনি আগে : 'আলোক তাহাদিগকে এমন করিয়া কখনো স্পর্শ করে নাই— আকাশ যে শূন্য নহে, তাহা যে বিস্ময়নীরব আনন্দে সৃষ্টির দিকে অনিমেষে চাহিয়া আছে, তাহা ইহারা এই প্রথম জানিল।' এখানে এসেছে সেই 'স্পর্শ' শব্দটি, আর স্পর্শ যে করতে পারে, সে কখনো জড় নয়, 'সমস্ত জগতের' একটা 'অন্তর্নিহিত চৈতন্য' আছে।

তবে প্রকৃতির সঙ্গে এই স্পর্শযোগ শুধু যে প্রেমানুভবের মধ্যেই ঘটে, এমনও নয়। গোরা প্রকৃতিকে সচেতনভাবে লক্ষ করে নি প্রেমে পড়ার আগে পর্যন্ত। এ কথা ঠিক। কিন্তু প্রকৃতির প্রসাদ তো তার চৈতন্য এসে পৌঁছেছে তার অনেক আগেই। সেই এক উষালগ্নের কথা আছে উপন্যাসে যখন 'জগতের অন্তর্নিহিত চৈতন্য' আর ব্যক্তিচৈতন্য মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। এ এক এপিফ্যানি। দশ নম্বর সদর স্ট্রিটের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে কোনো এক ব্রাহ্মমুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের নিজের যে এপিফ্যানিক অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তারই প্রতিচ্ছবি এঁকেছেন তিনি *গোরা*-য়। খোলা ছাদের উপর সেই লগ্নে উষার আভাস গোরার কাছে যেন বেদমন্ত্রের মতো এসেছিল, তার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে যেন 'একটি জ্যোর্তিময় শতদল' সমস্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত হয়ে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। শুধু স্পর্শমাত্র নয়, সে স্পর্শ শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে যাচ্ছে— প্রকৃতি-মানুষের এই নিবিড়তম সংযোগ বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কেউ লেখেন নি। *গোরা*-তে এই সংযোগের কথা একাধিকবার আছে। একেবারে প্রথম অধ্যায়ে, সুচরিতাকে দেখার পর, বিনয়ের মনে হচ্ছিল বর্ষাপ্রভাতের রৌদ্রের দীপ্ত আভা যেন তার মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করছে। প্রকৃতিকে এভাবে শরীর দিয়ে গ্রহণ করা— এ তো এক ধরণের অধ্যাত্ম-উপলব্ধিই, যে উপলব্ধিতে আমি থেকে মুক্তি পায় মানুষ। প্রেমানুভব যখন প্রকৃতিতে বিকিরিত, তখন তো তা মুক্তিরই পথ। *গোরা* আর *গীতাঞ্জলি* একই বছরে প্রকাশিত। প্রকৃতিচেতনার দিক থেকে দুটি বইয়ের সামীপ্য থাকতেই পারে।

৫

*চতুরঙ্গ* (১৯১৬) উপন্যাসের সমস্যাপট আত্মিক, সামাজিক নয়। বহির্জগতের প্রকৃতি-প্রসঙ্গ এ উপন্যাসে অন্তর্জগতের প্রতিফলক হয়ে ওঠে, বহির্দেশ হয়ে ওঠে অন্তর্দেশ। কোথাও কোথাও প্রকৃতি অন্য প্রয়োজনেও এসেছে। অকথিত কথার ব্যঞ্জনা দেবার উদ্দেশ্যে কথক প্রকৃতি-পটভূমি ব্যবহার করছেন দেখতে পাই। 'দামিনী' অঙ্গের শেষ অধ্যায়ে এমনই একটি পটভূমি আছে : 'সেদিন কোকিলের আর ঘুম ছিল না। দক্ষিণে হাওয়ায় গাছের পাতাগুলো যেন কথা বলিয়া উঠিতে চায়, আর তার উপর চাঁদের আলো ঝিলমিল করিয়া উঠে।' এই পটভূমিতে শচীশ শুধু দামিনীর নামটুকু উচ্চারণ করে, আর কিছু তার বলা হয় না, আর কিছু আর বলতে লাগেও না। পটভূমিই জানিয়ে দেয় তার উপচে-পড়া প্রেমাবেগ। দামিনীর মৃত্যুর পর শ্রীবিলাস দেশে ফেরার পথে একটি স্থানে কিছুদিন থেকে যায়, সেখানকার প্রকৃতি-পরিসরে শ্রীবিলাস দেখতে পায় মৃত্যুকে হারিয়ে দিচ্ছে জীবন। সে দেখে— একটি কবরের ফাটলে ফাটলে গজিয়ে ওঠা গাছে ভাঁটফুল আকন্দ ফুল ফুটেছে— 'বাসরঘরে শ্যালীর মতো মৃত্যুর কান মলিয়া দিয়া দক্ষিণ-বাতাসে তারা হাসিয়া লুটোপুটি করিতেছে'। মৃত্যুর এই পরাভব কি শ্রীবিলাসের হাহাকারকে কিছুমাত্র প্রশমন করতে পারছে? আদৌ নয়, চির আনন্দময় প্রকৃতি-পটের বৈপরীত্যে বরং সে হাহাকার আরো তীব্র আরো মর্মভেদী হয়ে উঠেছে।

প্রকৃতি-মানুষের সংযোগকে এ উপন্যাসে পরোক্ষভাবে দেখানো হয়েছে প্রকৃতিকে মানুষী আবেগ মানুষী আচরণ আরোপ করে। দামিনীর মৃত্যুর সেই অসাধারণ প্রকৃতি-পটভূমি— মাঘের পূর্ণিমা সেদিন ফাল্গুনে পড়েছে, আর সমুদ্র ফুলে ফুলে উঠছে 'জোয়ারের ভরা অশ্রুর বেদনায়'। যে দামিনী সম্বন্ধে শচীন ডায়ারিতে লিখেছিল সে মৃত্যুর কেউ নয়, সে জীবনরসের রসিক, বসন্তের পুষ্পবনের মতো সে, লাবণ্যে গন্ধে হিল্লোলে ভরপুর, সেই দামিনীর মৃত্যুতে এক সমুদ্রভরা অশ্রু জোয়ারে উতলা হয়ে উঠবে— এটাই তো স্বাভাবিক। সেই এক-সমুদ্র কান্না প্রকৃতপক্ষে শ্রীবিলাসেরই প্রকৃতিতে আরোপিত হয়ে তা বিশ্বব্যাপ্তি পেয়ে যায়। অপর একটি দৃশ্যে সমুদ্রের ধারে বালির উপর শচীশ-শ্রীবিলাস-দামিনী লীলানন্দ স্বামীর সমীপে বসে আছে, তখন সূর্যাস্তটি 'দিবসের শেষ প্রণামের মতো' নত হয়ে পড়ে, আর লীলানন্দ স্বামীর গান যেখানে শেষ হয় সেখানে আকাশভরা সমুদ্র-ভরা সন্ধ্যার স্তব্ধতা নীরব সুরের রসে একটি সোনালি রঙের পাকা ফলের মতো ভরে

ওঠে। শচীশ যেদিন দামিনীকে চলে যেতে বলে আর দামিনী সে প্রস্তাব প্রবল আবেগের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে, সেদিন শচীশ কীর্তনে যোগ দিতে না গিয়ে চুপ করে বসে থাকে আর 'দক্ষিণ হাওয়ায় দূর সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ পৃথিবীর বুকের ভিতরকার একটা কান্নার মতো নক্ষত্রলোকের দিকে উঠতে থাকে।' একদিকে সমুদ্রের ঢেউ অন্যদিকে নক্ষত্র, আকাশ— এই দুই বিপরীত পট ব্যঞ্জনা দেয় প্রকৃতি-চৈতন্যের দ্বান্দ্বিকতার, শচীশের অন্তর্লোকের দ্বান্দ্বিকতার (প্রকৃতি বলতে এখানে অবশ্য ইংরেজি নেচার বোঝাচ্ছি না)।

প্রকৃতি-প্রসঙ্গের প্রতীকী ব্যবহার অনেক উপন্যাসে দেখা যায় হয়ত, কিন্তু বহির্দেশ এ উপন্যাসে যেভাবে অন্তর্দেশ হয়ে উঠছে, এ বৈশিষ্ট্য অন্যত্র সুলভ নয়। একটি প্রকৃতি-পরিসরের বর্ণনা আছে 'শ্রীবিলাস' অঙ্গে, যেখানে দামিনী শচীশের আহার্য নিয়ে তার খোঁজে উপস্থিত হয়েছে নদী পার হয়ে বালুচরে, সেখানে 'রৌদ্র যেমন নিষ্ঠুর, বালির ঢেউগুলাও তেমনি।' শুধু নিষ্ঠুরই নয়, বালির ঢেউগুলি যেন 'শূন্যতার পাহারাওয়ালা', শূন্যতাময় এ পরিসর যেন মূর্তিমান 'না', তার মধ্যে না আছে শব্দ, না গতি, না রঙ। বহির্দেশের এ বর্ণনা মূলত অন্তর্দেশেরই। অন্তর্দেশেরই তীব্র ট্রাজিক অনুভবের প্রতিফলনে বহির্দেশ হয়ে ওঠে ট্রাজিক দেশ। বহির্দেশের বর্ণনা মূলত অন্তর্দেশের পরিচায়ক হয়ে উঠেছে শচীশের গুহাবাসের বর্ণনার দিনলিপি-লিখনেও। গুহায় রাত্রিযাপনের সময় যে অন্ধকারের অভিজ্ঞতা হয় শচীশের, একটা 'কালো জন্তুর মতো' সেই অন্ধকার, যার মধ্যে বাদুড়ের মতো কোনো পাখি অন্ধকার থেকে অন্ধকারে চলে যায়, সে অন্ধকার তো শচীশের অন্তর্দেশেরই। আরো এক অন্ধকারের, বহির্দেশের এক ঝড়বৃষ্টির ছবি আছে, যেখানে বলেই দিচ্ছেন কথক সেই ঝড় 'ভিতরে'— অন্তর্দেশে ঢুকে পড়ে, ভদ্র আসবাবগুলোকে উলটপালট করে দেয়। ঝড়ের ছবিটি মূলত শব্দছবি— নদীর ঢেউ-এর 'ছলচ্ছল', আকাশের জলের 'ঝরঝর', প্রলয়ের আসরে 'ঝমাঝম করতাল', বাঁশবনের মধ্যে 'বিধবা প্রেতিনীর কান্নার', আমবাগানের ডালপালার 'ঝপাঝপ' শব্দ, আর জীর্ণ বাড়ির পাঁজরের ফাঁক দিয়ে বাতাসে তীক্ষ্ণ ছুরি বিঁধে হু হু করে চিৎকার। অন্ধকারে যেহেতু বর্ণ কিংবা আকার লুপ্ত হয়ে যায়, তাই ধ্বনি দিয়েই প্রকৃতি-পরিসর বহির্দেশ থেকে অন্তর্দেশে প্রবেশ করেছে। বর্হিদেশ আর অন্তর্দেশের একাকারত্বই *চতুরঙ্গ* উপন্যাসের মূল কথন-বৈশিষ্ট্য।

৬

*ঘরে-বাইরে* (১৯১৬) উপন্যাসে তিনটি চরিত্রের আত্মকথন আছে, তারমধ্যে সন্দীপের আত্মকথনে প্রকৃতি-প্রসঙ্গ যৎসামান্য, বিমলার আত্মকথনে সে প্রসঙ্গ কোথাও কোথাও এসেছে, কিন্তু নিখিলেশের আত্মকথায় প্রকৃতি-প্রসঙ্গ এসেছে অনেক বেশি গুরুত্ব নিয়ে। প্রকৃতির সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার বেদনা দিয়ে নিখিলেশের দ্বিতীয় আত্মকথাটির সূচনা। যে কবিরা প্রকৃতিরই মধ্যে থাকেন, তাই প্রকৃতিকাতরতা-বিহীন, জার্মান ভাবুক শিলারের পরিভাষায় তাঁরা হলেন 'নাঈভ', আর যাঁরা প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন, বিচ্ছিন্ন বলেই প্রকৃতির প্রতি প্রবল টান অনুভব করেন, শিলার তাঁদের বলেন 'সেন্টিমেন্টাল'। শিলারের এই পরিভাষা ব্যবহার করেছেন বুদ্ধদেব বসু তাঁর *মেঘদূত* অনুবাদের ভূমিকায় ক্ল্যাসিক সাহিত্যের প্রকৃতিচেতনার সঙ্গে আধুনিক যুগের প্রকৃতিচেতনার পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে। নিখিলেশের মধ্যে আমরা রবীন্দ্রনাথের আত্মসাধনার কিছু আভাস পাই। গানের সুর যে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হবার একটা পথ, এই রাবীন্দ্রিক ভাবনাই উল্টোভাবে প্রকাশ পায় নিখিলেশের আক্ষেপে, গান না-জানার আক্ষেপে। শরৎ প্রকৃতিতে কচি ধানের আভা যখন কাঁচা দেহের লাবণ্যের মতো, সকালের রোদ যখন নীল আকাশের ভালোবাসার মতো, তখন, শরতের সেই প্রভাতসংগীতে সুর মেলাতে পারছে না নিখিলেশ! কিন্তু এই মিলতে না-পারা সে কি শুধুই সুরহীনতার কারণে? ভালোবাসায় আঘাত-পাওয়া বেদনার্ত অহংবোধ কি এর জন্যে একটুও দায়ী নয়? কেননা, 'শোবার ঘরের ভাঙা খাঁচা' থেকে যখন বেরিয়ে আসতে পারে নিখিলেশ, তখন তো সে এই বিচ্ছিন্নতাবোধকে অতিক্রম করে যায়! চারিপাশের প্রকৃতি-পরিবেশ প্রত্যক্ষণ

করে সে বোধ করে : 'বিশ্বের এই যা-কিছু খুব সহজ অথচ অত্যন্ত বৃহৎ', 'তারই আতপ্ত নিশ্বাস ঐ কাঞ্চন ফুলের গন্ধের সঙ্গে মিশে আমার হৃদয়ের উপরে এসে পড়েছে। আমার মনে হল, আমি আছি এবং সমস্তই আছে এই দুইয়ে মিলে আকাশ জুড়ে যে সঙ্গীত বাজছে সে কী উদার কী গভীর, কী অনির্বচনীয় সুন্দর!' আত্মবিলাপকে বড়ো করে দেখলে বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হয়, কিন্তু যে দুঃখ বিশ্বের, তাকে নিজের করে তুললেই বিচ্ছিন্নতা দূর হয়। তার জন্যে কাজ করাই তো মুক্তি পাওয়া। কিন্তু কাজের জগতের কথা তো মনে আসে 'খোলা আলো'য়। আলো যখন নিবে আসে, সন্ধ্যা নামে, সংসারটা আড়াল হয়ে যায়, তখন অনন্ত অন্ধকারকে ভরিয়ে তুলতে পারে একের সঙ্গ। তাই 'সন্ধ্যাটি যেই জগতের উপর প্রেয়সীর কালো চোখের তারার মতো অনিমেষ হয়ে ওঠে' তখন কাজের জগৎ গৌণ হয়ে যায়। তখন নিখিলেশের একাকিত্ববোধ আবার তীব্র হয়ে ওঠে। এমনই এক তীব্র একাকিত্ব নিয়ে এমনই এক সন্ধ্যায়, যখন কৃষ্ণ-প্রতিপদের চাঁদ উঠেছে, বিমলাকে বলতে হয় তাকে : 'আমি তোমাকে ছুটি দিলুম।'

বিমলার আত্মকথা শুরু হয়েছিল ব্রাহ্মমুহূর্তের উষাসতীর দান স্মরণ করে। আর শেষ দিকে পাই এক সূর্যাস্তের ছবি। আশ্চর্য সেই ছবি— 'অস্তমান সূর্যকে কেন্দ্র করে একটা মেঘের ঘটা উত্তরে-দক্ষিণে দুই ভাগে ছড়িয়ে পড়েছিল, একটা প্রকাণ্ড পাখির ডানা মেলার মতো তার আগুনের রঙের পালকগুলো থাকে থাকে সাজানো। মনে হতে লাগল আজকের দিনটা যেন হু হু করে উড়ে চলেছে রাতের সমুদ্র পার হবার জন্যে।' নিখিলেশ যখন দাঙ্গা রুখতে বেরিয়ে গেছে, তখন আসন্ন সংকট নিয়ে বিমলার প্রবল উদ্বেগ এই প্রকৃতি-ছবিতেই ব্যক্ত হয়েছে। সন্ধ্যা পেরিয়ে অন্ধকার ঘনালে বিমলার মনে হয়েছে রাজবাড়ির বড়ো দিঘিটা অন্ধের চোখের মতো আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। বাতাসের শব্দকেও তার মনে হচ্ছে আকাশের বুক ধড়াস করে ওঠার শব্দ। মনের উৎকণ্ঠা আরোপিত হচ্ছে প্রকৃতিতে। বিমলার আত্মকাহিনিতে কোথাও-বা তার পাপবোধ, যা নৈতিক বোধের অন্য পিঠ, তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় প্রকৃতি-প্রত্যক্ষণ। বিমলা তার মাথায় স্বামীর পাদস্পর্শ নিয়ে পশ্চিমের বারান্দায় এসে বসেছে, দূরের শিমুলগাছটি, যার পাতা ঝরে গেছে, তাকে তার মনে হচ্ছে 'অন্ধকারে কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে আছে', তার পিছনে অস্তমান চাঁদ। সে তার অপরাধবোধে নিজেকে পরিবারের সকলের থেকে পৃথক করে নিয়েছে, এমন অপরাধীকে যেন প্রকৃতিও ভয় পায়, রাত্রিবেলাকার প্রকাণ্ড জগৎ যেন তার দিকে 'আড়চোখে চায়', তার মুখের দিকে তাকিয়ে যেন 'নক্ষত্রলোকের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।' বিশ্বব্যাপী বিচ্ছেদের উপরে যেন 'পদ্মপাতার উপরকার শিশিরবিন্দুর মতো' তার বেঁচে থাকা। অপরাধবোধের কী মর্মান্তিক আর্তি এই বিশ্ববিচ্ছিন্নতায়! প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংযোগের এই নৈতিক তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেই-বা দেখাতে পারেন!

৭

*যোগাযোগ* (১৯২৯) উপন্যাসের প্রথম দিকে প্রকৃতি-প্রসঙ্গ আসে পটভূমিরূপে। ঘটনা অনুসারে যে পটভূমির ভিন্নতা দেখি, উপন্যাসের কলাকৌশলের তা সাধারণ নিয়ম। কুমুর বাবা মুকুন্দলালের মৃত্যুদৃশ্যের সূচনায় সেই সাধারণ নিয়ম অনুসারেই থাকে এক ভয়ংকর ঝড়ের বর্ণনা। কিন্তু কুমুদিনী যেখানে মধুসূদনকেই বিয়ে করবে বলে তার দাদাকে জানায়, সে অধ্যায়ের শুরুতে এবং শেষে যে মেঘ বৃষ্টি বিদ্যুৎ অন্ধকার থাকে, তা নিছক পটভূমিগত নয়, তার মধ্যে কুমুর ভবিতব্যের ব্যঞ্জনা থেকে যায়। অথচ কুমু তার ভবিষ্যৎ নিয়ে কল্পনাবিভোর। তার বিভোরতা তার প্রকৃতি-প্রত্যক্ষণের মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পায়। সে দেখে বিকেলের বাঁকা আলো কীভাবে বাতাবিলেবুর শাখার 'উপর দিয়ে এসে ঘন কালো জলের উপরে নিকষে সোনার রেখার মতো ঝিলমিল করতে থাকে', সেই দেখায়, সেই আলোয় ছায়ায় 'ওর সমস্ত শরীরের উপর দিয়ে অনির্বচনীয় পুলকের কাঁপন বয়ে যায়।' সেই 'অনির্বচনীয় পুলক' বাস্তবে তার অনধিগম্য থেকে যাবে, বিবাহ-প্রথার বলি হবে সে, সেই

মর্মন্তুদ ট্রাজেডির বিপরীত পটই হয়ত সেই নিকষে সোনার রেখার ঝিলিমিলি। বিয়ের পর স্বামীগৃহে প্রকৃতি-সন্নিধান বলতে শুধুমাত্র আকাশের সংস্পর্শই পেতে পারে সে, খোলা ছাদে বসে। আকাশের ছবি কতভাবে যে ঘুরে-ফিরে আসে তার স্বামীগৃহ যাপনের ক্লিষ্টতায়! আকাশ যে মুক্তির দ্যোতক। কুমু সেই মুক্তিই খুঁজে ফেরে আর ব্যর্থ হয় বারবার। স্বামী-সন্নিধানের আগের মুহূর্তে তার মনে হয় আকাশ থেকে বাজপাখির ছায়া নেমে আসছে কপোতীর উপর, শীতকালের কৃপণ রাত্রিতে আকাশের অপ্রসন্নতা প্রকাশ পায়, তারার আলোও যেন 'ভাঙাগলার কথার মতো', এমনকি ভোরবেলার পূর্ব আকাশে সোনার রেখাটিও মলিন। ছাদ থেকে কুমু আকাশের আশ্রয় পায় বটে, কিন্তু সে আকাশের বুকেও তো কারখানার চিমনি ধোঁয়া উদ্গীরণ করে। কুমুকে ছাদে বসেই তার ঠাকুরের ধ্যান করতে হয়, সেখানে সে দেখে 'সন্ধ্যার স্বচ্ছ তিমির-গম্ভীর মহিমা' ধুলা-কুয়াশায় আচ্ছন্ন, এমনকি আকাশটা যেন 'পরিব্যাপ্ত মলিনতার বোঝা নিয়ে মাটির দিকে নেমে পড়েছে'। এই আবিল পরিবেশেও কুমু যখন তার মনের বিশ্বের নিজেকে দেবতার পায়ে উৎসর্গ করে দিতে পারে, তখন 'সূর্যের আলো হয়ে আকাশপূর্ণ একটি পরম স্পর্শ তার দেহকে অভিনন্দিত' করে দেয়। এই স্পর্শের কথাই পেয়েছি *গোরা*-তে, প্রকৃতি-মানুষের সেই নিবিড়তম যোগ থেকে বঞ্চিত নয় কুমু। গানের ধারায় তার আকাশ ভাসিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। মধুসূদনের সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে তখন সে অবজ্ঞা করতে পারে, 'রোদ-ভরা আকাশে একটা পতঙ্গের মতো বিলীন' হবার ইচ্ছায়, তখন অসীম আকাশে তার ক্রুদ্ধ গুঞ্জন মিলিয়ে যায়।

কিন্তু যখন তার মনোহীন শরীর স্বামী ভোগ করে, তখন দেবতার প্রতি ভক্তি তার বজায় থাকে না আর, মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, তখন কিন্তু সে ছাদে বসে নি, আকাশের সংস্পর্শে আসে নি। 'আকাশ' প্রসঙ্গ দিয়েই কথক কুমুর মনের মোড় ফেরা দর্শিয়ে দিয়েছেন। দাদা আসবেন— সে কথা যখন জানে কুমু, দাদার শরীর ভালো নয় জেনে যখন তার মন উৎকণ্ঠিত, তখনও কুমু ছাদে বসে নি। মেঘলা দিন, টিপটিপ বৃষ্টি, কুমুর কাছে 'মেঘে রঙ নেই, বৃষ্টিতে ধ্বনি নেই, ভিজে বাতাসটা যেন মনমরা, সূর্যালোকহীন আকাশের দৈন্যে পৃথিবী সংকুচিত'। অথচ মধুসূদনের কাছে বাইরে আকাশ মেঘে ঘোলাটে হলেও, তার ভিতরের আনন্দের কমতি নেই, কেননা বিষয়ী মধুসূদন তো প্রকৃতি-সংযোগ কাকে বলে জানেই না! দাদার কাছে গিয়ে কুমু যখন গান শোনাতে পারে, তখনই তার 'ভিতরের আকাশ' আলো হয়ে ওঠে। 'আকাশ'— এই একটিমাত্র প্রকৃতি-প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তির মধ্যে দিয়েই কুমুর অন্তর্জীবনের নাটক ব্যক্ত হয়।

৮

*যোগাযোগ* আর *শেষের কবিতা* উপন্যাসদুটি একই বছরে প্রকাশিত, নাকি লেখাও হয়েছে একসঙ্গে, অন্তত কিছু অংশ, প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন। অথচ দুটি উপন্যাসে কী আকাশপাতাল পার্থক্য। একটি উপন্যাসে ভালোবাসতে না-পারার সমস্যা অন্যটিতে ভালোবাসতে পারার সমস্যা। এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল। মিল আছে মুক্তিভাবনায়। *যোগাযোগ*-এ 'মুক্তি' শব্দটি আসে ভালোবাসাহীন বন্ধন থেকে 'মুক্তি'র ভাবনা সূত্রে। *শেষের কবিতা*-তে 'মুক্তি' শব্দটি থাকে ভালোবাসার বন্ধন থেকে মুক্তির ভাবনায় : 'যেখানে খুব করে মিল, সেখানেই মস্ত বিরুদ্ধতা। ... আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো যে পাওনা সে মিলন নয় সে মুক্তি।' ভালোবাসার মধ্যেও তাই দূরকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়, আকাশকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। প্রকৃতি এ উপন্যাসে রোমান্সের উপযোগী পটভূমি রচনা করেছে, বর্ষার মেঘমেদুর শিলং তার যোগ্য পরিসরও, অমিতের মতো নাগরিক মানুষকেও প্রকৃতি-প্রভাব স্বীকার করতে হয়েছে। প্রকৃতি-প্রসঙ্গের এ সব ধরণ নিয়ে নতুন কিছু বলার নেই। শুধুমাত্র উল্লেখ করতে চাই 'আকাশ' প্রসঙ্গটির কথা, *যোগাযোগ*-এর মতো এ উপন্যাসেও প্রসঙ্গটি বারবার এসেছে, তবে ক্ষেত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন, লাবণ্য-প্রসঙ্গে অমিতের ভাবনায় বাচনে যখন 'আকাশ' শব্দটি ঘুরে ঘুরে আসে, তখন তার ভালোবাসাকে বন্ধনহীন গ্রন্থি বলে সহজেই চিনে নেওয়া যায়। অমিতের জীবনে

লাবণ্যের আবির্ভাব যেন পৃথিবীর কক্ষপথে 'অজানা আকাশ থেকে চাঁদ এসে পড়া', তাকে নাম ধরে এমন-ভাবে ডাকা হবে, যাতে সে ডাক আকাশের রঙিন মেঘে পৌঁছে যায়, 'আকাশের সমস্ত আলো যেন লাবণ্যের মধ্যেই প্রতিবিম্বিত হয়, তাকে না-জানাটা অমিতের জীবনে ছিল যেন এক প্রকাণ্ড কালো গর্ত, জানার পূর্ণতায় সেটি কানায় কানায় ভরে উঠেছে, আর তাতে 'সমস্ত আকাশের ছায়া' পড়েছে। লাবণ্যের প্রেমাবেগের অন্তঃবাচনেও 'আকাশ' প্রসঙ্গ আসে, কিন্তু সেভাবে হয়ত রবীন্দ্র-উপন্যাসে সর্বত্রই 'আকাশ' প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য মনে হয়, কথকের একটি দৃশ্যবর্ণনায় 'আকাশ' প্রসঙ্গ যেভাবে এসেছে। দৃশ্যটি অমিত-লাবণ্যের মিলনদৃশ্য। দুজনে হাতে হাত ধরে ঘন বনের মধ্যে এমন এক স্থানে এসে দাঁড়ায় 'আকাশ যেখানে পাহাড়ের নজরবন্দি থেকে একটুখানি ছুটি পেয়েছে', অমিত লাবণ্যের মুখটি বুকে টেনে নিয়ে উপরে তুলে ধরল'— এইটুকু বিবরণ দিয়ে বাকি যা বলার তা আকাশছবি দিয়েই বলে দিয়েছেন কথক—'আকাশে সোনার রঙের উপর চুনি-গলানো পান্না-গলানো অন্যের আভাসগুলি মিলিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে; মাঝে মাঝে পাতলা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সুগভীর নির্মল নীল, মনে হয় তার ভিতর দিয়ে, যেখানে দেহ নেই শুধু আনন্দ আছে, সেই অমর্ত্যজগতের অব্যক্ত ধ্বনি আসছে।' ভালোবাসায় দেহ থেকে দেহের সীমা পার হয়ে-যাওয়া এই আকাশছবি যেভাবে প্রকাশ করেছে, ভাষায় তা সম্ভব ছিল না। পরম মুহূর্তের সমাপনও বর্ণিত হল অসামান্য এক আকাশছবি দিয়েই— 'সেই খোলা আকাশটুকু, রাত্রিবেলায় ফুলের মতো, নানারঙের পাপড়িগুলি বন্ধ করে দিলে।'

শেষ তিনটি উপন্যাসে প্রকৃতি-প্রসঙ্গকে কোনো বিশেষ তাৎপর্যে আর ব্যবহার করেন নি রবীন্দ্রনাথ। বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ যে একেবারেই অননুসরিত, তার নানা কারণের মধ্যে একটি সম্ভবত তাঁর প্রকৃতি-প্রসঙ্গের ব্যবহার। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে প্রকৃতি-প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের থেকে তার ধরণ যে কতটাই আলাদা, তা ১৯২৯-এ প্রকাশিত *যোগাযোগ*-*শেষের কবিতা*-র সঙ্গে *পথের পাঁচালী*-র তুলনা করলেই বোঝা যায়। *পথের পাঁচালী*-র অপু-দুর্গা-তারা প্রকৃতির মধ্যেই আছে, তাই শিলারের অর্থে তারা 'নাঈভ', আর *যোগাযোগে*-এর কুমু কিংবা *শেষের কবিতা*-র অমিত— তারা প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন, সেই বিচ্ছিন্নতা বোধে তারা শিলারের অর্থে 'সেন্টিমেন্টাল'। সেই বিচ্ছিন্নতাবোধের নান্দনিক আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আধুনিক কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা আমার জানা নেই।

# সাহিত্য-সমালোচক রবীন্দ্রনাথ : আত্মগঠনের যুগ

সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের জন্মকাল বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি সন্ধিক্ষণ বলা যায়। সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, সাহিত্য, জাতীয়তাবোধ— সর্বক্ষেত্রেই এসেছিল নূতনত্বের জোয়ার। আর, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার ছিল নবজাগ্রত বাংলার কেন্দ্রস্থল। সেই যুগে ও সেই পরিবারে জন্মগ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে গড়ে তুলবার যে সুযোগ পেয়েছিলেন তার স্বীকৃতি আছে তাঁরই উক্তিতে :

> ... আমি এসেছি যখন এ বাসায় তখন পুরাতন কাল সদ্য বিদায় নিয়েছে, নূতন কাল সবে এসে নামল। আমাদের পরিবার আমার জন্মের পূর্বেই সমাজের নোঙর তুলে দূরে বাঁধা-ঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল। এই নিরালায় এই পরিবারে যে স্বাতন্ত্র্য জেগে উঠেছিল সে স্বাভাবিক, মহাদেশ থেকে দূরবিচ্ছিন্ন দ্বীপের গাছপালা-জীবজন্তুরই স্বাতন্ত্র্যের মতো। (*আত্মপরিচয়, ৫*)

ঠাকুরবাড়ির এই 'স্বাতন্ত্র্য', ভাষায়, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে, আচার-ব্যবহারে সর্বত্রই প্রকাশ পেয়েছিল। নূতন ও পুরাতনের সংযোগে, প্রাচ্য শাস্ত্র ও সংস্কৃতি এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যের সম্মিলনে যে অভিনবত্বের উদ্‌বোধন হল, জন্মাবধি রবীন্দ্রনাথ তাতেই হয়েছিলেন অভিস্নাত। পিতা স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও তাঁদের সহচরদের সান্নিধ্য কবির মানস-জীবন গঠনের সহায়ক হয়েছিল। কবির সাহিত্য রচনার স্বাভাবিক প্রবণতার সঙ্গে সঙ্গে সুযোগও মিলেছিল জীবনের অতি প্রত্যুষেই। 'ঘরের কোণে' আপন মনে যে রচনার সূত্রপাত হল তা 'বালকের যা-তা ভাবের এলোমেলো কাঁচা গাঁথুনি' দিয়ে গড়া; 'ভাষায় ও ভাবের অপরিণতি পদে পদে।' তবুও এই অপরিণতি নিয়েই দুঃসাহসিক অভিযানে সবেগে বেরিয়ে পড়েছিলেন পরিণতির পথে।

অপরপক্ষে, সমকালীন যুগপরিচয়-সূত্রে তথা বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিম প্রমুখ সেকালের সাহিত্য-নেতাদের বিস্তৃত প্রভাবের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেন :

> 'I was born in 1861. That is not an important date of history, but it belongs to a great epoch in Bengal, .... Bankimchandra Chatterjee, who though much older than myself was my contemporary and lived long enough for me to see him, was the first pioneer in the literary revolution which happened in Bengal about that time .... He lifted the dead weight of ponderous forms from our language and with a touch of his magic wand aroused our literature from her age-long sleep.' ('Religion of an Artist')

বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব এবং সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নানা জায়গাতেই বলেছেন এই কথা। তাঁর সুপরিচিত 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধের একটি উক্তিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : 'বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃদ্‌পদ্ম সেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল। ... বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।' শুধু বঙ্কিম নন, মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র,

বিহারীলাল চক্রবর্তী প্রমুখ সাহিত্যিকরাও সে যুগে আবির্ভূত হয়ে বাংলা কাব্য, নাটক, ভাষা, ছন্দ সর্বক্ষেত্র নূতন নূতন দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন, আনলেন অভিনবত্বের জোয়ার। আর, তার ঢেউ-এ আন্দোলিত হল কিশোর রবীন্দ্রচিত্ত। সকল সাহিত্যিকের সাহিত্য-রসধারা আত্মস্থ করে স্বকীয় শক্তিতে নিজেকে করে তুললেন সমৃদ্ধ। কবি একাধারে লিখে চললেন কবিতা, নাটক, গল্প, প্রবন্ধ, গান। এই আত্মশক্তির বলে কখনো-বা তিনি সমকালীন সাহিত্যের প্রতিবাদীও হয়ে উঠলেন। কবি দৃপ্তকণ্ঠে বলবার শক্তি অর্জন করলেন, 'কালের প্রস্তরপটে লিখিব অক্ষয় নিজনাম।'

তাঁর সমালোচক-প্রতিবাদী সত্তাটির সূচনা হয়েছিল জীবনের অতি প্রত্যুষেই *জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব* ও *ভারতী* পত্রিকার যুগ থেকে। তাঁর স্বকীয় চিন্তাভাবনা, বুদ্ধিবিচার এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সাহিত্যক্ষেত্রে অবাধ বিচরণের পরিচয় রয়েছে প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী'তে, দ্বিতীয় প্রবন্ধ মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনায় এবং তারপর একে একে গিরিশচন্দ্রের নাটক, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর রচনার প্রতিবাদে ও বৈষ্ণব পদাবলি-সংকলনের বিষয়ে আলোচনার ধারায়। *জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব* পত্রিকায় প্রকাশিত (১২৮৩ কার্তিক) 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী' নামক সমালোচনা-প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের চিন্তাশক্তির বিশিষ্টতা ও বৈচিত্র্যে তথা প্রকাশকালের দিক থেকে সর্বাগ্রগণ্য। *জীবনস্মৃতি*-তে এই প্রবন্ধ রচনা সম্বন্ধে বলেছেন, 'খুব ঘটা করিয়া লিখিয়াছিলাম, খণ্ডকাব্যেরই বা লক্ষণ কী, গীতিকাব্যেরই বা লক্ষণ কী, তাহা অপূর্ব বিচক্ষণতার সহিত আলোচনা করিয়াছিলাম।'

রবীন্দ্রনাথের অতি অল্প বয়সেই সংস্কৃত ও ইংরেজি সাহিত্য পাঠের যে বিপুল ভূমিকা গঠিত হয়েছিল এই প্রবন্ধে তার দৃষ্টান্ত প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। এছাড়া যে ইতিহাস-জিজ্ঞাসা কবিচিত্তের অন্যতম বিষয় ছিল তারও প্রথম আবির্ভাব এই প্রবন্ধেই। বাঙালি কর্মকীর্তিহীন দুর্বলজাতি, ঐতিহাসিক গৌরবে বঞ্চিত এবং এই নিবীর্যতার কারণ প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জলবায়ুর প্রভাব— এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙালির বাহুবল' প্রবন্ধ ও আরও অন্যান্য রচনা ছিল লেখকের প্রেরণাস্থল। এছাড়া আছে ফরাসি-বিপ্লবের কথা। অপরদিকে, কী কারণে 'প্রেমপ্রধান বৈষ্ণবধর্ম বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছে ও আধিপত্য লাভ করিয়াছে'— এই চিন্তাও করেছেন এই বালক সমালোচক। তাঁর পরবর্তীকালের বহু ভাবনার বীজ উপ্ত হয়েছিল প্রবন্ধটিতে। এইসব কারণে রবীন্দ্র-সমালোচনার ইতিহাসে প্রবন্ধটির একটি বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট করা যায়। আলোচিত কাব্যতিনটির কবিত্রয়ও (যথাক্রমে নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায় ও হরিশচন্দ্র নিয়োগী) প্রবন্ধটির জন্যই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

পরবর্তী কঠোর সমালোচনা *মেঘনাদবধ-কাব্য* প্রসঙ্গে (*ভারতী* ১২৮৪)। *মেঘনাদবধ কাব্য*-এর দ্বিতীয় সমালোচনাটি প্রকাশিত হয় প্রথমটির পাঁচ বৎসর পরে (*ভারতী* ১২৮৯)। মধুসূদনের এই কাব্য বালকের একেবারেই মনঃপূত হয় নি। তাঁর স্পষ্ট উক্তি, 'মেঘনাদবধ কাব্যে ঘটনার মহত্ত্ব নাই, একটা মহৎ অনুষ্ঠানের বর্ণনা নাই। তেমন মহৎ চরিত্রও নাই। একটি মহৎ চরিত্র হৃদয়ে আপনা হইতে আবির্ভূত হইলে কবি যেরূপ আবেগের সহিত তাহার বর্ণনা করেন মেঘনাদবধ কাব্যে তাহাই নাই।' তাই সিদ্ধান্তে লেখক *মেঘনাদবধ কাব্য*-কে মহাকাব্যরূপে স্বীকৃতিই দেন নি। তবে কাব্যের বিষয় বা আঙ্গিক তাঁর স্বীকৃতি না পেলেও অমিত্রাক্ষর ছন্দের নূতনত্ব ও ধ্বনি-ঐশ্বর্যকে কবি প্রথম প্রবন্ধ থেকেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে তার সার্থক বিচারও করেছেন। *ভারতী*-র ১২৮৮ মাঘ ও ১২৮৯ শ্রাবণ সংখ্যায় 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' নামে দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রথমটিতে গিরিশচন্দ্রের *রাবণবধ* ও *অভিমন্যুবধ* নাটকদুটির সমালোচনা এবং দ্বিতীয়টিতে নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের *সিন্ধুদূত* কাব্যের সমালোচনা লেখা হয়। প্রবন্ধদুটিতে রবীন্দ্রনাথের নাম না-থাকলেও নানা বহিরাঙ্গিক ও আভ্যন্তরীণ প্রমাণের সাহায্যে বোঝা যায় যে, রচনাগুলি রবীন্দ্রনাথেরই। গিরিশচন্দ্রের নাটকদুটির সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখক প্রথমেই বলেছেন যে, *মেঘনাদবধ কাব্য*-এ মধুসূদন বাঙালির চিরন্তন বিশ্বাসকে ভেঙে দিয়ে 'আমাদের বুকে কি আঘাত'ই দিয়েছেন। কিন্তু 'সুখের বিষয় এই যে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র

আমাদের প্রাণে সে আঘাত দেন নাই। কি তাঁহার *অভিমন্যুবধ* আর কি তাঁহার *রাবণবধ*— এই উভয় নাটকেই তিনি রামায়ণ ও মহাভারতের নায়ক ও উপনায়কদের চরিত্র অতি সুন্দরভাবে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন।' সর্বশেষে তিনি নাটকদুটিতে গিরিশচন্দ্র ব্যবহৃত ছন্দের বিশেষ প্রশংসা করে বলেছেন, 'ইহাতে ছন্দের পূর্ণ স্বাধীনতা ও ছন্দের মিষ্টতা উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে।'

দ্বিতীয় প্রবন্ধ *সিন্ধুদূত* কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখক কাব্যটির বিষয়বস্তুর অপেক্ষা ছন্দ বিষয়েই বিশেষ চিন্তা করেছেন এবং ছন্দ সম্বন্ধে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করেছেন। 'ভাষার উচ্চারণ অনুসারে ছন্দ নিয়মিত হইলে তাহাকেই স্বাভাবিক ছন্দ বলা যায়'— *সিন্ধুদূত* কাব্যে তার অভাব আছে। শেষপর্যন্ত তিনি রামপ্রসাদের কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করে বলেছেন, 'যদি কখনো স্বাভাবিক দিকে বাঙ্গালা ছন্দের গতি হয় তবে ভবিষ্যতের ছন্দ রামপ্রসাদের ছন্দের অনুযায়ী হইবে।'

দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন কাব্য-নাটকের বিচার করতে গিয়ে লেখক তার চিত্র, চরিত্র, কাহিনি, ছন্দ, রস— সর্ববিষয়েই তাঁর স্বকীয় অভিমত প্রতিষ্ঠা করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত ছিলেন না। এইসময়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ লেখকদের সঙ্গে মসীযুদ্ধে অবতীর্ণ হতেও দ্বিধা করেন নি, এমনই ছিল তাঁর আত্মবিশ্বাস। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁর জীবন প্রত্যুষে গুরুপদে বরণ করে নিয়েছিলেন, কিন্তু প্রয়োজনে তাঁর রচনার সমালোচনা করবার সাহসিকতাও দেখিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রেরর *কবিতা পুস্তক* নামক কবিতা-সংকলন গ্রন্থটি এই পর্যায়ে কবির অন্যতম লক্ষ্য ছিল। তিনি গ্রন্থটির অন্তর্গত পৃথ্বিরাজ-সংযুক্তার কাহিনি, আকাঙ্ক্ষা, অধঃপতন, সাবিত্রী, আদর, বায়ু, মন এবং সুখ, ললিতা, মানস প্রভৃতি অনেকগুলি কবিতারই আলোচনা করে বলেছেন, হয় অল্পবয়সের কারণে নয় অন্যান্য নানা দোষে কবিতাগুলি বিশেষত্বপূর্ণ হতে পারে নি। এ বিষয়ে তাঁর অনায়াস মন্তব্য এইরূপ : 'বঙ্কিমবাবুর *কবিতা পুস্তক* আমাদিগের ভাল লাগিল না— বঙ্কিমবাবুর কোনো গ্রন্থই যে এরূপ নীরস, নির্জীব, স্বাদগন্ধহীন— কিছুই না— হইবে, তাহা আমরা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই।' কবিতাগুলির আলোচনা করতে গিয়ে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিভিন্ন সাহিত্য থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে মাত্র সতেরো বৎসর বয়সে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নির্বিশেষে সকল সাহিত্যের সঙ্গেই যেমন তিনি পরিচিত হয়েছিলেন তেমনি তাকে যথাযথভাবে সাহিত্যসৃষ্টির কাজে প্রয়োগ করতেও তিনি বিচক্ষণ হয়ে উঠছিলেন। যে *বঙ্গদর্শন*-এর প্রভায় তাঁর 'হৃদ্‌পদ্ম' প্রথম বিকশিত হতে পেরেছিল তারই সম্পাদককে তাঁর নিকৃষ্ট লেখার জন্য যুক্তিতর্ক সহযোগে নিন্দা করার সৎসাহস দেখালেন এই প্রবন্ধে। এইভাবেই তরুণ রবীন্দ্রনাথ সেদিনকার সাহিত্যিক তথা সমালোচকদের আসরে ক্রমশ নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিচ্ছিলেন।

বিশ্বসাহিত্য ক্ষেত্রে অবাধ বিচরণের পরিচয় আমরা পেয়েছি তাঁর আত্মজীবনীতে। বিভিন্ন জাতির উদ্‌ভবের ইতিহাস ও তাদের সাহিত্য নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন অনেকগুলি প্রবন্ধে। বিদেশী কবিদের জীবনচরিত-পাঠে বিস্মিতহৃদয় এই কবি আকণ্ঠ পান করেছিলেন তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যরসসুধা। তাঁর দৃষ্টান্ত রয়েছে 'স্যাক্‌সন্ জাতি ও অ্যাঙ্গলো স্যাক্‌সন্ সাহিত্য', 'নর্মান জাতি ও অ্যাঙ্গলো নর্মান সাহিত্য', 'বিয়াত্রীচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য', 'গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ', 'পিত্রার্কা ও লরা', 'চ্যাটার্টন—বালক-কবি' প্রভৃতি প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধগুলিতে রয়েছে একাধারে বিদেশি সাহিত্যের বিভিন্ন ভাবধারা ও ভাষা-ছন্দের পরিচয়।

অপরদিকে, আমাদের দেশের বৈষ্ণব পদাবলির প্রতি রবীন্দ্রনাথ কীভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তার রসোপভোগও করেছিলেন কতখানি তা *জীবনস্মৃতি*-র পাঠকমাত্রই জানেন। একদিকে জগদ্বন্ধু মিত্রের *মহাজন পদাবলী* ও অন্যদিকে অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্রের সম্পাদিত *প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ* পড়ে বালককবি যেমন মুগ্ধ হয়েছিলেন তেমনি পদাবলি বিষয়ে সমালোচনা লেখার প্রেরণাও লাভ করেন। প্রাচীন কাব্যসংগ্রহের অন্তর্গত 'বিদ্যাপতির পদাবলি' সম্বন্ধে *ভারতী*-র পৃষ্ঠায় সমালোচনা-প্রবন্ধ লেখেন (১২৮৮)। প্রবন্ধটিতে তিনি কোনো অশ্রদ্ধা বা দাম্ভিকতা না-দেখিয়েও 'সংগ্রহে'র কিছু ভুলত্রুটি প্রদর্শন করেন। প্রাচীন কাব্য সম্পাদনা

করতে গেলে কোন্ কোন্ বিষয়ে সম্পাদকের অবহিত হওয়া উচিত তরুণ লেখক সে সম্বন্ধে নির্দেশও দিয়েছিলেন। দেখা যাচ্ছে, রসবিচার ও ভাষা-ছন্দ বিচারের সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদনা পরিচালনা বিষয়েও তিনি ছিলেন সচেতন। কবিচিত্তে এ-ও হয়ত *বঙ্গদর্শন*-সম্পাদকেরই পরোক্ষ প্রভাব!

১২৮৮ ও ১২৮৯ সালে *ভারতী*-র দুটি সংখ্যায় যথাক্রমে 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি' এবং 'বসন্তরায়' নামে দুটি প্রবন্ধ প্রকাশ হয়। দুটিতেই তিনি বৈষ্ণব কবিতার সৌন্দর্য ও রসবিচার করেছেন। প্রথমটির আলোচনার ভাষা ও ভঙ্গি অনেকটাই বঙ্কিমের চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনার অনুসারী। দ্বিতীয়টিতে কবি নিজে বিদ্যাপতির সঙ্গে বসন্তরায়ের তুলনা করে অতি সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত সমালোচনা লিখলেন। তরুণ কবির চোখে বসন্তরায়কে বিদ্যাপতি অপেক্ষা সহজ, স্বাভাবিক ও শ্রেষ্ঠ মনে হয়েছিল। বৈষ্ণব পদাবলির এই রসবিচারের অনুরণন চলেছিল তাঁর দীর্ঘ সাহিত্যজীবনপথে।

সাহিত্যে ইংরেজি বা দেশীয় সাহিত্যের প্রভাব এবং উপাদান কতখানি গ্রহণীয় বা বর্জনীয় এই নিয়ে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে ভারতীয় পৃষ্ঠায় চলেছিল উত্তর-প্রত্যুত্তরের পর্ব। অক্ষয় চৌধুরীর 'দেশজ প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি' নামক প্রবন্ধ প্রকাশ (*ভারতী* ১২৮৯) হলে রবীন্দ্রনাথ এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হন যে, সাহিত্যই হোক, আর সমাজই হোক কোনো আলোচনাতেই আতিশয্য থাকা উচিত নয়। সবকিছুকেই পূর্ণাঙ্গরূপে দেখা দরকার। কারণ, অত্যুক্তিতে সত্য হয় নষ্ট, সুন্দর হয় অসুন্দর। তাই বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের উপকরণ যেটুকু বাংলাদেশের উপযোগী— সেটুকু গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। তাতে সাহিত্য সর্বাঙ্গসুন্দর হতে পারে।

বোঝা যাচ্ছে, সাহিত্যরচনায় সংযম ও ভারসাম্য রক্ষার বিষয়েও তিনি ছিলেন সচেতন। তখন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যত লেখা প্রকাশিত হত, সব বিষয় নিয়েই তিনি চিন্তা করতেন। অত অল্প বয়সেই তাঁর চিন্তাধারা কত বিচিত্র পথগামী হয়েছিল তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়! আর, সর্ববিষয়েই মন্তব্য করতে বা বক্তব্য প্রকাশ করতে তিনি দ্বিধাও করতেন না। এরপর অল্প কিছুকালের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে এক মসীযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। *জীবনস্মৃতি*-র 'বঙ্কিমচন্দ্র' অধ্যায়ে তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আমি তখন আমার কোণ ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া পড়িতেছিলাম, আমার তখনকার এই আন্দোলন কালের লেখাগুলিতে তাহার পরিচয় আছে। ... সেই লড়ায়ের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গেও আমার একটা বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। তখনকার ভারতী ও প্রচারে তাঁহার ইতিহাস রহিয়াছে। সে সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রচারিত হিন্দুধর্মের সমর্থনে *প্রচার* ও *নবজীবন* পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন। *প্রচার* পত্রের প্রথম সংখ্যায় (১২৯১ শ্রাবণ) হিন্দুধর্ম বিষয়ে এক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের 'সত্য' ও 'মিথ্যা'র প্রয়োগ সম্বন্ধে একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ 'একটি পুরাতনী কথা' নামে দীর্ঘ এক বিরুদ্ধ সমালোচনা লেখেন (*ভারতী*, ১২৯১ অগ্রহায়ণ)। রবীন্দ্রনাথ তখন আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক। অনেকেই মনে করেন, ঐ শক্তিই হয়ত তাঁকে বঙ্কিমের ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করতে প্রেরণা দিয়েছিল। কারণ, তখন আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে বারেবারেই বঙ্কিমের মতামতের বিরুদ্ধাচরণ করা হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করেন, 'কোনোখানেই মিথ্যা সত্য হয় না; শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু বলিলেও হয় না; স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না।' কারণ বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, 'কৃষ্ণোক্তি স্মরণপূর্বক' 'লোকহিতার্থে' মিথ্যা বলা অন্যায় নয়।

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যে বিস্মিত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধের উত্তর দেন 'আদি ব্রাহ্মসমাজ ও নব্যহিন্দু সম্প্রদায়' প্রবন্ধে। তিনি স্থিরনিশ্চিত ছিলেন যে 'রবির পিছনে একটা বড় ছায়া দেখিতেছি'; 'বড় ছায়া' অর্থে আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব। কারণ রবীন্দ্রনাথকে তিনি স্নেহ করতেন, শ্রদ্ধাও করতেন। রবীন্দ্রনাথকে তিনি 'মহৎস্বভাব', 'সুশিক্ষিত', 'প্রতিভাশালী' এবং বিশেষ 'প্রশংসার পাত্র' বলে মনে করতেন। তাই প্রবন্ধটিতে বললেন, 'মনে করি, এ উৎস তিনি নিজে খুলেন নাই, আর কেহ খুলিয়া দিয়াছে।' এই মন্তব্য প্রকাশের পর অবিলম্বে 'কৈফিয়ৎ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখে রবীন্দ্রনাথ জানালেন যে, তিনি 'সমস্ত বঙ্গসমাজের' হয়েই ঐ কথা বলছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের প্রতি পক্ষপাতিত্ব তিনি করেন নি এবং প্রবন্ধের শেষে বিনীতভাবে নিবেদন

করলেন, 'বঙ্কিমবাবুর প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি আছে তিনি তাহা জানেন। যদি তরুণ বয়সের চপলতা বশতঃ বিচলিত হইয়া তাঁহাকে কোন অন্যায় কথা বলিয়া থাকি তবে তিনি তাঁহার বয়সের ও প্রতিভার উদারতা গুণে সে সমস্ত মার্জনা করিয়া এখনো আমাকে তাঁহার স্নেহের পাত্র বলিয়া মনে রাখিবেন। আমার সবিনয় নিবেদন এই যে আমি সরলভাবে যে সকল কথা বলিয়াছি আমাকে ভুল বুঝিয়া তাহার অন্য ভাব গ্রহণ না করেন।' নবীন সমালোচকের এ দাবি স্নেহের দাবি। প্রবীণ ও নবীন, গুরু ও শিষ্যের এই সুন্দর সম্পর্কটি অটুট রেখে সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি চেয়েছেন নিরপেক্ষ বিচার। আর, বঙ্কিমচন্দ্রও এ বিষয়ে উদারতা দেখিয়েছিলেন। স্নেহবশতই তিনি রবীন্দ্রনাথকে যেমন প্রেরণা দিয়েছিলেন তেমনি সাহিত্যসৃষ্টির দুঃসাহিক অভিযানে এগিয়ে যাবার উৎসাহ ও অধিকারও দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই কথাটি স্মরণে রেখেই *জীবনস্মৃতি*-তে বলেছেন, 'এই বিরোধের অবসানে বঙ্কিমবাবু আমাকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে— যদি থাকিত তবে পাঠকেরা দেখিতে পাইতেন, বঙ্কিমবাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।' বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে উৎসাহ ও সাহস পেয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমালোচনার ধারাটিকে সুদূরপ্রসারিত করে দেবার সুযোগও পেয়েছিলেন। পরিশেষে বলি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনপ্রভাতে একদিকে পারিবারিক পটভূমি ও অপরদিকে বঙ্কিম প্রমুখ সমকালীন বয়োজ্যেষ্ঠ সাহিত্যিকদের যে প্রভাব ও প্রেরণা অর্জন করেছিলেন সেই শক্তিতে আত্মগঠনের এক একটি সোপান অতিক্রম করলেন; পরিণতিতে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের আদর্শ স্থাপন করে নিজে হলেন চিরপ্রতিষ্ঠিত।

# রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির কাটাকুটি

## সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংশোধনের সূত্রে লেখার কাটাকুটি রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায় লেখক-জীবনের একেবারে গোড়া থেকেই। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত 'মালতী পুঁথি'র (কবির প্রায় সতেরো বছর বয়সের রচনা) পাতায় লেখার কাটাকুটির সঙ্গে মার্জিনে কিছু আঁকজোকও চোখে পড়ে। অপছন্দের কোনো শব্দ, কবিতার কোনো পঙ্‌ক্তি বা স্তবক কিংবা গদ্যরচনার বাক্য, বাক্যাংশ বা অনুচ্ছেদ যখন বর্জন করেন লেখক তখন শুধুই কেটে দিয়ে ক্ষান্তি নেই তাঁর, অনেক সময় তাতে বর্জনের চিহ্নগুলো হয়ে ওঠে বেশ জোরালো, কখনো-বা দেখা যায় মূল লেখাকে দৃষ্টির আড়াল করে দেবার চেষ্টাও। এমন হতেও পারে নতুন শব্দ সন্ধানের সময়ে অজান্তেই কলম চলে বেড়ায় পাণ্ডুলিপির এই সব বর্জিত অংশে। এ প্রবণতা চূড়ান্ত মাত্রাকে ছুঁয়েছে ১৯২৪ সালের কাছাকাছি। যার সাক্ষ্য দেয় *পূরবী* কাব্যের পাণ্ডুলিপির পাতাগুলি। এই সময়কার এবং এর পরবর্তী নানা লেখায় বর্জিত অংশই যেন দ্রষ্টব্য হয়ে উঠেছে ক্রমশ। সরল ও বক্ররেখার ঘনসন্নিবেশ, রেখাজাল, রেখার ঠাসবুনুনিতে নিশ্চিদ্র কালিমা যেন কলমের আঁচড় নয়, তুলির মসীলোপ— এ সব তো আছেই, তার সঙ্গে আরও অনেক অভিনবত্বের চমক। বর্জিত অংশের হরেক ভঙ্গিমায়— আকারের নৃত্য (dance of shape), নির্বস্তুক রূপের (abstract form) বিচিত্র ইশারা। আরও আছে কোনো কোনো সংশোধনী প্রক্রিয়ায় নির্বস্তুকতা থেকে বস্তুরূপে উত্তরণ, অন্তত তার আভাস। মাছের লেজ, পাখির ঠোঁট, সরীসৃপের বঙ্কিম অবয়ব, চতুষ্পদের দেহাংশ, মানুষের মুখ— এই সব যেন জেগে ওঠে ওই কাটাকুটির মায়াজাল থেকে। পাণ্ডুলিপির উপজাত আঁকিবুকি হয়ে ওঠে লেখার প্রতিস্পর্ধী আকর্ষণ। আমরা লেখা আর রেখার যুগ্ম রূপ দেখি খাতার পাতায়।

শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, দুনিয়া জুড়ে কত লেখক এমনি আঁকিবুকিতে মজেছেন ভাবলে অবাক হতে হয়। আমাদের পুরনো পুথিতে পাওয়া যায় এর উদ্দীপক উদাহরণ। তুলট কাগজে ইতস্তত সংশোধনকে দৃষ্টিনন্দন রূপ দেবার চেষ্টা। চিনের, জাপানের পুথিতেও মেলে এর দৃষ্টান্ত একটু অন্য ভঙ্গিমায়। টলস্টয়ের পাণ্ডুলিপির পাতা বিচিত্র সংশোধনী-রেখায় আকীর্ণ। মস্কো থেকে আনা মূল্যবান সম্পদ নিয়ে বৃটিশ মিউজিয়ামে সযত্নে আয়োজিত প্রদর্শনীতে দেখেছিলাম (মে ১৯৭৬) মনে আছে। অবনীন্দ্রনাথের বহু পুথিতে নজরে পড়বে এই চেষ্টা। হঠাৎ দেখে মনে হবে রবীন্দ্রনাথের মতোই বুঝি! কিন্তু আপাতসাদৃশ্যের মধ্যেই ধরা পড়ে যায় এদের চরিত্রের তফাৎটা। অবনীন্দ্রনাথের সৃষ্টিগুলি যেন অনেকটা দৃষ্টিসুখকর, কোমল এবং সরল। রবীন্দ্রনাথের সংশোধনীর অলংকরণ-চেষ্টার ধাতুটাই আলাদা। তাতে গতানুগতিক লালিত্য নেই। দৃষ্টিসুখকর মিষ্টি রূপ তার উদ্দিষ্ট নয়। সেগুলি কঠিন, জটিল, ভারালো, উদ্ভট। কখনো-বা ভয়-জাগানো রহস্যে ভরা। এর আর এক বৈশিষ্ট্য, অলংকরণে প্রতিসাম্য নেই অর্থাৎ সিমেট্রিক্যাল নয় তার অলংকরণের রূপ। তার মধ্যে খোঁচা ও কোণের অস্তিত্ব অথবা বহুব্যবহার মিষ্টি, গোলালো রেখার একঘেয়েমিকে ভেঙেছে। দৃঢ়তা এনেছে আলংকারিক গঠনের প্রত্যাশিত অতিমিষ্টত্বে আঘাত করে। কখনো এনেছে

অয়ি চিত্রলেখা দেবী, ক্ষম মোরে, তোমার মহিমা
যদি খর্ব করে থাকি দিতে গিয়ে বাক্যে ঘেরা সীমা,
বাক্যের অতীত তুমি। আপন প্রকাশ আপনাতে
নিয়ে সাথে নিজে দাও দেখা, বচনের মল্লিনাথে
আক্ষেপ করো না কভু। অসংকোচে যে কয়টি শ্লোক
এনেছি সম্মুখে তব, তার পানে নাই দিলে চোখ।
তোমার আশ্রয় নিল, পাখী যথা ঠাঁই লয় গাছে;
বাক্ তারা, অর্থ তব তাদের ছাড়ায়ে গিয়ে আছে॥

২১ জুলাই
১৯৩৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Lady of Lines,
these words are not an alien invasion
come to set a limit to your realm.
They are but some noisy birds
that for a moment flit across your garden
while your meaning lies far beyond their chirpings.

21/7/36

ত্রিমাত্রিকতার আভাস। নিয়ে এসেছে প্রাণের জোর। যেন তারা বানিয়ে-তোলা নয়, হয়ে-ওঠা রূপোর জ্যান্ত মূর্তি।

এই কাটাকুটি বা আঁকিবুকির মধ্যে দিয়েই শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ করে নেন তাঁর আঁকার একান্ত নিজস্ব পদ্ধতি বা শৈলি। দেখা যায় ধীরে ধীরে তাঁর রেখার এই সৃষ্টি সাহিত্যের উপজাত অংশ হয়ে না থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছে ক্রমশ স্বতন্ত্র হয়ে। রেখার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রঙ। তারপর উচ্ছ্বসিত সৃষ্টির সেই অনিবার্য প্রবাহ কাগজে, সিল্কে, কাঠের পাল্লায়, বাঁশের গায়ে, মাটির পাত্রে নিজেকে ঘোষণা করে চলেছে। ১৯২৪ থেকে যার শুরু, তার সমাপ্তি ১৯৪১-এ; অর্থাৎ জীবনের সমাপ্তিরই কাছাকাছি। জীবনের উপান্তে নতুন এক রবীন্দ্রনাথ আবির্ভূত হলেন আমাদের সামনে, যাঁর আবির্ভাব ভারতীয় চিত্রকলায় ঘটিয়ে দিল অভাবিত এক সংযোজন। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় চিত্রকলায় আধুনিকতার পুরোধা পুরুষ। কিন্তু আমাদের অন্য এক লাভ বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। নতুন এই রাবীন্দ্রিক সৃষ্টি রবীন্দ্র-সাহিত্যকে, বিশেষ করে শেষ ষোলো বছরের সাহিত্যকে বুঝতে সাহায্য করে অনেকখানি। লেখা আর রেখার যুগ্মধারা তাই রীতিমতো উদ্দীপক।
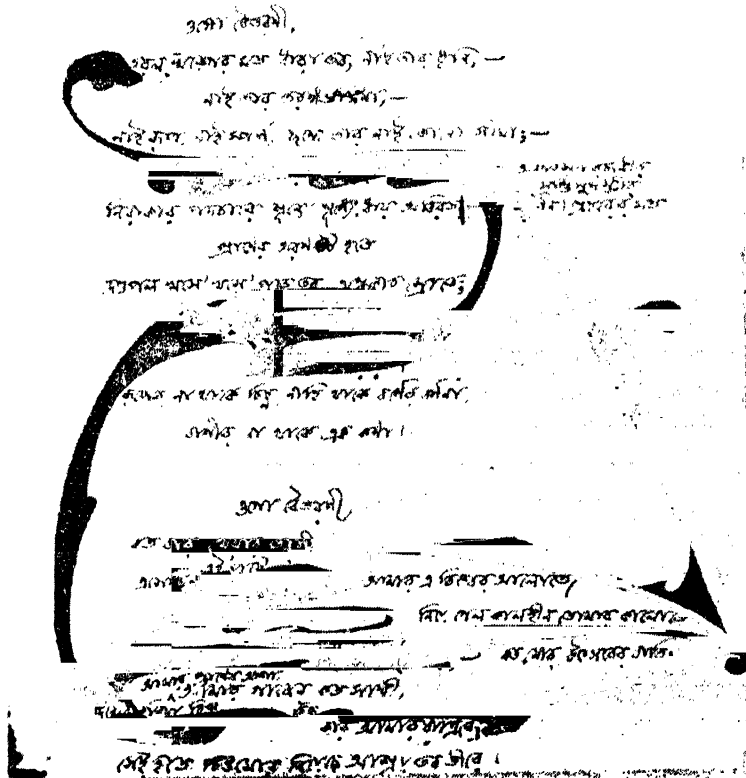
# মৃত্যু : রবীন্দ্র-কবিতায় একটি শব্দের ভাবনা

গৌতম ভট্টাচার্য

একটি শব্দ ব্যবহারে অনুষঙ্গের সন্ধান সত্যিই কি তেমন জরুরি কোনো কবির সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে? কবির রচনায় শব্দানুষঙ্গের ক্রমান্বয়ে রূপান্তর ঘটতে থাকে— এমনকি অর্থান্তর। শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা কবির বিশেষ মুদ্রালিপিও তৈরি করে অনেক সময়। হয়ত একই শব্দ সময়ান্তরে বিভিন্ন অনুষঙ্গের আবহ সৃষ্টি করে।

রবীন্দ্রভাবনার একটি স্থায়ী বিষয় মৃত্যু। আমাদের কৌতূহল হতেই পারে যে, কবে প্রথম এই শব্দটি ব্যবহাবে করলেন রবীন্দ্রনাথ? সমগ্র রবীন্দ্র-রচনায় শিরোনামে কবার এসেছে এই শব্দ? যদিও এই শব্দের সংখ্যাতত্ত্ব কৌতূহলের জন্য যথেষ্ট হলেও বিষয় ভাবনার তেমন চরিত্র ফুটে ওঠে না এখানে। সেখানে শব্দের অনুযঙ্গও প্রয়োজন। সমগ্র রবীন্দ্র-রচনায় অন্তত ন-বার শিরোনামে মৃত্যু শব্দ এসেছে। গদ্যে আছে তিন বার— 'মৃত্যু ও অমৃত' (*শান্তিনিকেতন*), 'মৃত্যুর প্রকাশ' (*শান্তিনিকেতন*) ও 'মৃত্যুশোক' (*জীবনস্মৃতি*)। কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে ছবার আছে— 'মৃত্যু' (*কণিকা*) : ওগো মৃত্যু, তুমি যদি হতে শূন্যময়, 'মৃত্যু' (*পুনশ্চ*) : মরণের ছবি মনে আনি; 'মৃত্যুর আহ্বান' (*পূরবী*) : জন্ম হয়েছিল তোর; 'মৃত্যুর পরে' (*চিত্রা*) : আজিকে হয়েছে শান্তি; 'মৃত্যুঞ্জয়' (*পরিশেষ*) : দূর হতে ভেবেছিনু মনে; 'মৃত্যুমাধুরী' (*চৈতালি*) : পরান কহিছে ধীরে।

এ-আলোচনা, মূলত রবীন্দ্রনাথের প্রথম দশটি কাব্যগ্রন্থ নিয়ে— *কবি-কাহিনী* থেকে *সোনার তরী*।

কবে প্রথম কবিতার মধ্যে 'মৃত্যু' শব্দ ব্যবহার করলেন রবীন্দ্রনাথ? যদিও *কবি-কাহিনী* তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ তবু 'মৃত্যু' সেখানে অনুপস্থিত। *বনফুল* *কবি-কাহিনী*-র পর প্রকাশিত হলেও এর রচনা আগে। *কবি-কাহিনী* প্রথম বৎসরের *ভারতী*-র (১২৮৪ সাল) পৌষ থেকে চৈত্র সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। কবির বয়স তখন ষোল বৎসর। ১৮৭৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর কবি বিলাত যাত্রা করেন। *কবি-কাহিনী* প্রকাশিত হয় ৫ নভেম্বর।

*বনফুল* রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশিত হয় ১২৮৬ সালে (৯ মার্চ ১৮৮০)। কিন্তু এ কাব্যের রচনাকাল অন্তত আরো চার বছর আগে। *জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব*, নামক মাসিকপত্রে (সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ দাস) ১২৮২ সালের অগ্রহায়ণ থেকে ১২৮৩ সালের আশ্বিন-কার্তিক পর্যন্ত ধারারাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। *বনফুল* কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ সর্গে 'মৃত্যু' শব্দ এসেছে যথাক্রমে :

> 'জননীর মৃত্যু হ'লে, ওই হোথা গাছতলে
> রাখিয়াছিলেন তাঁরে জনক তখন।' (দ্বিতীয় সর্গ)

অথবা,

> 'শুনেছি মৃত্যুর পিছু পৃথিবীর সব কিছু
> ভুলিতে হয় নাকি গো যা আছে এখানে।'

যদিও 'মরণ'-এর ব্যবহারে আছে চার বার :

'আয়—আয়—আয় তুই, আয় রে মরণ' (অষ্টম সর্গ)
'বলিতেন যার দেশে মরণ হইলে শেষে' (দ্বিতীয় সর্গ)
'ইহার অধিক আর নাইক মরণ' (ষষ্ঠ সর্গ)
'আয়—আয়—আয় তুই আয় রে মরণ' (অষ্টম সর্গ)

*বনফুল*-এই প্রথম ব্যবহৃত হল 'মৃত্যু' শব্দ।

রবীন্দ্রনাথের তেরো থেকে আঠারো বৎসর বয়সের কবিতা *শৈশব সঙ্গীত*-এ প্রকাশিত হয়েছে। *শৈশব সঙ্গীত*-এর 'প্রতিশোধ' কবিতায় 'মৃত্যু'র ব্যবহার আছে :

'দাও তার প্রতিফল—
মৃত্যু ছাড়া এই হৃদি— অনলের
নাই আর কোন জল।'

এর প্রকাশ *ভারতী* পত্রিকায় শ্রাবণ ১২৮৫-তে।

*প্রভাতসংগীত*-এর সময় কবি ভেবেছিলেন, নিজের অন্তরের দিকে চেয়ে একটা ধারণা তাঁর জেগে উঠেছিল যে, প্রতিমুহূর্তে তাঁর সমস্ত ভালোমন্দ, সুখ দুঃখের সমস্ত অভিজ্ঞতা চিরকালের মতো অনবরত একটা সৃষ্টিরূপ ধরছে। প্রকাশ-অপ্রকাশের নিত্য ওঠাপড়া নিয়ে সে সৃষ্টির স্বরূপ। কিন্তু পরক্ষণেই এ চিন্তাও অধিকার করেছিল তাঁকে, তবে মৃত্যু কী। মনে মনে এ উত্তরও তিনি পেয়েছিলেন যে, জীবন সব কিছুকে রাখে আর মৃত্যু সব কিছুকে চালায়। 'প্রতি মুহূর্তেই মরছি আমি, আর সেই মরার ভিতর দিয়েই আমি বাঁচার রাস্তায় এগোচ্ছি, যেন আমার মধ্যে সেলাইয়ের কাজ চলছে— গাঁথা পড়ছে অতীত ভবিষ্যৎ বর্তমান।' ভেবেছিলেন মুহূর্তকালীন মৃত্যুপরম্পরা দিয়ে মর্ত্যজীবন যেমন বেড়ে চলেছে প্রবালদ্বীপের মতো, তেমনি মৃত্যুর পর মৃত্যু তাঁকে নিয়ে লোক-লোকান্তরের অভিজ্ঞতার জাল বিস্তার করে চলবে।

*প্রভাতসংগীত*-এ যতই আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ার প্রতিশ্রুতি থাক, এর নেপথ্যভূমি কিন্তু মৃত্যুভাবনা। কাব্যচর্চার প্রথম পর্বে 'মৃত্যু'র চেয়ে 'মরণ'ই কবির প্রিয় শব্দ। *সন্ধ্যাসংগীত*-এর অন্ধকারে আচ্ছন্ন বিষাদ-পটভূমিতে 'তারকার আত্মহত্যা' ঘটে, উষার মুখের হাসি কেড়ে প্রাণের পাখির গান সেখানে স্তব্ধ হয়ে গেলেও 'মৃত্যু' শব্দের ব্যবহার কিন্তু মাত্র একবারই, 'পরাজয়-সংগীত' কবিতায় :

'কে জানে একী এ ভাব? শূন্যপানে চেয়ে আছি
মৃত্যুহীন মরণের প্রায়।'

এখানে 'মৃত্যু' শব্দও মৃত্যুহীন। যদিও 'মরণ' শব্দের ব্যবহার এ গ্রন্থে আছে অন্তত আট বার। এই কবিতাতেই আছে :

'মরণে করিল সমর্পণ
তাই আজ জীবনে মরণ।'

অবশ্য এ কাব্যগ্রন্থে 'মৃত' শব্দের ব্যবহার আছে :

'ঘুমাইতে ওই মৃত তারাটির পাশে' ('তারকার আত্মহত্যা')
'শতমৃত তারকার / মৃতদেহ রয়েছে শয়ান' (ওই)।

*প্রভাতসংগীত*-এ আঁধার-মুক্তির কথা আছে, আছে আলোর প্লাবনের কথা। কবি 'প্রভাতকিরণে' উন্মত্ত হয়ে আবিশ্ব ছড়িয়ে যেতে চান। সেখানে 'প্রভাত-উৎসব' ও 'অনন্ত জীবন'-এর পর 'অনন্ত মরণ' আছে।

'কোটি কোটি ছোটো ছোটো মরণেরে লয়ে
বসুন্ধরা ছুটিছে আকাশে,
হাসে খেলে মৃত্যু চারি পাশে।
এ ধরণী মরণের পথ,
এ জগৎ মৃত্যুর জগৎ।'

*প্রভাতসংগীত*-এ মৃত্যু শব্দের ব্যবহার আছে মাত্র দুবার। এবং সে শুধু ওই একটি কবিতাতেই। কিন্তু 'মরণ' শব্দের ব্যবহার আছে তেইশ বার। যেমন :

'জীবন যাহারে বলে মরণ তাহারি নাম'

অথবা,

'জয় হোক জয় হোক মরণের জয় হোক—
আমাদের অনন্ত মরণ
মরণের হবে না মরণ।' ('অনন্ত মরণ')

অথবা ওই একই কবিতায়— 'মরণের অনন্ত উৎসব।' এ ছাড়া ব্যবহার আছে— 'মরণ-গান'— 'জীবন-মাঝে উঠে ঢেউ মরণ-গান গায়।' 'মরণ-ডোর'— আমার মরণ-ডোর দিয়ে, মরণ-সংগীত— 'গাও দেব মরণসংগীত'; শুধু 'অনন্ত মরণ' কবিতায় আঠারো বার এই শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে।

*শৈশব সঙ্গীত*-এ 'প্রতিশোধ' কবিতায় আছে : 'নিভাও সে জ্বালা— নিভাও সে জ্বালা / দাও তার প্রতিফল—/ মৃত্যু ছাড়া এই হৃদি-অনলের / নাই আর কোন জল।' অথবা ওই একই কবিতায় আছে : 'আসিছে মরণ (বেলা) এই শোণিতের প্রতিশোধ নিতে / না করিবি অবহেলা। *শৈশব সঙ্গীত*-এ 'অপ্সরার প্রেম' কবিতায়ও আছে :

'কতদিন আর রহিব এমন,
মরণ হইলে বাঁচিরে এখন!'

এ সব কবিতায় মৃত্যু শুধুই শরীরের বিনাশের কথাই বলে। শুধু এ-গ্রন্থের 'উপহার' শীর্ষে যে ছোট্ট বিষাদবার্তা আছে, সেখানে আছে ভিন্নতর ব্যঞ্জনা। 'এ কবিতাগুলিও তোমাকে দিলাম। বহুকাল হইল, তোমার কাছে বসিয়াই লিখিতাম, তোমাকেই শুনাইতাম। সেই সমস্ত স্নেহের স্মৃতি ইহাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। তাই; মনে হইতেছে তুমি যেখানেই থাক না কেন, এ লেখাগুলি তোমার চোখে পড়িবেই।'

'লীলা' কবিতার শেষ লাইনে আছে, 'রণধীর যবে মরিছে জ্বলিয়া / বিজয় ঘুমায় মরণ ঘুমে! 'পথিকে'র শেষ পর্যায়েও আছে : 'সন্ধ্যার আঁধার আর শীতের বাতাসে মিলি, / সে ছন্দ হয়েছে গাঁথা মরণ কবির হাতে।' তবু মৃত্যু সেখানে ভিন্নতর অর্থবোধ তৈরি করল না।

*ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী*-তে 'মৃত্যু'র ব্যবহার একবারই :

'মৃত্যু-অমৃত করে দান
তুঁহু-মম শ্যামসমান।'

সে রচনা শুরু হয়েছে, 'মরণ রে, / তুই মন শ্যামসমান।' মৃত্যু-এবং অমৃত এখানে সংযুক্ত হয়েছে। এই পদেরই শেষে আছে :

'মাধব পহু মম, পিয় স মরণসেঁ
অব তুঁহু দেখ বিচারি।'

এই 'মৃত্যু ও অমৃত' আরও একবার ব্যবহার হয়েছিল শান্তিনিকেতন-ভাষণমালায়।

*ছবি ও গান*-এ মৃত্যু শব্দের ব্যবহার নেই একবারও। কিন্তু 'মরণ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এখানেও। 'রাহুর প্রেম' কবিতায় আছে :

'জীবনের পিছে মরণ দাঁড়ায়ে
আশার পশ্চাতে ভয়'

অথবা 'স্মৃতি-প্রতিমা' কবিতায় :

'নিবিছে সাঁঝের ভাতি, আসিছে, আঁধার রাতি
এখনি ছাইবে চারি ভিতে—
রজনীর অন্ধকারে মরণসাগর পারে।
কেহ কারে নারির দেখিতে।'

'নিশীথ জগৎ' কবিতায় আছে :

'কেহ বা শুনিছে সাড়া, উর্ধ্বকণ্ঠে নাম ধরে
ডাকিছে মরণ'
'পশিয়া হৃদয়মাঝে আশার অঙ্কুরগুলি
চলিছে চরণে'

*কড়ি ও কোমল*-এর 'বিরহীর পত্রে' 'মৃত্যু' আছে :

'মৃত্যু যেন মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যায়,
পাঠায় সে বিরহের চর।'

এরই পাশে আছে উদাসীন পৃথিবীর শূন্য খেলাঘরের কথা। হারাবার বেদনার চিরন্তন আকুতি সেখানেও নেপথ্যচর মৃত্যু।

'প্রাণ যারে প্রাণের অধিক ভালোবাসে
সেও কি রবে না এককালে।'

একই গ্রন্থে 'মঙ্গলগীতে'র ৩ অংশের শেষে আছে :

'যদি যাই, মৃত্যু যদি নিয়ে যায় ডাকি,
এই গানে রেখে যাব মোর স্নেহ-আঁখি।'

নিজের মৃত্যু অনিবার্য হলেও এ-কবিতায় মৃত্যুহীনতার প্রার্থনা আছে বার বার। এ সংগীত যেন অমরতা পায়। 'এ গান বাঁচিয়া থাকে যেন তোর মাঝে' অথবা, কবিতার শেষ দু লাইন

'যবে হায় সব গান
হয়ে যাবে অবসান
এ গানের মাঝে আমি যেন বেঁচে থাকি।'

*কড়ি ও কোমল*-এ মৃত্যু মাত্র দুবারই ব্যববার হয়েছে। যদিও 'মরণ'-এর ব্যবহার আছে আট বার। এর মধ্যে এক বার করে আছে, 'মরণ-অনল' (সেই প্রাণপরিপূর্ণ মরণ-অনল); 'মরণ-গাথা' (তাদের হৃদয়-ব্যথা তাদের মরণ-গাথা); 'মরণ বন্ধন' (প্রেম ব'লে পরিয়াছি মরণবন্ধন)। এছাড়া আছে : 'প্রাণ পেয়ে প্রাণ দিই, সে কি শুধু মরণের পায়?' ('চিরদিন'), 'ফেলে রেখে যেতে হল মরণের পার' ('ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি')। 'মৃত্যু' শব্দের একবারও ব্যবহার নেই *ছবি ও গান* অথবা প্রথম কাব্যগ্রন্থ *কবি-কাহিনী*-তে। *মানসী*-তে মৃত্যু শব্দের ব্যবহার আছে আট বার। 'দুরন্ত আশা' কবিতায় :

'অন্ধকারে সূর্যালোতে
সন্তরিয়া মৃত্যুস্রোতে
নৃত্যময় চিত্ত হতে
মত্ত হাসি টুটে।'

'মরণস্বপ্ন' কবিতায় :

'প্রাণপণে চক্ষু চাহি আঁখিতে আলোক নাহি,
বিধিতে পারে না আঁখিতারা
তুষারকঠিন মৃত্যুহিম অন্ধকার।'

অথবা,

'নতশিরে বিশ্বব্যাপী নিশা
গনিতেছে মৃত্যুপল এক দুই তিন।'

'মৃত্যু' শুধু দৈহিক বিনাশ নয়, চেতনার স্তরে মৃত্যুবোধ জীবনের বোধের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। 'দুরন্ত আশা' কবিতায় অন্ধকারে সূর্যালোতে মৃত্যুস্রোতে সাঁতার দিয়ে মৃত্যুময় চিত্তের মত্ত উল্লাসের কথা আছে। 'মরণ' শব্দ কিন্তু *মানসী*-তে আঠারো বার ব্যবহার করা হয়েছে। তার মধ্যে আছে 'প্রেম সে মরণহীন', যে সত্য *সোনার তরী*-তে সঞ্চারিত হবে। 'নিষ্ফল কামনা'য় আছে :

'সুখে দুঃখে, নিশীথে দিবসে,
বিপদে সম্পদে
জীবনে মরণে'

অথবা, 'ভৈরবী গান' কবিতায় একই সঙ্গে মৃত্যু ও মরণ :

'যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ,
সুখ আছে সেই মরণে।'

অথবা ওই কবিতায় :

'শুধু আমারি জীবন মরিল ঝুরিয়া
চিরজীবনের তিয়াষে।'

'মরণশোক' ও 'মরণভয়'ও এক বার করে ব্যবহার হয়েছে :

'মরণভয় চরণতলে
দলিত হয়ে রবে' ('দেশের উন্নতি')।

'ধর্মপ্রচার' কবিতায় আছে : 'মুছে দাও, প্রভু, মানবের আঁখি, ঘুচাও মরণশোক।'

*কবি-কাহিনী* থেকে *সোনার তরী* পর্যন্ত প্রথম দশটি কাব্য গ্রন্থে 'মৃত্যু' শব্দের ব্যবহার মাত্র আঠাশ বার। শুধু 'মৃত্যু' শব্দের ব্যবহার পনেরো বার, কিন্তু মৃত্যু-অমৃত অথবা 'মৃত্যুঞ্জয়ী' বা 'মৃত্যুপল' মাত্র একবার করে ব্যবহার করা হয়েছে :

'মৃত্যু অমৃত করে দান' (*ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী*)
'স্নেহ মৃত্যুঞ্জয়ী' (*মানসী*, 'সিন্ধুতরঙ্গ')
'গনিতেছে মৃত্যুপল এক দুই দিন' (*মানসী*, 'মরণস্বপ্ন')

*সোনার তরী*-তে 'মৃত্যু' শব্দ ব্যবহার হয়েছে দশ বার। 'মরণ' শব্দের ব্যবহার আছে বারো বার। *সোনার তরী*-তে আছে :

'মৃত্যুসম নীল নীর স্থির বিরাজে' ('হৃদয় যমুনা')
'মৃত্যু হাসে বসি। মরণপীড়িত সেই' ('যেতে নাহি দিব')
'সব-তাতে হাত দেয় মৃত্যু সর্বভুক্', ('অক্ষমা')
'ওগো মৃত্যু, ওগো প্রিয়, তবু থাকো কিছুকাল' ('প্রতীক্ষা')

'ওগো মৃত্যু, সেই লগ্নে নির্জন শয়নপ্রান্তে' ('প্রতীক্ষা')
'তবে মৃত্যু, দূরে যাও, এখনি দিও না ভেঙে' ('প্রতীক্ষা')
'বলে মৃত্যু তুমি নাই হেন গর্বকথা' ('যেতে নাহি দিব')
'ওরে মৃত্যু জানি তুই আমার বক্ষের মাঝে' ('প্রতীক্ষা')
'ওগো মৃত্যু, কেন তুই এখনি তাহার নীড়ে' ('প্রতীক্ষা')
'ওরে মৃত্যু, জানিয়াছি, তারি মাঝখানে এসে' ('প্রতীক্ষা')

*সোনার তরী*-র 'প্রতীক্ষা' কবিতা শুরুই হচ্ছে— 'ওরে মৃত্যু, জানি তুই আমার বক্ষের মাঝে / বেঁধেছিস বাসা।' অথবা ওই কবিতায় আছে— 'ওগো মৃত্যু, ওগো প্রিয়, তবু থাক্ কিছু কাল / ভুবনমাঝারে।' অথবা :

'ওগো মৃত্যু, কেন তুই এখন তাহার নীড়ে
বসেছিস এসে?
তার সব ভালোবাসা আঁধার করিতে চাস
তুই ভালোবেসে।'

কিন্তু এ কবিতার শেষে মৃত্যুকে বরবেশে আসবার আহবান জানানো হয়েছে নির্জন শয়নপ্রান্তে। কবির পরানবধূর ক্লান্ত হাত তাঁকে স্পর্শ করবে ভালোবেসে। আর তখন 'রক্তিম অধর তার নিবিড় চুম্বনদানে পাণ্ডু করি দিয়ো।'

*সোনার তরী* কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতা 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'। সেখানে *সোনার তরী*-র মধুরহাসিনী সুন্দরী নেয়ে এ কবিতার প্রতিটি স্তবকেই তার মধুর স্নিগ্ধ হাসিতে সমস্ত সন্ধানের উত্তর দিয়েছে। এমনকি যখন তাকে এ প্রশ্নও করা হয়েছে :

'এখন বারেক শুধাই তোমায়
স্নিগ্ধ মরণ আছে কি হোথায়,
আছে কি শান্তি, আছে কি সুপ্তি
তিমির-তলে?
হাসিতেছ তুমি তুলিয়া নয়ন
কথা না বলে।'

এই স্নিগ্ধ মরণ হয়ত বিনাশ নয়। সেই মধুরহাসিনী মেয়ের দেহসৌরভ বায়ুভরে উড়ে-আসা কেশের রাশির ধোঁয়া তার হৃদয়কে বিকল আর শরীরকে বিবর্ণ করছে। এ আকাঙ্ক্ষায় শুধু অঙ্গসঙ্গ বড়ো নয় সম্পূর্ণ সমর্পণের মরণান্তিক অথচ মধুর সংবেদ রয়েছে। এই সংবেদের মধ্যে রয়েছে এক অনিশ্চয়তার অনির্দেশ্য সংবাদ যা হয়ত রোম্যান্টিকতারও নিহিত প্রতিশ্রুতি।

এ আলোচনার শেষ পর্বে তাঁর প্রথম পর্বের লেখার 'মৃত্যু'র উপলব্ধির কয়েকটি কথার উদ্ধার করছি : 'এই আমার প্রথম কবিতার বই যার মধ্যে, বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং বহির্‌দৃষ্টিপ্রবণতা দেখা দিয়েছে। আর প্রথম আমি সেই কথা বলেছি যা পরবর্তী আমার কাব্যের অন্তরে অন্তরে বার বার প্রবাহিত হয়েছে—

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।'

কবির মন্তব্যের শেষে আছে :

> *কড়ি ও কোমলে*-এ যৌবনের রসোচ্ছ্বাসের সঙ্গে আর একটি প্রবল প্রবর্তনা প্রথম আমার কাব্যকে অধিকার করেছে, সে জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব। যাঁরা আমার কাব্য মন দিয়ে পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন এই মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি আমার কাব্যের এমন একটি বিশেষ ধারা, নানা বাণীতে যার প্রকাশ। কড়ি ও কোমলেই তার প্রথম উদ্ভব।
>
> ('কবির মন্তব্য', *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* দ্বিতীয় খণ্ড।)

রবীন্দ্র-কবিতার প্রথম পর্বে 'মৃত্যু' শব্দের ব্যবহারে সেই ব্যঞ্জনা পাওয়া যাবে না, যা ক্রমান্বয়ে এক দার্শনিক মাত্রাবোধের জন্ম দেবে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর *শনিবারের চিঠি*-র স্মরণ সংখ্যায় মোহিতলাল মজুমদার লিখেছিলেন 'মৃত্যুর আলোকে রবীন্দ্রনাথ' (আশ্বিন ১৩৪৮)। সেখানে সে কথাই স্পষ্ট করলেন তিনি, 'তিনি জীবনের সহিত মৃত্যুর সঙ্গতি-সাধনে উৎসুক ছিলেন। এই ভাব-সাধনায় তিনি জীবন ও মৃত্যুর অভেদ উপলব্ধি করিতেই প্রয়াস পাইতেন। কখনও বা, জীবন হইতে জীবনে আত্মার প্রয়াণ-লীলায়, মৃত্যু একটা ক্ষণচ্ছেদ মাত্র, ইহাই মনে করিয়া আশ্বস্ত হইতেন। জীবনের দেবতা যিনি, মরণের দেবতাও তিনি— ইহা না হইয়া পারে না; অতএব জীবনে যিনি এত স্নেহময়, এত সুন্দর, মরণে তিনি অন্যরূপ হইবেন কেমন করিয়া?'

# রবীন্দ্রসংগীতে পাশ্চাত্য গবেষক

## সিতাংশু রায়

রবীন্দ্রনাথের গানকে শাস্ত্রগতভাবে ভারতীয় সংগীতের অন্তর্গত করে নেওয়ার প্রথম কৃতিত্ব যাঁর, তিনি হচ্ছেন A. H. Fox Strangways। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে তাঁর অন্তত দশ বছরের ব্যাপক ও নিষ্ঠাপূর্ণ গবেষণার ফসল তাঁর অমূল্য গ্রন্থ *The Music of Hindostan*।[১] প্রধানত কণ্ঠসংগীতই তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের শাস্ত্রীয় সংগীত ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু গান ও সমগ্র ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বহু লোকসংগীতের আলোচনা তাঁর এই গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে। অনুসন্ধানের সূত্রে ভারতের বিভিন্ন সংগীতকেন্দ্রে তিনি গেছেন, থেকেছেন, সংগীতশিক্ষা ও সংগ্রহ করেছেন। যে সব জায়গায় তিনি গেছেন সেগুলির মধ্যে রয়েছে মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, মহীশূর, ত্রিচুর, ত্রিবাঙ্কুর, তাঞ্জোর, কলকাতা, এলাহাবাদ, দেরাদুন, লাহোর, ঝিলাম, ভাবনগর, পুনা ও আরো অনেক জায়গা।

শুধু আলোচনা নয়, স্টাফ-স্বরলিপিতে তিনি ধরে রেখেছেন প্রতিটি আলোচ্য গান। রবীন্দ্রনাথের বেশ কয়েকটি গানের স্টাফ-স্বরলিপি রচনা করার কৃতিত্বও স্ট্র্যাংওয়েজেরই প্রথম। গানগুলির ইংরেজি অনুবাদও তিনি সংযোজন করেছেন। কয়েকটি গানের অনুবাদ করে দিয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, আবার কিছু করেছেন উপেন্দ্রকিশোর রায়। গানগুলি কিন্তু মূল বাংলায় রোমান হরফে স্বরলিপিবদ্ধ। অর্থাৎ, অনুবাদ শুধু মানে বোঝার জন্যে, গানগুলি গাইতে হবে মূল বাংলায়।

বাংলা আর তেলুগু এই দুই ভাষাকে স্ট্র্যাংওয়েজের মনে হয়েছে ভারতের সর্বোৎকৃষ্ট সাংগীতিক ভাষা। যন্ত্রসংগীত শোনার অভিজ্ঞতাও স্ট্র্যাংওয়েজের কম হয় নি। কলকাতায় কোনো এক গুণির সুরবাহারে বাগেশ্রীর আলাপ তিনি মুগ্ধ হয়ে শুনেছেন। বহু খ্যাত অখ্যাত গুণিজনের সান্নিধ্যে তিনি এসেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সংগীতের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন গ্রন্থের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। খুবই চিত্তাকর্ষক তাঁর সাংগীতিক ডায়ারি। ভারত-ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বহু বিচিত্র সংগীতসংগ্রহ এই ডায়ারিতে একত্রিত হয়েছে।

ভারতীয়রা যে ইতিহাস লেখে না বা পড়ে না, ভারতীয় সংগীতের যে ধারাবাহিক বা কালানুক্রমিক সংরক্ষণ নেই, এতে অন্যান্য পণ্ডিতদের অভিযোগ থাকলেও স্ট্র্যাংওয়েজের অভিযোগ নেই। কেননা, ভারতের শ্রুতি-স্মৃতি, উপকথা, সংস্কার ও বিশ্বাস প্রভৃতির মধ্যে যা উপলব্ধি করা যায় তা যেন 'History crystallized', যা কিনা নথিভুক্ত ইতিহাসের চেয়ে অনেক বড়ো অথচ সংহত মূল্যবোধের ব্যাপার। গ্রন্থের ভূমিকায় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে এ কথা তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন। ইন্দ্রলোকের সংগীতসভার গন্ধর্ব অপ্সরা কিন্নর, মহাদেব-সৃষ্ট রাগ-রাগিণী, বিষ্ণু-কর্তৃক নারদের অহঙ্কারভঙ্গ, কৃষ্ণের বাঁশির মনোহারিতা প্রভৃতি উপকথার ভিতর দিয়ে নাম-না-জানা ঐতিহাসিক যুগাতীত ব্যক্তিত্বসমূহের কথাই বাহিত হয়ে আসছে। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই মানবলোকের সংগীত অলৌকেরই দান, তাকে বিকলাঙ্গ না করে সুন্দরভাবে রক্ষা করার সাধনা মানুষকেই করে যেতে হবে। এইভাবে স্ট্র্যাংওয়েজ বহু কিংবদন্তি ও জনশ্রুতির ব্যাখ্যা করেছেন।

বহু গায়ক গায়িকার গানের বর্ণনার পর রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর গানের বর্ণনাক্রমে স্ট্র্যাংওয়েজ লিখছেন :

A different kind of interest and a still greater pleasure was afforded by a visit to Rabindranath Tagore, the Bengali poet. In accordance with the best Indian tradition he is poet and musician in one. His poetry is beginning to speak to us for itself. ... To hear him sing them is to realize the music in a way that it is seldom given to a foreigner to do. The notes of the song are no longer their mere selves, but the vehicle of a personality, and as such they go behind this or that system of music to that beauty of sound which all systems put out their hands to seize.[২]

কবির গানের সুরমাধুর্য তাঁরই সাংগীতিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। জীবনে যত পূজা হল না সারা। ভৈরবী, তীব্রা (রূপক্ড়া নয়): যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে। বাউল সুর, দাদরা ; আমারে করো তোমার বীণা। খাম্বাজ, একতাল ; আমি চিনি গো চিনি তোমারে। ঝিঁঝিট, একতাল; মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখি। কাফি, একতাল প্রভৃতি গান কবি শুনিয়েছিলেন। স্ট্র্যাংওয়েজের মন্তব্য :

These and some others of his, show a securer balance and a stronger sense of rhythmical proportion than many Hindostani songs, and, without doing violence to the principles of the music, binds it in a closer grip.[৩]

বেদগান থেকে শুরু করে সব রকম ভারতীয় সংগীতের তথা রবীন্দ্রসংগীতের অন্তরে স্ট্র্যাংওয়েজ প্রবেশ করিতে পেরেছিলেন। কিছু সাংগীতিক পরিভাষার ইংরাজি প্রতিশব্দ তিনি যা যা ব্যবহার করেছেন তাতে প্রকাশ পেয়েছে ভাবের যাথার্থ্য। ঠাটকে তিনি বলছেন, array, দক্ষিণী মেলকর্তাকে বলছেন group maker, সপ্তককে বলছেন set of seven, শুদ্ধ হচ্ছে natural, আর বিকৃত chromatic ইত্যাদি। 'মূর্চ্ছ' ধাতুর অর্থ 'to increase' থেকে মূর্চ্ছনার ইংরাজি করেছেন 'swelling of sound', 'the rise and fall of voice in song'। 'রাগ' শব্দের ব্যাখ্যায় রঞ্জ, রক্তি ইত্যাদি শব্দের তাৎপর্যকে বুঝিয়ে তারপর লিখছেন :

Its usual translation is 'melody-type' or 'melody mould' or even 'tune'. If it must be translated, perhaps 'Mood' would convey as much as is comprehensible into one word.[৪]

স্ট্র্যাংওয়েজের মতে রাগের সৃষ্টি চারভাবে।—

১. আঞ্চলিক সুর থেকে : কানাড়া, মুলতান ইত্যাদি;

২. কবিকল্পনা থেকে : হিন্দোল, মেঘ, বসন্ত;

৩. সাধকের ভক্তিসংগীত থেকে : যোগিয়া;

৪. সংগীত-বিজ্ঞানীর চিন্তাপ্রসূত : যেমন সারঙ্গ (শার্ঙ্গদেবের নাম থেকে এসেছে তাঁরই সৃষ্টি হিসাবে, এ স্ট্র্যাংওয়েজের অনুমান); তবে আঞ্চলিক আদিবাসীর গানের সুরসমূহেই রাগরাগিণীর প্রধানতম উৎস বলে তাঁর ধারণা।

কলকাতার ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে স্ট্র্যাংওয়েজের যাওয়া-আসা ছিল। সেখানে 'প্রতিদিন তব গাথা' ও 'প্রথম আদি তব শক্তি' শুনে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। প্রথম গানটির সুরের নাম রয়েছে ঝিল (jhil), দ্বিতীয়টির সোহিনী। দুটি গানেরই তাল সুরফাক্তা। 'প্রথম আদি তব শক্তি' শুনে তিনি লিখছেন,

... as I heard it on their anniversary (January 25) with a choir of twelve voices supported, in unison, by a small organ and two violins, with drum, was extremely impressive.[৫]

'দুখের বেশে এসেছ বলে' গানটিকেও স্ট্র্যাংওয়েজ বলছেন, 'A hymn of the Brahma Samaj'।[৬] আবার ইমনকল্যাণের দৃষ্টান্ত হিসাবেও তিনি এই গানটি ব্যবহার করেছেন। গানটির তাল লিখছেন ঝম্প

(ঝম্পক নয়)। 'হে মোর দেবতা'— ইমনকল্যাণ, একতাল গানটিও স্ট্র্যাংওয়েজ দিয়েছেন স্বরলিপি সমেত। নানা ধরণের স্বরালঙ্কার, তাল, তালবাদ্য, সামগানের রীতিনীতি বিস্তারিতভাবে দৃষ্টান্তসহ আলোচিত হয়েছে এই গ্রন্থে। ইউরোপীয় ভাষায় রচিত নানা গ্রন্থের গ্রন্থপঞ্জিও রয়েছে।

Form আর Matter-সংক্রান্ত বিতর্কে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের অত্যধিক মতদার্ঢ্য স্ট্র্যাংওয়েজের ভালো লাগত না। তাঁর বিচারে :

> ... both the "popular" music which exalts matter at the expense of form, and the extreme "absolutism" in which the forms dwarfs the matter, depart, to some extent, from the ideal. Indian music knows perhaps less than ours of this falsehood of extremes.[৭]

স্ট্র্যাংওয়েজের গবেষণায় অনুপ্রাণিত হয়ে Herbert A. Popleyও ভারতীয় সংগীত নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যান। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষ-ব্রহ্মদেশ-সিংহলের Young Men's Christian Association-এর যৌথ জাতীয় পরিষদের কর্ণধার সেক্রেটারি। তাঁর গ্রন্থ *The Music of India*[৮] প্রকাশিত হয় কলকাতার Y.M.C.A. থেকেই ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে। *Heritage of India Series*-এর অন্তর্গত দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত হয় ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে। প্রথম সংস্করণ রচনার সময় পপ্‌লে যাঁদের সাহচর্য পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন পূর্ববর্তী গবেষক স্বয়ং ফক্স স্ট্র্যাংওয়েজ, বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, মাইলাপুর সংস্কৃত কলেজের শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, রামপুর রাজদরবারের সংগীতশিল্পী সাদৎ আলি খাঁ বাহাদুর প্রভৃতি গুণিজন। দ্বিতীয় সংস্করণ রচনার সময় সহায়তা পেয়েছিলেন লক্ষ্ণৌয়ের এস্. এন্. রতনজনকার ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যাপক পি. শাম্বমূর্তির কাছ থেকে। পপ্‌লে স্টাফ স্বরলিপির নিচে নিচে সা রে গা মা পা ধা নি-এর অনুরূপ রোমান হরফে লিখে দিয়েছেন S R G M P D N। কড়ি কোমল স্বরগুলি ছোটো হাতের অক্ষর। যথা কোমল ঋষভ = r, কোমল গান্ধার = g, কোমল ধৈবত = d, কোমল নিষাদ = n। এবং তীব্র বা কড়ি মধ্যম = m। তার সপ্তকে স্বরের উপরে মাত্রা। যথা $\bar{S}$ $\bar{R}$ $\bar{G}$ $\bar{M}$ $\bar{P}$। মন্দ্র সপ্তকে স্বরের নীচে মাত্রা। যথা $\underline{M}$ $\underline{P}$ $\underline{D}$ $\underline{N}$ ইত্যাদি।

খুব সংক্ষেপে হলেও প্রাপ্ত তথ্য থেকে পপ্‌লে ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস দিয়েছেন।[৯] এই ইতিহাসের রূপরেখা একেবারে প্রাচীন যুগ থেকে তাঁর সমকালীন যুগ পর্যন্ত। কর্ণাটক ও হিন্দুস্থানি বহু রাগরাগিণীর পরিচয় দিয়েছেন পপ্‌লে। ইংরেজ পাঠকদের সুবিধার্থে ভাতখণ্ডে-প্রবর্তিত দশটি ঠাট সুচারুভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। বন্ধনীর মধ্যে দক্ষিণী নামগুলিও দিয়েছেন (যা আমাদেরও কাজে লাগবে)। যথা :

| | | | |
|---|---|---|---|
| বিলাবল | (শঙ্করাভরণ) | মারোয়া | (গমনপ্রিয়া) |
| কল্যাণ | (কল্যাণী) | কাফি | (খরহরপ্রিয়া |
| খামাজ | (হরিকাম্বোধি) | আশাবরী | (নট ভৈরবী) |
| ভৈরব | (মায়ামালবগৌড়) | ভৈরবী | (হনুমান তোড়ি) |
| পূরবী | (কামবর্ধিনী) | টোড়ি | (শুভ পন্তুবরালী) |

সব ক্ষেত্রেই পপ্‌লে C-স্কেলকে নিয়েছেন, অর্থাৎ C-কে সা ধরেছেন, যার ফলে পিয়ানো বা অর্গ্যানের সাদা পর্দায় শুদ্ধ স্বরগুলি ও কালো পর্দায় কড়ি কোমল স্বরগুলি পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ :

Kaphi Group (Kharaharapriya) :

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | R | g | M | P | D | n | $\bar{S}$ |
| C | D | $E^b$ | F | G | A | $B^b$ | C |

Purvi Group (Kamavardhini) :

| S | r | G | m | P | d | N | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | $D^b$ | E | $F^{\#}$ | G | $A^b$ | B | C |

বিভিন্ন তাল, বিভিন্ন রচনারীতি (musical compositions), বিভিন্ন যন্ত্র ও তাদের বাদনরীতি সবই এই গ্রন্থে আলোচিত। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সংগীতের তুলনাত্মক মূল্যায়নও এই গ্রন্থে রয়েছে। এই প্রসঙ্গে পপ্‌লে রবীন্দ্রনাথের বহু মূল্যবান বক্তব্যকে উদ্ধৃত করেছেন। পপ্‌লের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়ও পাই। যেমন, ভারতীয় মেলডি ও পাশ্চাত্য হার্মনি সম্বন্ধে তিনি বলছেন :

These are two lines of development, and perhaps one has travelled as far along its line, as the other upon its line.[১০]

আরও বলছেন যে ভারতীয় রাগরাগিণীতে স্বরপ্রয়োগ প্রাচীন ঐতিহ্যের পথ ধরে সুনির্দিষ্ট পথে চলছে, পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সংগীতে রচয়িতার মুহূর্তের চাহিদা হার্মনি ও কাউন্টার-পয়েন্টের নীতি ধরে গড়ে গড়ে ওঠে। তা ছাড়া পাশ্চাত্য যেখানে জোর দিয়েছে 'tone' ও 'timbre'-এর প্রতি, সে ক্ষেত্রে ভারতীয় সংগীতের প্রধান লক্ষ্য 'execution' ও 'accuracy'.[১১]

এইবার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ভারতীয় সংগীতের যে সব স্বরলিপি পপ্‌লে করেছেন সেগুলির মধ্যে স্থান পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে' গানটি। পপ্‌লে কৃতজ্ঞচিত্তে লিখছেন :

Dr. Rabindranath Tagore was good enough to allow me to take down this song from his own singing for which I am very grateful.[১২]

স্ট্র্যাংওয়েজের মতো পপ্‌লেও গানের ইংরেজি অনুবাদ সংযোজন করেছেন ইংরেজি ভাষাভাষীর অর্থোদ্ধারের জন্যে। গানটি 'The Lyre of the Universe' শিরোনামে লিখিত। রাগের উল্লেখ রয়েছে 'Mixed Raga', তাল 'Chapu and Eka tala'। স্বরলিপির নিচে নিচে রোমান হরফে বাংলায় গানের কথাগুলি লেখা।[১৩]

Ethel Rosenthal ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করলেন *The Story of Indian Music and its Instruments*.[১৪] ত্যাগরাজার জীবনী ও সংগীত, এবং ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে কয়েকটি সর্বভারতীয় সংগীত-সম্মিলনীর বর্ণনা এই গ্রন্থের বিশেষ মূল্যবান অংশ। হিন্দুসংস্কার ও বিশ্বাসের কথা মনে রেখে লেখিকা রোজেনথাল ত্যাগরাজার জীবনালেখ্য থেকে আধিদৈবিক অংশগুলি বর্জন করতে পারেন নি। যেমন, উপাসনার সময় রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ ও আশীর্বাদলাভ, একদিন পুণ্যস্নানের পর দেবর্ষি নারদের আবির্ভাব, নারদের সামনে ত্যাগরাজার গান ও নারদের উপদেশলাভ ইত্যাদি।

আবার, তথ্যভিত্তিক ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রেও রোজেনথালের অনুসন্ধান ও আবিষ্কার কম নয়। রোজেনথাল বলছেন যে ইউরোপীয় জিপ্‌সিদের উদ্‌ভব ভারতবর্ষ থেকেই। পারস্য হয়ে জিপ্‌সিরা ইউরোপের নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। তাদের ভাষার সঙ্গে হিন্দুস্থানি ভাষার মিল রয়েছে। হাঙ্গেরির জিপ্‌সিদের গানের সুরে ভারতীয় সুরের আদল আছে। এই প্রসঙ্গে স্ট্র্যাংওয়েজের কথা আবার বলি। তিনিও রোমানি (Romany জিপ্‌সিদের ভাষা) ও হিন্দুস্থানি ভাষার মিল খুঁজে পেয়েছিলেন, হাঙ্গেরির জিপ্‌সির সুর ও তালের মধ্যে ভারতীয় ঢং প্রত্যক্ষ করেছিলেন। উপরন্তু, Lullaby বা পাশ্চাত্য ঘুম-পাড়ানি গান ভারতবর্ষ থেকে জিপ্‌সিদের কণ্ঠে কণ্ঠে মধ্যপ্রাচ্য হয়ে ইউরোপে গেছে বলে স্ট্র্যাংওয়েজের অনুমান।

রোজনথালের কথায় ফিরে আসি। তিনি পর্তুগিজ-ভারতে অর্থাৎ গোয়ায় হিন্দুস্থানি ও ইউরোপীয় সংগীতের স্বতঃস্ফূর্ত সংমিশ্রণে সৃষ্ট মনোরঞ্জক সব সুরের সন্ধান পেয়েছেন। 'Goanese orchestra' ও 'Indo-Portuguese' গাইয়ে-বাজিয়েদের গান-বাজনার চমৎকারিত্ব তার প্রমাণ। ব্রিটিশ ভারতে বল্‌-নাচের আসরে এদের খুব চাহিদা ছিল।

আরো বহুবিচিত্র তথ্য দিয়েছেন লেখিকা। মৌলা বক্সের পৌত্র সুফী এনায়েৎ খাঁ কলকাতায় ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং সেই সভায় সভাপতির আসনে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।[১৫] বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রচারে এনায়েৎ খাঁ ভারতবর্ষ, ইউরোপ ও আমেরিকার বহু অঞ্চল ঘুরেছিলেন। সংগীতের আধ্যাত্মিক শক্তিতে তিনি ছিলেন একান্তভাবে বিশ্বাসী। রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে লেখিকার উক্তি :

> Words and music are very closely united in the work of Rabindranath Tagore, and music occupies a foremost place in the curriculum of his school at Niketan— situated about two miles from Bolpur Station, near the home of the twelfth century musician, Jayadeva. Tagore frquently creates the music before the words, and the poems are born of the melodies which he conceives.[১৬]

Margaret E. Cousins ১৯১৫ থেকে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ কুড়ি বৎসর ভারতবর্ষে থাকাকালীন বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। সংগীত-বিষয়ক প্রবন্ধগুলি সংকলন করে *The Music of Orient and Occident*[১৭] নাম দিয়ে তিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের সংগীতগুণিরা পরস্পর পরস্পরের সংগীতকে উপলব্ধি করতে শিখুক, এই ছিল লেখিকার সর্বান্তঃকরণ প্রয়াস। তিনি বহুবার রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ এনেছেন এবং রবীন্দ্রনাথকে বলেছেন, 'The supreme internationalist'।[১৮] ভারতবর্ষীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে লেখিকার খুব উচ্চ ধারণা ছিল। একটি আইরিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীতের ছাত্রী ছিলেন তিনি। সেখানে সংগীতের ইতিহাসে পাঠগ্রহণকালে তিনি জেনেছিলেন যে, খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ অব্দে পিথাগোরাস ভারতভ্রমণে আসেন এবং ভারতবর্ষ থেকে প্রাপ্ত সংগীতবিদ্যাই তাঁকে পাশ্চাত্য সংগীতের রূপদান-কার্যে ও উন্নতিবিধানে সহায়তা করেছিল। লেখিকার বিচারে : 'Music is the oldest of the Arts of the Orient; it is the youngest of the Arts of the Occident'।[১৯] তাঁর আরও একটি ধারণা— ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংগীতের যথেষ্ট মিল ছিল। তার পরে তো পাশ্চাত্যে ক্রমে ক্রমে হার্মনি গড়ে উঠেছে। ভারতীয় সংগীতের মেলডির উৎকর্ষ সম্বন্ধে লেখিকা বলছেন, 'A good musician's power to develop and demonstrate the measures hidden in a simple melody-mould is a lesson in concentration and one-pointedness badly needed by the restless west'।[২০]

তবু ব্রিটিশ-ভারতে পাশ্চাত্য দেশের মতো স্কুল-কলেজে সংগীতশিক্ষার ব্যবস্থা নেই, এটাই ছিল লেখিকার আক্ষেপ। ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে সংগীতশিক্ষার প্রসার তিনি চেয়েছেন, যাতে ভারতবাসী তার নিজের সম্পদকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারে। ভারতীয় সংগীতের আধ্যাত্মিক ও মন্ময় চরিত্রের প্রতি তিনি পাঠক পাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ভারতবর্ষকে তিনি বলেছেন প্রাচ্যের হৃৎপিণ্ডস্বরূপ।

Alain Danielou (Shiva Sharan) সংগীততত্ত্বেও বিশেষভাবে উত্তর ভারতীয় সংগীততত্ত্বে একজন বিরাট পণ্ডিত। তাঁর গ্রন্থাবলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : *Introduction to the Study of Musical Scales*[২১] এবং *North Indian Music,* Vol I & II।[২২] দার্শনিক গভীরতায়, সংস্কৃত গ্রন্থরাজির সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ে, শ্রুতির সূক্ষ্ম গাণিতিক নিরীক্ষণে, রাগরাগিণীর নিখুঁত বিচারে, বহুবিধ তালের সম্যক জ্ঞানে এবং সামগ্রিকভাবে উত্তর ভারতীয় সংগীতের মর্মগ্রহণে ড্যানিয়েলু বা শিবশরণ সত্যিই অসাধারণ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংগীত-পদ্ধতি, স্কেল নির্ধারণ প্রণালী, স্বরসংস্থাপনরীতি প্রভৃতি তুলনামূলক আলোচনা তাঁর প্রথমোক্ত গ্রন্থের বিষয়। দ্বিতীয়োক্ত গ্রন্থের দুটি খণ্ডই উত্তর ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে। প্রথম খণ্ডে দৃষ্টান্তসহ ঔপপত্তির খুঁটিনাটির বিশ্লেষণ, দ্বিতীয় খণ্ডে সময়ানুসারে বিন্যস্ত রাগরাগিণীর পূর্ণ পরিচয় ও গতের স্টাফ-স্বরলিপি। দেবনাগরী অক্ষরে সংযোজিত টৌনিক-সল্‌ফা পদ্ধতির স্বরলিপিও বহুক্ষেত্রে ব্যবহৃত। রাগরাগিণীর রূপ বিশ্লেষণে দুই স্বরলিপিই একসঙ্গে উপরে-নিচে সাজানো। বারাণসীতে প্রচলিত রাগরূপই তাঁর আদর্শ। রাগরূপের ধ্যানের শ্লোকগুলি মূল সংস্কৃতে দেবনাগরী অক্ষরে ইংরেজি অনুবাদসহ লিপিবদ্ধ।

প্রাচীন ভারতের সংগীততত্ত্বে তথা দর্শনে ড্যানিয়েলুর গভীর জ্ঞান ও বিশ্বাস। তিনি বলতে চান যে, প্রাচীন ভারতে সংগীততত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব একই শব্দবিজ্ঞানের অন্তর্গত ছিল। বশিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য নারদ কাশ্যপ পাণিনি নন্দিকেশ্বর কোহল পতঞ্জলি সকলে ছিলেন একাধারে ভাষাতাত্ত্বিক ও সংগীততাত্ত্বিক। ড্যানিয়েলু স্বীকার করেন না যে, দক্ষিণভারতীয় সংগীতই ভারতীয় সংগীতের আদিরূপকে ধরে রেখেছে ও উত্তর ভারতীয় সংগীত বাইরের প্রভাবে প্রভাবিত। দক্ষিণী সংগীতকে যাঁরা প্রণালীবদ্ধ করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম সপ্তদশ শতকের বেঙ্কটমুখী। পক্ষান্তরে, উত্তর ভারতীয় সংগীত সময়ের তালে চলতে চলতে বহিরঙ্গে বিবর্তিত হতে থাকলেও অন্তরঙ্গে প্রাচীন তত্ত্বের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সংগীতের জগতে আরব পারস্য তুরস্ক প্রাচীন ভারতবর্ষের কাছেই ঋণী।

ভাতখণ্ডের মতো ড্যানিয়েলুও দশটি ঠাট বা ঘাট বা মেল সাজিয়ে দিয়েছেন। তবে দুজায়গায় তা ভাতখণ্ডে থেকে ভিন্ন। ভাতখণ্ডের আশাবরী ঠাট ড্যানিয়েলুর বিচারে জৌনপুরী ঠাট :

স র গ ম প ধ ন সঁ

কেননা, ড্যানিয়েলুর বারাণসী ঘরনার শিক্ষায় আশাবরীতে কোমল রে আবশ্যিক। আর একটি পার্থক্য, ভাতখণ্ডের পূরবী ঠাট ড্যানিয়েলুর বিচারে শ্রী ঠাট :

স র গ ম পা ধ ন সঁ

কারণ, পূরবী রাগিণীর ধা শুদ্ধ। তাই পূরবী মারোয়া ঠাটের অন্তর্গত। শুদ্ধ ধা-যুক্ত পূরবী আমরা বিষ্ণুপুর ঘরানাতেও পাই, রবীন্দ্রসংগীতেও পাই।

কয়েকটি রাগরাগিণীর ভিন্নতর রূপ আমরা ড্যানিয়েলুর গ্রন্থ থেকে পাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিভাস পা নি বর্জিত ঔড়ব জাতির রাগ, যার আরোহ অবরোহ এই রকম :

স র গ ম ধ সঁ
সঁ ধ ম গ র স

ঠাট মারোয়া, বাদী ধ, সম্বাদী গ।

রামক্রী বা রামকেলি ঔড়ব-সম্পূর্ণ জাতির ভৈরব ঠাটের রাগিণী। আরোহ অবরোহ যথাক্রমে :

স গ ম প ধ সঁ
সঁ ন ধ প ম গ র সা

বাদী পা, সম্বাদী সা।

ভাতখণ্ডে-প্রবর্তিত তীব্র মধ্যম ও কোমল নিষাদযুক্ত রামকেলি রূপও ড্যানিয়েলু অবগত, সে কথা তিনি জানিয়েছেন। ভাতখণ্ডের আশাবরী ড্যানিয়েলুর গ্রন্থে যবনপুরী তোড়ী নামে লিপিবদ্ধ। রাগমালা থেকে শ্লোক উদ্‌ধৃত করে তিনি দেখিয়েছেন যে, এই রাগিণীকে বলা হত যাবনী তোড়িকা। এর ঠাটকেও তিনি বলেছেন যবনপুরী (Yavanpuri)।

ড্যানিয়েলু ইমনের বিকল্প নামের উল্লেখ করেছেন যমুনা (Imana or Yamuna)। নামটি তিনি পেয়েছেন *রাগসাগর*-এর এই শ্লোক থেকে :

শৃঙ্গারমাতৃকাং মে মধুরিপুবামাঙ্কবাসিনীম্।
সদ্ভূষাং যমুনাং রুচিজিতযমুনাং
মনসি ধ্যায়ামি সন্ততং মৃদঙ্গীম্॥ (*রাগসাগর* ৩ : ৫৬)

ড্যানিয়েলু সারংকে বলেছেন খাম্বাজ ঠাটের রাগ, বেহাগের ঠাট নির্দেশ করেছেন কল্যাণ। বসন্তের রূপ দেখাচ্ছেন :

স গ ম ধ ন সঁ
স ন ধ ম গ ম গ র স

যার বাদী স, সম্বাদী ম। বসন্তের বিকল্প নাম বসন্তী বা বাসন্তী। নিষাদ তীব্র থেকে মাঝে মাঝে হবে তীব্রতর। দুই মধ্যমের ব্যবহারে আসবে বৈচিত্র্য। কোমল ঋষভ ও তীব্র মধ্যমের ব্যবহার সূক্ষ্মতার সৃষ্টি করবে। তান (melodic figures) শুরু হবে গান্ধার থেকে, উঠে যাবে এক দেম তারার কোমল ঋষভে। প্রতিটি স্বরের তাৎপর্যকে ড্যানিয়েলু প্রকাশ করতে চেয়েছেন এইভাবে :

র়— Very feminine, delicate and tender।

গ়— Slightly veiled, soft and tender।

ম— Calm, peace।

ম— Feminine and delicate।

ম (তীব্রতর)— Intense, active।

ধ— Soft, aspiration।

ন— Soft, pleasure loving।

ন (তীব্রতর)— Clear and sincere, acute।

এইভাবে প্রতিটি রাগরাগিণীর ক্ষেত্রেই ড্যানিয়েলু স্বরপ্রয়োগের যৌথ ও পৃথক মানসক্রিয়ার বিবরণ দেবার চেষ্টা করেছেন। সামগ্রিকভাবে বলা যেতে পারে যে, ড্যানিয়েলুর গ্রন্থ রাগসংগীতের শিক্ষার্থীদের নতুন করে প্রেরণা দেবে, চিন্তার ও সংবেদনের নানা দিক খুলে দেবে। তাঁর গবেষণার গভীরতা, বিচারের পুঙ্খানুপুঙ্খতা ও হৃদয়মনের আন্তরিকতা সত্যিই দুর্লভ। এ শুধু শুষ্ক থিয়োরি নয়, প্রয়োগকলার সঙ্গেই সম্পৃক্ত।

আরও একটি কাজের জন্যে ড্যানিয়েলু আমাদের মধ্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বিশ্বভারতী-প্রকাশিত *Janaganamana–Adhinayaka: Piano Arrangement* এবং *Janaganamana–Adhinayaka: Symphony Orchestra* তাঁরই রচনা।

ভারতবর্ষে থাকাকালীন তিনি বেনারাস হিন্দু ইউনিভার্সিটি, মাদ্রাজের আডিয়ার লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র এবং বলা বাহুল্য, বিশ্বভারতীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্যারিস ফিরে যান ও যোগদান করেন Ecole Francaise d' Extreme Oriente নামক বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে।

বিখ্যাত ডাচ্ পণ্ডিত Dr. Anrold Bake হল্যাণ্ডের Kern Institute থেকে বৃত্তি নিয়ে সস্ত্রীক বিশ্বভারতীতে এসে যোগ দেন ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে। তৎকালীন বিশ্বভারতীর সংগীত বিভাগে ভারতীয় সংগীত নিয়ে তাঁদের গবেষণা শুরু হল। রবীন্দ্রসান্নিধ্য তাঁরা অনেক বেশি পেয়েছেন এবং দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে তাঁরা বহু রবীন্দ্রসংগীত শিখেছেন। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ Niderlandische Inde, অর্থাৎ জাভা বালী যাবেন। পথিকৃৎরূপে পেলেন বাক্ ও তাঁর পত্নীকে। বলে নিই, Bake উচ্চারণটা বাক্, বাকে নয়। আমি ইউট্রেক্ট্ বিদ্যালয়ে কয়েকদিন কাটানোর সময় অনেকের কাছ থেকেই এই উচ্চারণটি জেনেছি। সে যা-ই হোক ২১ অগস্ট ১৯২৭ প্লানসিউস জাহাজ যবদ্বীপ বন্দর Tanjong Priok পৌঁছেছিল। 'শ্রীবিজয়লক্ষ্মী' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ জাহাজে বসেই লিখলেন। এর ইংরেজি অনুবাদ করে দিলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। বাক্ করলেন ডাচ্ অনুবাদ। সুমাত্রা জাভা প্রভৃতি নিয়ে এককালে বৃহত্তর ভারতের বিরাট হিন্দুরাজ্য শ্রীবিজয় ছিল। কবি লিখলেন :

> তোমায় আমায় মিল হ'য়েছে।
> কোন্ যুগে এইখানে।
> হাজার বছর ... পার হয়ে আজ
> আসি তোমার কাছে। ('জাভাযাত্রীর পত্র', *পরিশেষ*)

আরো বলি বাক্ সম্বন্ধে। ময়নাডালের কীর্তনীয়া গোবিন্দগোপাল মিত্র ঠাকুরের কাছে শুনেছি— বাক্ হিংল্যো নদীর জলে স্নান করতেন, ধুতি পরে তিলক কেটে মহাপ্রভুর মন্দিরে যেতেন, সকলের সঙ্গে আতপ অন্নের প্রসাদে মধ্যাহ্নভোজন করতেন ও নিষ্ঠাভরে মিত্রঠাকুরদের কীর্তন শুনতেন, সাধ্যমতো শিখেও নিতেন।

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুন লণ্ডনে ইণ্ডিয়া সোসাইটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-সংবর্ধনা সভায় বাক্ রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ভারতীয় সংগীতের গবেষণার জন্যে বাক্ রীতিমতো সংস্কৃত শিখেছিলেন। আর, রবীন্দ্রসংগীত শেখার সঙ্গে সঙ্গে তিনি খুব ভালোভাবেই শিখেছিলেন বাংলা।

ড. বাক্ প্রণীত *Twenty Six Songs of Rabindranath Tagore*[২৩] প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে। গ্রন্থটি দ্বিভাষিক, ফরাসি ও ইংরাজি। ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেছেন H. P. Morris, ইংরাজি অনুবাদ এক প্রস্থ করেছেন বাক্ স্বয়ং, আর এক প্রস্থ ইংরাজি অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের। উৎসর্গপত্রে বাক্ লিখছেন:

To
'The Poet'
Who has authorized this publication
and given us his constant help
And to
The Memory of
Dinendranath Tagore
who by his untiring patience
and assistance has made
this publication possible
This volume is dedicated
with our Warmest gratitude.

ছাব্বিশটি গান কীভাবে বিন্যস্ত দেখা যাক :

*গীতাঞ্জলি* থেকে :

১. তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী
২. মেঘের পরে মেঘ জমেছে
৩. আলো আমার আলো
৪. এই যে তোমার প্রেম ওগো
৫. প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী
৬. একটি নমস্কারে প্রভু

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপ ভ্রমণের সময় রচিত :

৭. সে কোন্ পাগল
৮. কার চোখের চাওয়ার হাওয়ায়
৯. ছুটির বাঁশি বাজল
১০. তোর ভিতরে জাগিয়া কে যে
১১. নাই নাই ভয়
১২. সকাল বেলার আলোয় বাজে
১৩. তুমি ঊষার সোনার বিন্দু

১৪. চাহিয়া দেখো রসের স্রোতে
১৫. আপনি আমার কোনখানে
১৬. ওগো সুন্দর, একদা কী জানি
১৭. আকাশে তোর তেমনি আছে ছুটি
১৮. বাঁশি আমি বাজাই নি

লোকসংগীত তথা মরমিয়া গায়ক বাউলদের সুর অবলম্বনে :

১৯. তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে
২০. আমারে কে নিবি ভাই
২১. এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে

পরিশিষ্ট বা Appendix

২২. গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ
২৩. জনগণমনঅধিনায়ক জয় হে
২৪. নীরবে আছ কেন
২৫. যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি
২৬. কবে তুমি আসবে।

গানগুলি মূল বাংলায়, কিন্তু রোমান অক্ষরে লেখা। বানানগুলি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের Phonetic transcrnption অনুযায়ী। যথা : Tumi kaemon kore, She kon pagal, Kar cokher cawar howay, shokalo baelar aloy baje ইত্যাদি। রোমান অক্ষরে বাংলা বানান এবং গানগুলির ইংরেজি অনুবাদে বাক্ সাহায্য পেয়েছেন অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর কাছ থেকে। প্রতিটি গান স্টাফ পদ্ধতিতে স্বরলিপিবদ্ধ করেছেন বাক্ নিজে। দিনেন্দ্রনাথের সাহচর্য পেয়েছেন অধিকাংশ গানের ক্ষেত্রে। বাক্ তাঁর গ্রন্থে বেশ কয়েকবার তাঁর পূর্ববর্তী গ্রন্থকার ফক্স স্ট্রাংওয়েজের উল্লেখ করেছেন।

স্বতঃস্ফূর্ত গান-গাওয়া সমেত রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ও বাক্ প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর কথায় :

> Tagore is fond of playing a part which recurs in all his dramas under various forms and which corresponds to the role of the poet in actual life: in a guise of a wanderer, of a grand father, of a blind musician etc, it is he who breaks all bonds, gives up all possessions and points the way to liberty, self sacrifice, joy of living in communion with the universe.

সংগীতের সুরেই দেবতার সঙ্গে মানুষের প্রেম— এই সত্য বাক্ উপলব্ধি করেছেন রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে ও শান্তিনিকেতনের সাংগীতিক পরিমণ্ডলে বাস করতে করতে।

> The Divine presence is the tune of the mystic flute or of the vibrating strings of the vina, the finest of all musical instruments. The universe is the song of the Creator, and its music is the heart-beat of the world, which makes us aware of a great communion of love and makes us yearn to melt in him.[২৪]

আবার, বাক্-এর লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে, 'জনগণমন' গানটি শুধু শান্তিনিকেতনে নয়, মাদ্রাজ ও বম্বেতেও বয়েজ-স্কাউটের গান হিসাবে প্রচলিত ছিল। এই গানের পাঁচটি স্তবকই বাক্ দিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে। এর ভাষা সংস্কৃতবহুল হওয়ায় সর্বভারতে বোধগম্য ছিল।[২৫]

'এবার তোর মরা গাঙে' গানটি সম্বন্ধে বাক্ বলেছেন, 'This folk song with its square rhythm is alomost like a marching bong.'[২৬]

*Visva-Bharati News* ও *Visva-Bharati Quarterly*-তে বাক্-এর লেখা প্রকাশিত হত। কর্মজীবনের শেষের দিকে বাক্ নিযুক্ত ছিলেন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপকরূপে। তখনও তিনি সংগীত-জগতের মূল্যবান গবেষণার কাজ করে গেছেন। যেমন *The New Oxford History of Music*[২৭] গ্রন্থের 'The Music of India' পরিচ্ছেদটি সেইসময় তিনিই লিখেছেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন জার্মান ভাষাতেও তাঁর গবেষণা-প্রবন্ধ 'Indische Musik'[২৮] প্রকাশিত হয়।

সর্বেপল্লী ড. রাধাকৃষ্ণণের অধীনে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে এলেন তরুণী দার্শনিক Peggy Holroyde। সেই সঙ্গে ভারতীয় সংগীতের মধ্যেও তিনি নিজেকে নিমজ্জিত রেখেছিলেন ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে একাদিক্রমে দুই দশক। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহু সংগীতগুণির সান্নিধ্যে তিনি এসেছিলেন এবং রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয়, বিশেষভাবে রাজেশ্বরী দত্তের মাধ্যমে। হল্‌রয়েডের গবেষণা-গ্রন্থটির নাম *Indian Music*।[২৯] রবিশঙ্কর গ্রন্থটির ভূমিকা লিখে দিয়েছেন।

দর্শনের ছাত্রী হিসাবে গবেষিকার মূল প্রতিপাদ্য ভারতীয় দর্শন, মনস্তত্ত্ব ও সৌন্দর্যদর্শন ভারতীয় সংস্কৃতির সমস্ত শাখায় এবং বিশেষভাবে সংগীতেও প্রতিফলিত 'The pulse of India throbs in the music and the dance-drama।[৩০] ভারতীয় সংগীতের অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত এসে সার্বিক সমীক্ষায় গবেষিকা বলতে চেয়েছেন যে, রবীন্দ্রনাথের নান্দনিক প্রতিভাজাত কবিতা, গান ও দর্শনে ভারতীয় সংস্কৃতির ঘনীভূত রূপটি সর্বোৎকৃষ্টভাবে ধরা পড়েছে। 'This quality of Tagore culminated in Rabindra Sangeet, his own personal statement in music of this continuing exploration of the Indian classical system.'[৩১] ভারতীয় সংগীতের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রসংগীতের এর চেয়ে বড়ো মূল্যায়ন আর কী হতে পারে?

কোনো বস্তুর স্বরূপকে সার্বিকভাবে জানতে গেলে অনেক সময় প্রয়োজন হয় তাকে অন্যের (The Other) দৃষ্টিতে দেখার। রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে পাশ্চাত্য গবেষকদের গবেষণা সেই প্রয়োজনকে মেটাতে সাহায্য করে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংগীত-সংস্কৃতির পারস্পরিক পরিচয় অতি অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। তার মধ্যে দিয়ে উপলব্ধির ক্ষমতা ও পরিধি বিস্তৃততর হতে থাকবে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির স্পর্শ আমাদের সংস্কৃতির প্রতিটি শাখার পুনর্জাগরণ ঘটিয়েছে। রূপকের ভাষায় সেই পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'সোনার কাঠি'। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলছেন যে, 'বিদেশের সোনার কাঠি যে জিনিসকে মুক্তি দিয়েছে সে তো বিদেশী নয়— সে যে আমাদের আপন প্রাণ।'[৩২]

পরিশেষে রতনদেবীর উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামীর 'গৃহস্বামিনী' ইংরেজ মেয়ে রতন দেবী সুগায়িকা ছিলেন। লন্ডনে বসে রবীন্দ্রনাথ রতন দেবীর কণ্ঠে তম্বুরা সহযোগে রীতিমতো আলাপ ও তান সমেত কানাড়া মালকোষ বেহাগ শুনে মুগ্ধ হয়ে লিখলেন, '... It seemed to me that in Ratan Devi's singing our songs gained something in feeling and truth. Listening to her I felt more clearly than ever that our music is the music of cosmic emotion।'[৩৩] রতন দেবীর গানের সপ্রশংস উল্লেখ আছে *পথের সঞ্চয়* গ্রন্থে।[৩৪] তার চেয়েও বড়ো কথা, রতন দেবীর *Thirty Indian songs/ Thirty songs from the Punjab and Kashmir* গ্রন্থের ভূমিকা বা Foreword[৩৫] লিখে দিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। স্ট্র্যাংওয়েজের গ্রন্থে প্রদত্ত Bibliography-তে রতন দেবীর এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে। রতন দেবী উত্তর ভারতীয় লোকসংগীত সংগ্রহ করেছিলেন প্রচুর, এবং অল্পদিনের জন্যে হলেও উপযুক্ত কলাবন্তের কাছে হিন্দুস্থানি সংগীতের রীতিমতো তালিম নিয়েছিলেন। সেগুলির থেকে নির্বাচিত ত্রিশটির স্টাফ-স্বরলিপি ধরা আছে তাঁর গ্রন্থে। ভারতীয় শিল্পকলা, সংগীত ও সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেবার কাজে ডাক্তার

কুমারস্বামীর দানের কথা সকলেরই জানা। রতন দেবীও ছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত। তাঁর গান রবীন্দ্রনাথের সংবেদনশীল অন্তরে প্রবেশ করতে পেরেছিল, সে কম কথা নয়।[৩৬]

## প্রসঙ্গ-নির্দেশ


১. A. H. Fox Strangways, *The Music of Hindostan*, Oxford, 1914.
২. তদেব, পৃ. ৯১-৯২।
৩. তদেব, পৃ. ৯৯।
৪. তদেব, পৃ. ১১৭।
৫. তদেব, পৃ. ১৬২।
৬. তদেব, প. ১৬৫।
৭. তদেব, পৃ. ৩৪০।
৮. Herbert A. Popley (Formerly Secretary, National Council of Y.M.C.A. of India, Burma and Ceylon), *The Music of India*, Calcutta: Y.M.C.A., 1921. 2nd Edition enlarged by the author and included in Heritage of India Series, 1950.
৯. তদেব, Chapter II : 'Legend and History', পৃ. ৭-২৬।
১০. তদেব, পৃ. ১৩২।
১১. তদেব, পৃ. ১৩২।
১২. তদেব, পৃ. ১৬৩।
১৩. তদেব, পৃ. ১৬২-৬৪।
১৪. Ethel Rosenthal, *The Story of Indian Music and its Instruments*, London, 1928. Oriental Book Reprint Corporation, New Delhi, 1980.
১৫. তদেব, পৃ. ১৫৩-৫৪।
১৬. তদেব, পৃ. ৯১।
১৭. Margaret E. Cousins, *The Music of Orient and Occident*, Madras: B. G. Paul & Co., 1935.
১৮. তদেব, পৃ. ১১।
১৯. তদেব, পৃ. ১৫।
২০. তদেব, পৃ. ২৬।
২১. Alain Danielou (Shiva Sharan), *Introducation to the Study* of Musical Scales, The India Society, London, 1943. Reprint, Oriental Books Reprint Corporation, New Delhi, 1979.
*Northern Indian Music*, Vol. I, London, 1949। যুগপৎভাবে বিশ্বভারতী থেকেও এটি প্রকাশিত ১৯৪৯ সালেই।
*North Indian Music*, Vol. II, London (under the auspices of UNESCO), 1954.
২২. Arnold A. Bake, *Twenty-six Songs of Rabindranath Tagore*, Librairie Orientaliste Paul Geuthner, Paris, 1935. Bibliotheque Musicale du Musee Guimet.
২৩. তদেব, 'Foreword', পৃ. ৩১।
২৪. তদেব, পৃ. ৩২।
২৫. তদেব, পৃ. ৩৮।
২৬. তদেব, পৃ. ৩৭।
২৭. Arnold Bake, 'The Music of India', *The New Oxford History of Music*, Vol. I, 1957, 1960, পৃ. ১৯৫-২২৭।

২৮. Arnold Bake, *Indische Musik. Die Musik in Geschichte und Gegenwart:* Allgemeine. *Encyclopädie der Musik*, Kassel, 1957.

২৯. Peggy Holroyde, *Indian Music*, George Allen & Unwin Ltd., London, 1972.

৩০. তদেব, পৃ. ২১।

৩১. তদেব. পৃ. ১০১।

৩২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সোনার কাঠি', *সবুজপত্র,* জ্যৈষ্ঠ ১৩২২, পরে *সংগীতচিন্তা*-য় সংকলিত, ২৫ বৈশাখ ১৩৯২, বিশ্বভারতী, পৃ. ৪১।

৩৩. "Foreword", *Thirty Songs from the Punjab and Kashmir* by Ratan Devi, Old Bourne Press, London, 1913; *সংগীতচিন্তা*-য় সংকলিত, পৃ. ৩২৭।

৩৪. আলোচ্য অংশটি 'সংগীত' শিরোনামে *সংগীতচিন্তা*-য় সংকলিত, পৃ. ৩৫-৩৬।

৩৫. সংগীতচিন্তা, পৃ. ৩২৪-২৮।

৩৬. সিতাংশু রায়, 'রতন দেবী প্রসঙ্গে', *সুরঙ্গমা পত্রিকা* : রবীন্দ্র-জন্মোৎসব সংখ্যা ১৩৯২, পৃ. ৪৩-৪৫; পুনর্মুদ্রণ, *সংগীতচিন্তায় রবীন্দ্রনাথ*, চয়নিকা, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ১৩১-৩৪।

# একটি হাতের ছাপ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

## সৌরীন ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথ কি এখনো প্রাসঙ্গিক? এ রকম একটা প্রশ্ন অনেক সময়ে স্পষ্ট করেই তোলা হয়। আর তার চেয়েও অনেক বেশি, অস্পষ্টভাবে এ প্রশ্ন বহুমানুষের কাছে বহুসময়ে জটিল সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। নিশ্চয়ই এমন মানুষও অনেকে আছেন যাঁরা মনে করেন রবীন্দ্রনাথ এখনো আমাদের জন্য খুব জরুরি লেখক। এরকম প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা কখনো কখনো রবীন্দ্রভক্ত ও রবীন্দ্রবিরোধী এই দুই শিবিরের কল্পনাও করে বসি। এ সব নিয়ে বাদবিতণ্ডার ইতিহাসও সুপরিচিত। সে রকম কোনো এক প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে একবার মুখ ফুটে এমন কথাও বলতে হয়েছিল, যাঁরা তাঁর লেখা পছন্দ করেন তাঁরা যদি স্তাবক হন, তাহলে যাঁরা তাঁর লেখা অপছন্দ করেন তাঁরা তবে কেন নিন্দক হবেন না। রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে এ সব প্রশ্নের যে জোর ছিল আজ নিশ্চয় আর তা নেই। তবুও রবীন্দ্রনাথের পক্ষে-বিপক্ষে এ রকমের একটা ভাবনা আজও আমাদের মধ্যে একেবারে মিলিয়ে যায় নি। কিন্তু এ সব শিবিরবিভক্ত দলাদলির ঘেরের বাইরেও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অনেক ভাবুক মানুষের অনেক রকমের সমস্যা আছে।

'আধুনিক' মনের কোনো এক ধরনের ঝোঁকের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কোনো কোনো উচ্চারণকে মনে হতে পারে সন্তধর্মী, বড়ো বেশি আধ্যাত্মিকতাময়, পরম মঙ্গল ও কল্যাণের চিন্তায় নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে আশ্রিত, সর্বব্যাপী অমঙ্গলের মধ্যেও যাঁর মনে হয় মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। এই বিগ্রহের সামনে 'আধুনিক' মন কিছুটা যেন কুণ্ঠিত। এ রকম মুহূর্তে তাঁদের অনেকের দৃষ্টি থেকে রবীন্দ্রসৃষ্টিতে নিহিত শিল্পের তীব্রতা বা শিল্পীর আর্তি কিছুটা যেন হারিয়ে যায়। আর তাঁর তথাকথিত সৃষ্টিশীল রচনাবলিকে যাঁরা যথোচিত গুরুত্ব দেন তাঁরাও চিন্তাপরিধিতে আমাদের কালের জন্য তাঁকে বড়ো বেশি বেমানান বলে মনে করেন। একালের যে মন যে কোনো রকমের বৃহৎ প্রকল্পকে সন্দেহের চোখে দেখে সে মন রবীন্দ্রনাথের মতো এক সর্বগ্রাসী প্রকল্পের মুখোমুখি হলে অস্বস্তি বোধ করবে এতে অবাক হবার কোনো কারণ নেই। খুব বড়ো প্রকল্প কিংবা পূর্ণাঙ্গ কোনো তন্ত্রের মধ্যে যে নিহিত অবিচার থাকে বা অন্তত থাকতে পারে, এ বোধ বিশ-শতকের-অভিজ্ঞতা-পেরোনো মানুষকে পীড়িত করবেই। আজকের ভাবনা জগতের একটা বড়ো অংশের ঝোঁক তাই খণ্ড প্রকল্পের দিকে। আংশিক তন্ত্রের একটা নমনীয়তার দিক আছে। তাই তার জন্য আমাদের আকর্ষণ অস্বাভাবিক নয়। আংশিক তন্ত্র প্রয়োজনমতো নিজেকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে নিতে পারে। দরকারমতো সেখানে যোগবিয়োগ করা চলে। আংশিক তন্ত্র তাই তুলনায় সহজে সময়ের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। বড়ো প্রকল্পে কালাতিক্রান্ত দোষে দুষ্ট হবার আশঙ্কা বেশি থাকে। আবার অন্যদিকে আংশিক তন্ত্রেরও সমস্যা আছে। নিতান্ত খণ্ড দৃষ্টিতে আংশিক তন্ত্রে নিবদ্ধ থাকলে পূর্ণতার বা সমগ্রতার কোনো বোধ তৈরি হতে পারে না। আক্ষরিক অর্থে পূর্ণতা, সমগ্রতা ইত্যাদি কথার তেমন কোনো মানে নেই শুধু তাই নয়, এ সব কথা খানিকটা বিপজ্জনকও বটে। তাই পূর্ণতা বা সমগ্রতা জাতীয় শব্দে কী বোঝাতে চাই সে কথায় মন দেওয়া দরকার। এখানে যে অর্থে ধারণাটিকে ব্যবহার করতে চাই তো কোনোমতেই তথ্যের স্তরের বা

এম্পিরিকাল স্তরের ধারণা নয়। অর্থাৎ কোনো একটা বিন্দুতে পৌঁছে আমরা বলতে পারব না যে, এই আমাদের পূর্ণতা পূর্ণ হল, কিংবা এই আমাদের সমগ্রতার দাবি সম্পূর্ণ করা গেল। না, ব্যাপারটা মোটেই সে রকম নয়। আমরা ভাবছি শুধু এক অতিরেকী দৃষ্টির কথা, যা খণ্ডতায় থেমে থাকে না, নির্দিষ্ট সীমায় আটকে থেকেও যা সীমার ওপারের কথা ভাবতে জানে। এ রকম একটা মেজাজে দাঁড়াতে পারলে সীমা, ভূমা, অসীম, এই জাতীয় কথা যে রবীন্দ্রনাথ প্রায় সহজ নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো বারবার উচ্চারণ করেন, তার জন্য আমাদের অস্বস্তি খানিকটা হয়ত এড়াতে পারব। নিতান্ত এম্পিরিকাল মনে এ সব ধারণার সামনে দাঁড়ালে আমাদের বিমূঢ় হবার বোধ অনিবার্য হবে।

রবীন্দ্রদৃষ্টির যে প্রাসঙ্গিকতার খোঁজে আমরা বেরিয়েছি, মনে রাখা চাই যে তা কিন্তু অমনি করে আমাদের জন্য কোথাও সাজিয়ে রাখা নেই। আমাদের সামনে আছে তাঁর সৃষ্টি। তার মধ্য থেকে ওই প্রাসঙ্গিকতা আমাদের রচনা করে নিতে হবে। আর আমাদের প্রাসঙ্গিকতার বোধ অবশ্যই আমাদের প্রয়োজন-নির্ভর। আমাদের সময়ের প্রয়োজনকে আমরা কে কীভাবে দেখছি, কোন্ প্রয়োজনকে কে কতটুকু জরুরি বলে মনে করি এ সবের সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতার বিচার নিশ্চয়ই জড়িত। অতএব আমাদের বোধ অভিপ্রায় মনোভঙ্গি এ সবের ভূমিকা যে কত বড়ো তা মেনে নিয়েই কথা সাজানোর চেষ্টা করা উচিত। তাহলে প্রশ্নটা দাঁড়াচ্ছে এ রকম : রবীন্দ্রনাথ আজও আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক কিনা, এভাবে কথাটা তুলে কোনো লাভ নেই। তাঁকে আমরা আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক করে তুলতে পারি কিনা, তুলতে চাই কিনা সেটাই বড়ো কথা। প্রাসঙ্গিকতার এই রচনাকর্ম আবার ভর দিয়ে থাকছে আমার প্রয়োজনবোধের উপর, আমাদের সময় সম্বন্ধে আমার ধারণা ও অনুভবের উপর। আমাদের প্রয়োজনবোধও তাই গড়ে তুলতে হবে বিচার-বিমর্শের মধ্য দিয়ে। কোনোটাই কোথাও সাজিয়ে-গুছিয়ে আমার জন্য তুলে রাখা নেই। প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজনবোধ এই দুই স্তরেই এই যে গড়ে তোলার কাজ তারই মধ্য দিয়ে আমরা কিন্তু আবার নিজেদেরও গড়ে তুলি, কিংবা আমরা আমাদের মতো হয়ে উঠি।

আজকের দুনিয়ায় প্রয়োজনবোধের বিচার করতে গিয়ে ব্যক্তির এই হয়ে-ওঠার সমস্যাকে আমাদের প্রস্থানবিন্দু হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এই হয়ে-ওঠার প্রশ্ন একান্তভাবে সত্তাবোধের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। প্রথম দিনের সূর্যের সেই যে অমোঘ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে দিবসের শেষ সূর্য পর্যন্ত পৌঁছে যেতে হয় সেই যাত্রাপথই ব্যক্তির হয়ে-ওঠার ইতিবৃত্ত। নিজেকে চিনতে চিনতে যাবার এই গল্পটা আমাদের জীবনবৃত্তান্তও বটে। ব্যক্তির এই আত্মপরিচয়ের উপরে আমাদের সাম্প্রতিক জীবনে যে কত রকমের আচ্ছাদনের আয়োজন করা আছে তার দিকে একবার চোখ ফেরালে দেখতে পাব যে, কীভাবে দিনে দিনে এই ব্যক্তির আত্মতা আজ গ্রস্ত। বস্তুবিশ্ব থেকে ভাবনাবিশ্ব পর্যন্ত ব্যক্তি আজ ক্রমাগত শুধু অন্যের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত। আমার জীবনযাপনের আদল নির্ধারণে আজ আমার স্বাধীন সত্তার অবকাশ নিতান্ত সংকুচিত। প্রাগাধুনিক যুগে জীবনের যে আদলটা একদিন ছিল প্রথানির্দিষ্ট, ব্যক্তির বিকাশ এক অর্থে তারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। প্রথাসম্মত সেই যূথচারী আদলকে একটু একটু করে ভাঙতে ভাঙতে ব্যক্তিবিকাশের ভাস্কর্য রূপ পেয়েছিল। তারই নাম আধুনিকতা। বিকশিত ব্যক্তিমানুষের ব্যক্তিতা আধুনিকতার প্রথম স্বীকার্য। অথচ পরিহাস এই যে, পণ্যোৎপাদন-নির্ভর আধুনিক সমাজে প্রয়োজনের সঙ্গে ভোগের সম্পর্ক ক্ষীণ হতে হতে তা যখন একদিন একেবারে ছিন্ন হয়ে যায় তখন মানুষ আত্মচ্যুত হয়ে পড়ে। আত্মচ্যুত এই মানুষ সত্তাচ্ছিন্ন। তাই সে অতি সহজে আক্রমণীয়, চতুর্দিকের বিছানো মায়াজালে সে সহজেই লুব্ধ। বিষয়ীর একান্ত সিদ্ধান্তের জোর আজ তার হাতছাড়া। আক্রান্ত এই মানুষ আজ বস্তুতে পরিণত। বিষয়ী হিসেবে এই ব্যক্তিমানুষের পুনঃপ্রতিষ্ঠা আজ অতীব জরুরি। আজকের এই আধুনিকতার সংকট আত্মপরিচয়ের সংকট।

আত্মতার প্রতিষ্ঠার পথে ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকেও প্রতিষ্ঠা দেওয়া সম্ভব হবে। আজকের যে পৃথিবী এক টানে এক পোঁচে সব রং একাকার করে দিতে চায়, সে পৃথিবীতে বিচিত্রের জন্য ছিটেফোঁটা অবকাশ খুঁজে

পাওয়াও জরুরি। এই তো আমার আজকের একুশ শতকের পৃথিবী। এই পৃথিবীর এই সময়ের আর্তি খুঁজে পেতে একবার ফিরে তাকাব এক আন্তর্জাতিক প্রতিবেদনের প্রচ্ছদভাবনার দিকে। রাষ্ট্রসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি-র (ইউনাটেড্ নেশন্স্ ডিভেলপ্‌মেন্ট্ প্রোগ্রাম, ইউ এন ডি পি) তরফে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন নামে। ২০০৪-এর প্রতিবেদনে ব্যবহার করা হয়েছে একটি হাতের ছাপ। আর তার নিচে লেখা এই কয়েকটি কথা :

Handprints. Across time, cultures and continents they carry the message, "I am".
I am my language, my symbols, my beliefs.

I am. We are.
(হাতের ছাপ। বিভিন্ন সময়, সংস্কৃতি ও মহাদেশ পেরিয়ে এই ছাপের মধ্য দিয়ে এই বার্তা বাহিত হচ্ছে, 'আমি আছি।'
আমার ভাষা, আমার প্রতীক ও আমার বিশ্বাসেই আমার আমিত্ব।
আমি আছি। আমরা আছি।)

২০০৪-এর এই প্রতিবেদনে এই স্বীকৃতি স্পষ্টভাষায় উচ্চারিত হয়েছিল যে বিভিন্ন জাতিসত্তা, ধর্ম বা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য শুধুমাত্র গণতন্ত্র কিংবা সুষম আর্থিক বৃদ্ধিই যথেষ্ট নয়। নতুন রকমের নীতি প্রণয়ন একান্ত আবশ্যক। তাতে সাংস্কৃতিক বহুত্বকে মেনে নিয়ে বৈচিত্র্যকে স্বাগত জানাতে হবে। সহজ জোরের সঙ্গে এই বিশ্বাসের ঘোষণা ছিল যে, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা এমনভাবে বিকশিত করে তোলা সম্ভব যাতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী তাদের পছন্দমতো নিজেদের ভাষায় কথা বলতে পারে, নিজেদের ধর্মাচরণ করতে পারে। এক কথায় নিজেদের মতো আপন সংস্কৃতির রূপারোপে সবাই যেন সমানভাবে অংশী হয়ে উঠতে পারে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষ যে যা তারা যেন স্বাধীন ইচ্ছায় তা-ই হয়ে উঠতে পারে। সত্তা দর্শনের স্তরে এই উচ্চারণের মধ্যে অধিবিদ্যাগত কিছু মনোভঙ্গি নিশ্চয়ই প্রচ্ছন্ন আছে। তা নিয়ে হয়ত প্রশ্ন তোলাও সম্ভব। কিন্তু এ সব কথা নিতান্ত অধিবিদ্যার কথা নয়। এইসব প্রশ্ন এবং পদ্ধতিগত আরো কিছু সংলগ্ন প্রশ্ন আমাদের একেবারে ভাত কাপড়ের প্রশ্নের সঙ্গেও জড়িত। আমাদের চারপাশের যত রকমের সমস্যা নিয়ে আমরা বিব্রত থাকি তার প্রায় সবই এই টানে আমাদের বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা কিংবা অর্থনৈতিক ইচ্ছাপূরণ কিংবা পরিবেশ সংরক্ষণ অথবা আর যা কিছু আমাদের দৈনন্দিন অস্তিত্ব বা জীবনযাপনের সঙ্গে জড়িত তার সবই এর মধ্যে চলে আসবে। সমগ্র জড়ানো জীবন নিয়েই এই এক ভাবনা। এই ভাবনায় রবীন্দ্রনাথকে আমরা কতদূর পর্যন্ত আমাদের সঙ্গী করে নিতে পারব সে অঙ্কটা আমাদের কষে বের করতে হবে।

এ কাজ আসলে এক ধরণের সাংস্কৃতিক মোকাবিলার কাজ। এই মোকাবিলার সমস্যাটা একটু বুঝে নেওয়া দরকার। আমাদের সবার জীবনেই এ রকম অবস্থা কখনো না কখনো দেখা দিয়েই থাকে। এমন এক একজন মানুষের মুখোমুখি হয়ে পড়ি আমরা যে আমাদের ভাবনাচিন্তা বা কাজকর্মের গণ্ডির মাপে তাঁকে ঠিক ধরাতে পারি না। তাঁর কথাবার্তা বা কাজকর্মও আমরা যেন ঠিক ঠাওর করে উঠতে পারি না। যাঁরা একটু ভক্ত-প্রকৃতির মানুষ তাঁরা এ রকম কোনো ব্যক্তিত্বের সামনে খুব সহজেই ভক্তিতে নিজেদের সমর্পণ করে বসেন। এরকমভাবে সন্ত, মহাপুরুষ, দেবদূত, অবতার ইত্যাদি অভিধা তৈরি হয়ে যায়। ওইসব মহাপুরুষের কাজকর্ম ও কথাবার্তার অলৌকিকত্ব বা অতীন্দ্রিয়তার উৎসও এই মোকাবিলা চেষ্টার প্রাথমিক স্তরে। এই প্রক্রিয়ায় সমস্ত বিষয়টি ক্রমে ক্রমে যুক্তি বিচার বিতর্ক, গ্রহণ বর্জন ইত্যাদির স্তর থেকে বাইরে বেরিয়ে যায়। মহাপুরুষের, সমস্ত ব্যক্তিত্বের চারধারে তখন এমন এক জ্যোতির্বলয়ের কল্পনা করা সম্ভব হয় যে ব্যক্তি হিসেবে আমার অবস্থান তখন ওই জ্যোর্তিবলয়ের ভিতরে কিংবা বাইরে। ভিতরে অবস্থিত আমি তখন প্রশ্নহীন, আর বাইরে অবস্থিত আমি প্রশ্নে অনধিকারী।

এই 'মোকাবিলা' জাতীয় শব্দ ব্যবহার করলে একটা অন্য রকমের বিপদ আছে। এই শব্দটা এমনিতে বেশ গদ্যজাতীয়। আমি ইচ্ছে করেই ব্যবহার করছি এই শব্দ। মোকাবিলা বলতে আমাদের পরিচিত পরিবেশে বেশ একটা রাজনীতির গন্ধ আছে। যেন শ্রমিক আন্দোলনের নেতারা মালিকপক্ষের মোকাবিলায় নেমেছেন, অথবা হয়তো উল্‌টোটা। মালিকপক্ষই হয়ত-বা শ্রমিক সংঘের মোকাবিলার চেষ্টা করছেন। হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে আমি এ রকম একটা, হয়ত একটু রাজনৈতিক, মেজাজেই মোকাবিলার কথা তুলছি। তুলছি, কেননা যে সাংস্কৃতিক মোকাবিলার কথা মাথায় নিয়ে আমি এগোতে চাই সেখানে বস্তুত একটা রাজনীতির প্রশ্ন আছে। আমি খোলাখুলি সে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে চাই। রাজনীতি মানে অবশ্যই দলীয় কোনো অর্থের রাজনীতির কথা উঠছে না। কিন্তু রাজনীতির যে অর্থে ক্ষমতার টানাপোড়েনের কথা আছে, কৌশলগত অবস্থানের কথা আছে, দৃষ্টিভঙ্গির ইতরবিশেষের কথা আছে, আমি সেই অর্থে এখানে রাজনীতির কথা তুলছি। প্রসঙ্গটা যেহেতু রবীন্দ্রভাবনা ও আমাদের কালের কথা, তাই এই রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে আমাদের মন সজাগ করে তুলতে হবে। তবেই আমরা সচেতনভাবে দায়িত্ব নিয়ে আমাদের নিজেদের অবস্থানে দাঁড়াতে পারব। আমার পাঠকৌশল আমার ওই অবস্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সম্পৃক্ত, কিন্তু একমুখীভাবে নির্ধারিত নয়। অর্থাৎ, আমার পাঠকৌশলও একতরফা যেমন আমার রাজনৈতিক অবস্থানকে নির্ধারিত করে দিচ্ছে না, তেমনি আমার রাজনৈতিক অবস্থানও পুরোপুরি আমার পাঠকৌশলকে বেঁধে দিচ্ছে না। এই দুই জিনিস মিলেমিশে পাঠপ্রস্তাবের একটা আদল তৈরি হচ্ছে বটে। আর সে আদলের একটা অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক মেজাজও রয়েছে। তাই খোলাখুলি প্রায় রাজনৈতিক মঞ্চের ভাষায় কথা বলছি। মোকাবিলার জন্য একটা আলোচনার টেবিলের কল্পনা করা যাক। এই টেবিলের দুধারে মোকাবিলার দুপক্ষের বসার ব্যবস্থা। কথা শুরু হবে। দুপক্ষই দুপক্ষকে বুঝে নিতে চাইবে, আলোচনা চলবে, এক ধরণের পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যেকার সমস্যা মিটিয়ে নিয়ে অপরিচয়ের সংকট কাটিয়ে তুলতে হবে। অপরিচয়ের এই সংকট যথেষ্ট পরিচিতদের মধ্যেও দেখা দিতে পারে। আমাদের জন্য রবীন্দ্রনাথই এ প্রসঙ্গে এক মোক্ষম উদাহরণ হতে পারেন। তিনি আমাদের পরিচিত অবশ্যই। নইলে এত সব রবীন্দ্রজয়ন্তী ইত্যাদি একেবারে মাঠে মারা যাবে। পরিচিত, তবে অপরিচয়ের সংকট কাটাবার পক্ষে সে পরিচয় যথেষ্ট নয়। তা যথেষ্ট অগভীর। এ অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাই বলতে হয় প্রথম প্রয়োজনটা দাঁড়াল কথা বলা। এই কথা বলতে বলতে সবটুকু যাওয়া যাবে কিনা, অর্থাৎ যে বোঝাবুঝির কথা ভাবছি তার সবটুকু ঘরে উঠবে কিনা, সে অন্য প্রশ্ন। অর্থাৎ, সফলতা বা ব্যর্থতার প্রশ্ন এখন তুলছি না। এখন প্রশ্ন আদৌ কথা বলাবলির সম্ভাব্যতা নিয়ে। তার প্রাথমিক শর্ত এক সাধারণ পারস্পরিক বোধগম্য অর্থতন্ত্র। আলোচনার টেবিলের দুপক্ষের মধ্যে যে কথা হবে, তাতে একজনের ভাষা আর এক জনকে বুঝতে হবে তো। এই বোঝার ব্যাপারটা, কিন্তু শুধু ভাষার অন্বয় স্তরে সাধিত হতে পারে না। এর জন্য ভাষার অর্থস্তরে আমাদের নজর দিতে হবে। সামাজিক সাংস্কৃতিক নানা কারণে এই অর্থতন্ত্রে ফাটল দেখা দিতে পারে। বিধবাবিবাহের বিতর্কের দিনে তাঁর প্রস্তাব রচনা করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর এ রকম ফাটলের অস্তিত্ব টের পেয়েছিলেন। তাঁকে বলতে হয়েছিল যে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত প্রমাণ হাজির করলেও কোনো কাজ হবে না, কেননা ভাষায় তর্‌জমা না করে দিলে এখনকার (অর্থাৎ তখনকার) কেউ তা বুঝবে না। অনুরূপ ফাটল বঙ্কিমচন্দ্রও টের পেয়েছিলেন *গীতা*-র অসমাপ্ত টীকা-ভাষ্য রচনার দিনে। চণ্ডালিকার মায়ের মুখেও আমরা একবার শুনেছিলাম, আমি যে তোর ভাষা বুঝি নে। এ সমস্যা কিন্তু একটা ভাষা জানা বা না-জানার সমস্যা নয়। এ হল একটা অর্থতন্ত্রে বসতি করতে পারা না-পারার কিংবা প্রবেশাধিকার পাওয়া না-পাওয়ার সমস্যা। আর এ সমস্যা কোনো একক ব্যক্তিবিশেষের সমস্যাও নয়। এর অনেকটাই কালের সমস্যা, এক ধরণের যাপনের সমস্যা। এ সমস্যার মোকাবিলাও তাই কোনো একক হাতে নেই। এ শুধু অধ্যবসায়, মেধা বা ক্ষমতা-প্রতিভার কথা নয়।

প্রশ্নটাকে কালের পরিধিতে দেখতে চাই বলেই মোকাবিলা জাতীয় রাজনৈতিক অনুষঙ্গের শব্দ ব্যবহার করেছি আমি। ব্যক্তির রুচি পছন্দ ও ঝোঁকের হাত ধরে এ ব্যাপারে খুব বেশিদূর এগোনো যাবে না। তাতে

করে ব্যক্তি উপভোগ পর্যন্ত বড়োজোর পৌঁছোনো যাবে। কিন্তু প্রাসঙ্গিকতার প্রশ্নে ব্যক্তি উপভোগের কথা খুব বড়ো কথা নয়। তা হল সময়ের প্রয়োজনের কথা। সে কথা অনেক বেশি নৈর্ব্যক্তিক। আর সময়ের প্রয়োজনের ভাবনাকে প্রশ্রয় দিলে সাংস্কৃতিক রাজনীতির স্তরে পৌঁছে যেতে হবে। প্রয়োজনকে কে কীভাবে দেখছি সেটা অবশ্যই রাজনৈতিক অবস্থানের প্রশ্ন। এ রকম নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক অবস্থান থেকে রবীন্দ্রনাথের মোকাবিলার যে প্রশ্ন তা ব্যক্তি পাঠকের হাতে সাধ্য নয়। তারই জন্য কল্পনা করে নিতে হবে এমন এক সাধারণ পাঠক সদর্থে যার উপরে কালের প্রতিনিধিত্বের ভার ছেড়ে দেওয়া যায়। 'সদর্থে' কথাটা একটু বুঝে নেওয়া যাক। এই যে প্রতিনিধিত্বের কথা বলছি এ-ও তো রাজনীতিরই কথা। আমরা সভা সমিতি সম্মেলনে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে থাকি। তিনি আমাদের প্রতিনিধিত্ব করেন মানে তো এই যে, আমাদেরই একটা প্রতিরূপ তাঁর মধ্য দিয়ে ওইসব সভা সমিতি সম্মেলনে প্রতিফলিত হয়। এই প্রতিরূপের প্রতিফলনই যদি প্রতিনিধিত্ব ধারণার মূল কথা বলে মেনে নিই, তাহলে নির্বাচন ব্যাপারটা আনুষ্ঠানিক হয়ে পড়ে। তাই নির্বাচনের কথাটা সরিয়েও নিতে পারি। সময়ের প্রয়োজন মেটাবার জন্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মোকাবিলার ভার এই প্রতিনিধি পাঠকের উপর। তাকে আমরা নাম দিতে পারি এক সাধারণ পাঠক। সদর্থে প্রতিনিধিত্ব বলতে নির্বাচনের আনুষ্ঠানিকতা বর্জিত প্রতিরূপের প্রতিফলনের কথাটা বলছি। সেই প্রতিনিধিকে নিজের দায়িত্বে বা গরজেই নিজেকে ওই প্রতিফলনের যোগ্য করে তুলতে হবে। সব পদার্থ বা বস্তু যেমন প্রতিফলনের উপযুক্ত নয়, তেমনি সব পাঠকই প্রতিনিধিত্বমূলক পাঠক হতে পারেন না। প্রতিফলন বস্তুর মতো নিজেই নিজেকে উপযুক্ত করে তুলতে হয়। নিজেকে তার জন্য অনেক ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে হতে পারে। কার হাতে কীভাবে এই ব্যাপারগুলো ঘটবে তার কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। তবে এ রকম ঘটনা যে ঘটে বা ঘটতে পারে তার নজির আমাদের চারপাশে নজর ফেরালে কখনো সখনো টের পেয়ে যেতে পারি। কিন্তু প্রশ্নটা যেহেতু শুধু ব্যক্তি স্তরের অর্জনের প্রশ্ন নয়, তাই ওই অনানুষ্ঠানিক প্রতিনিধিত্বের কথাটা মাথায় রাখা চাই। আমাদের সাধারণ পাঠকের কল্পনা সেই সাধারণ পাঠের স্তরেই করতে হবে।

এই যে সাধারণ পাঠকের কল্পনা, এঁর অবস্থান কি তবে সেই বিশেষজ্ঞ পাঠকের বিপরীতে? রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে এমন পাঠকের কথা আমরা জানি যাঁরা হয়ত তন্ন তন্ন করে রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রবীন্দ্রজীবনের খবর নেবার চেষ্টা করেছেন, রবীন্দ্রজীবনের সঙ্গে তাঁর রচনাকে মিলিয়ে নিতে চেয়েছেন, কিংবা রবীন্দ্রসৃষ্টির বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আবিষ্কার করেছেন। এই পাঠকর্ম শ্রদ্ধেয়। কিন্তু আমাদের কল্পনার সাধারণ পাঠকের জন্য তা যথেষ্ট নয়। আমাদের সাধারণ পাঠক ওই অর্থে বিশেষজ্ঞ পাঠক হয়ে উঠতেই পারেন, হলে খুবই ভালো কথা, কিন্তু শুধু সেটুকুর জোরে তিনি প্রতিরূপের প্রতিফলন হয়ে উঠতে পারবেন এমন প্রত্যাশা করা যাবে না। ওই সাধারণ পাঠক গুণগত বিচারে অন্য স্তরের ধারণা, এম্পিরিকাল স্তরে এই পাঠক কিংবা ওই পাঠকই তিনি, এ রকম সন্ধান করে কোনো লাভ হবে না। বিজ্ঞান প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি ধারণার সূত্রে আমরা এই সাধারণ পাঠকের ধারণা হয়তো আরো একটু বুঝে নিতে পারি। *বিশ্বপরিচয়* গ্রন্থের উৎসর্গ নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :

> বড়ো অরণ্যে গাছতলায় শুকনো পাতা আপনি খসে পড়ে, তাতেই মাটিকে করে উর্বরা। বিজ্ঞানচর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিসগুলি কেবলই ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারই অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এই দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে।
>
> (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ ১৩, পৃ. ৫১৯-২০।)

এই উদ্ধৃতি থেকে 'চিত্তভূমি' কথাটিকে আমি যদি বীজ ধারণা হিসেবে তুলে নিই, তাহলে বুঝতে পারব সাধারণ পাঠকের সন্ধানে কোন্ দিকে আমাকে এগোতে হবে। আর যে সাংস্কৃতিক মোকাবিলার

জন্য এতসব কথা তুলছি সে মোকাবিলাও-বা কোনো স্তরে সাধ্য তারও কিছু আন্দাজ আমরা এখানে পেয়ে যাব।

'চিত্তভূমি' কথাটিতে আমরা যদি ঠিকমতো মন দিতে চাই, তাহলে পদ্ধতির দু-একটা কথায় আমাদের মন দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমাদের বর্তমানে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে একটা ভাব এই আছে যে, তিনি এক ঋষিকল্প ব্যক্তি, সৃষ্টিনন্দনে তিনি এমনই বিভাসিত যে আমাদের পক্ষে তিনি বড়োই সুদূর। যথাবিহিত সম্মানে তিনি শুধু আমাদের প্রণম্য। কিন্তু এই ভাবই যে চিরকাল ছিল তা নয়। আমাদের রবীন্দ্রপাঠের ইতিহাসে নানারকম মানসিক বাধার কাহিনি জমে উঠেছে। এইসব বাধার ইতিহাসের জন্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মোকাবিলার কাজটা ক্রমাগত পিছিয়ে গেছে। অথচ রবীন্দ্রচর্চার ধারা আমাদের নিতান্ত ফেলনা নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওই বিভিন্ন রকমের মানসিক বাধার জন্য এক ধরণের অলীক লোকশ্রুতিনির্ভর দূরত্ব তৈরি হয়েছে ওই 'চিত্তভূমি'র স্তরে। আমরা কখনো তাঁর রচনাকে ভেবেছি 'পায়রা বকম', কখনো ভেবেছি তা বড়ো বেশি দেহাত্মবাদী, আবার কখনো ভেবেছি তা নিতান্ত অ-শরীরী। 'সোনার তরী'র মতো কবিতা নিয়েও স্থূল বস্তুবাদিতার সন্ধানে আমরা এক সময়ে তুলকালাম করেছি। তাঁকে 'বুর্জোয়া' লেখক ভেবেছি কখনো। আবার পরবর্তী কোনো সময়ে আমাদের সমস্ত সংগ্রামের পাশে তাঁকে এমনভাবে সাথী হিসেবে পেতে চেয়ে আহ্লাদ করেছি যে, আগের পর্বের বোধহীন বর্জনের সঙ্গে তার চরিত্রগত ফারাক সামান্যই। আমাদের সমকালীন পাঠাভ্যাসেও এমন এক ধরণের নিঃশব্দ পাশ কাটানো মনের পরিচয় পাওয়া যায় যে, সেখানে চিত্তভূমির স্তরে সাংস্কৃতিক মোকাবিলার কথাটাই মনে হয় অবান্তর। তাঁর কথনরীতি মোটেই নাকি আধুনিক মর্জিমাফিক নয়, তা বড়ো বেশি ফেনিল, হয়তো-বা কিছুটা জবড়জং। তাঁর গদ্যশৈলি অনর্থক অলংকৃত, তাঁর আলোচনাধর্মী রচনা আধুনিক মানদণ্ডে অগ্রাহ্য, তাঁর নাটক অনভিনেয়, তাঁর উপন্যাস নাকি শোচনীয়ভাবে তীব্রতাহীন ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব কথা লেখার সময়ে আমাদের সেইসব রবীন্দ্র-আলোচকদের কথা আমি অবশ্যই ভুলে যাচ্ছি না যাঁদের হাত ধরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থে রবীন্দ্রভুবনে আমাদের প্রবেশাধিকার ঘটেছে। অজিতকুমার চক্রবর্তী, প্রমথনাথ বিশী কিংবা নীহাররঞ্জন রায় বা আবু সয়ীদ আইয়ুব, বুদ্ধদেব বসু কিংবা শঙ্খ ঘোষ এবং হয়তো আরো কেউ কেউ। এঁদের বোধি ও মনন সত্ত্বেও ওই মানসিক বাধা চিত্তভূমি থেকে অপসারিত হয় নি। সাংস্কৃতিক মোকাবিলা বলতে আমি যে জিনিসটাকে বোঝাতে চাই তা যেহেতু কয়েকজন বিদ্বানের নিবিড় বিদ্যাচর্চার প্রশ্ন নয় শুধু, তাই ওইসব শ্রদ্ধেয় নজিরের সামনে আমাদের থেমে গেলে চলবে না। ওখান থেকে প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ করে ওই স্তরটাকে পেরিয়েও যেতে হবে। শুকনো পাতা আপনি আপনি খসে কবে চিত্তভূমিকে উর্বরা করবে তা কি কোনো সময়সূচিতে অমন করে ছিমছাম বাঁধা চলে।

ওই চিত্তভূমির সূত্রে আমি পদ্ধতির একটা কথা তুলেছিলাম। আমি ভাবতে চাই যে পদ্ধতির স্তরে আমাদের প্রতিষ্ঠানগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং সেই সুবাদে আমাদের সাধারণ পাঠস্তরে যে অর্জিত বোধ কাজ করে তা অনেকাংশে সংস্কার করে নেবার অবকাশ আছে। সমগ্র, এই ধারণাটিকে আমি একটি চিন্তাবর্গ হিসেবে ব্যবহার করতে চাই এখন। রবীন্দ্রনাথকে এই চিন্তাবর্গে সাজানোর প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখা চাই। বর্গটিকে একটু দেখে নেওয়া যাক। রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে সমগ্রতার কথা উঠলে এ রকম একটা কথা স্বাভাবিকভাবে উঠে পড়বে যে আমাদের চর্চায় তাঁর কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, ছবি এবং তাঁর বিপুল কর্মকাণ্ড, এ সবই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই করতে হবে। কিন্তু আমি যে সমগ্রতার কথা ভাবছি তার দাবি কেবল ওইটুকু নয়। যদিও এইটুকু কাজও আমাদের প্রচলিত বিদ্যায়তনিক অভ্যাসের গণ্ডিতে অনেকখানি। পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের জায়গা অধিকাংশ সময়ে আমাদের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যবিভাগে। এ ব্যাপারটা এমনিতে খুব অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু অন্য কোনো বিভাগে তাঁর জায়গা না-পাওয়া ব্যাপারটা বেশ উদ্‌বেগজনক। ইতিহাস, অর্থনীতি কিংবা সমাজতত্ত্ব বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান, এ সব বিভাগে তাঁর প্রবেশাধিকার মূলত অস্বীকৃত। যে সব ক্ষেত্রে একটু আধটু স্বীকার করাও হয়, তা-ও হয় খুবই কুণ্ঠিতভাবে। তাঁর উপস্থিতি সে সব ক্ষেত্রে খুবই প্রান্তিক।

তা ছাড়াও অ-সমগ্রতার যে দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলছি তাতে আরো একটা অন্য স্তরেও খণ্ডদৃষ্টির পরিচয় আছে। যখন রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসদৃষ্টি নিয়ে কথা বলছি তখন শুধু তাঁর ইতিহাস-প্রাসঙ্গিক রচনাগুলির কথাই মাথায় রাখছি। যখন অর্থনীতির প্রসঙ্গে কথা বলছি তখন শুধুই তাঁর সমবায় ও গ্রামীণ অর্থনীতি চিন্তার কথাই কেবল ভাবছি। এইসব চর্চার অধিকাংশ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত জড়িয়ে নিতে চাই না। এমনকি কেউ কেউ তাঁর প্রবন্ধভিত্তিক কোনো প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে প্রবন্ধেরই গণ্ডির বাইরে না বেরোবার কথা বলছেন। আমাদের অভ্যাস ও সংস্কার আমাদের আটকে দিচ্ছে বলে সন্দেহ হয়। নিশ্চয়ই প্রশ্ন উঠবে যে একলা কেউ কি এর সবটুকু একই সঙ্গে অঙ্গীকৃত করার অধিকারী। সে রকম যদি কেউ থাকেনও তিনি হবেন এক বিরল নজির। ঠিক কথা। সে রকম অলোকসামান্য কোনো প্রতিভাধরের কথা কিন্তু ভাবছি না আমি। আমি ভাবছি একটা পদ্ধতির কথা। প্রশ্নটা সব বিষয়ে সমান অধিকার অর্জনের নয়। প্রশ্ন শুধু সহজভাবে চোখ কান খোলা রাখার। এমনভাবে যাতে কোনো একটা দিকে তাকাতে গেলে অন্য দিকের আলো হাওয়া বন্ধ না হয়ে যায়। নজর দিতে হবে তাঁর সবদিকে। এমনকি তাঁর অসম্পূর্ণতা ও সম্ভাব্য অসংগতি সমেত সমস্ত কিছুর দিকে। ধরা যাক, কোনো একটা দিকে রবীন্দ্রপ্রচেষ্টা হয়তো নগণ্য কিংবা ব্যর্থ। সমগ্রতা বলে যে বর্গের কথা ভাবছি সেখানে অসম্পূর্ণতা অসংগতি অনুপস্থিতি ইত্যাদি সবেরই জায়গা আছে। ছোটো একটা উদাহরণ। চলচ্চিত্র নামে শিল্পমাধ্যমটি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সামান্য কিছু মনোযোগের খবর আমরা জেনেছি। হয়ত সেখানে তাঁর অর্জন তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। তা হোক। এই সমগ্রতার বর্গে ওইটুকুর জন্যও জায়গা চাই। চিত্তভূমি উর্বরা করার জন্য এইসমস্ত ক্ষেত্র থেকেই জলসিঞ্চন সম্ভব।

বর্গ হিসেবে সমগ্রতার ইশারা আমরা রবীন্দ্রনাথেই পেয়ে যেতে পারি। নানা দিক থেকেই কথাটা বলা সম্ভব। তাঁর শিক্ষাদর্শের তাত্ত্বিক কাঠামো এবং শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় দর্শনের মধ্যেই এই সমগ্রতার উপরে জোরটা ছিল। নিজের মতো হয়ে ওঠার যে সাহস সেই সাহসে সহজ প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য কত রকমের আয়োজন ছিল তাঁর শিক্ষা-কল্পনায়। এ বিষয়ে আলোচনা কথাবার্তা অনেকটা হয়েছে। আমি বরঞ্চ উদাহরণ হিসেবে অন্য একটা বিষয় নিয়ে একটু কথা বলি। বিজ্ঞান। এই জন্যই বর্গ হিসেবে সমগ্রতার কথাটা তুলতে চাই। বিজ্ঞান নিয়ে যে রবীন্দ্রনাথ ভাবিত ছিলেন সে কিন্তু বিজ্ঞানে কোনো নতুন আবিষ্কারের জন্য নয়। বিজ্ঞান কী করে, কী আমাদের জানায় এবং কেমনভাবে, সে বিষয়ে তাঁর একটা বোধে পৌঁছোতে চাইছিলেন তিনি। সে বোধ তাঁর সামগ্রিক বিশ্বদৃষ্টিরই অন্তর্গত। অথবা, এভাবেও বোধহয় বলা যায় কথাটা। সেই বিশ্বদৃষ্টি গড়ে তোলার পথে বিজ্ঞান নিয়ে তাঁর প্রশ্ন ও কৌতূহলে এসে পৌঁছোচ্ছেন তিনি। সচরাচর আমরা যাকে বিভিন্ন রকমের উপকরণ বলে ভাবতে অভ্যস্ত সে সব কী রকম যে ওতপ্রোত হয়ে ছিল তাঁর চিন্তাভাবনায়। পণ্ড লাইসিয়ুম্-এর উদ্যোগে আয়োজিত ১৯১৬-র মার্কিন দেশের বক্তৃতামালায় ব্যক্তিত্ব বিষয়ে কথা সাজাতে গিয়ে অবলীলায় বিনা কৈফিয়তে বিজ্ঞান সম্পর্কিত এক কেন্দ্রীয় ভাবনাকে আশ্রয় করে গড়ে তোলেন তাঁর চিন্তা। এবং যেভাবে কথা তৈরি করেন তাতে সহজে টের পাওয়া যায় কী বিপুল কেন্দ্রীয় সংহতির টানে নানা উপকরণ এসে মিলেমিশে রচনা করে তুলছে তাঁর ভাবনাজগৎ। সমগ্রতার বর্গ থেকে দেখতে শিখলে সংহতির এই টান নজরে পড়বে। সংগতি বা অসংগতির প্রশ্ন কি নেই? তথ্যের স্তরে সে প্রশ্ন নিশ্চয়ই উঠবে। কিন্তু সংহতি তার জন্য মার খাবে কেন। *রাজা* নাটকে অন্ধকারের মধ্যেও রানীকে কেমন দেখেন রাজা তা আমরা জেনেছিলাম এই ভাষায় :

> দেখতে পাই, যেন অনন্ত আকাশের অন্ধকার আমার আনন্দের টানে ঘুরতে ঘুরতে কত নক্ষত্রের আলো টেনে নিয়ে এসে একটি জায়গায় রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে কত যুগের ধ্যান, কত আকাশের আবেগ, কত ঋতুর উপহার।

সংহতির এই রূপকল্প আমরা কিন্তু রবীন্দ্রনাথে অন্যত্রও পাই। গায়ত্রী মন্ত্রের ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ অংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলছেন :

চারিদিক হইতে আহরণ করিয়া আনার নাম ব্যাহৃতি। প্রথম ধ্যানকালে ভূলোক ভুবর্লোক ও স্বর্লোক অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বজগৎকে মনের মধ্যে আহরণ করিয়া আনিতে হইবে— তখনকার মত মনে করিতে হইবে আমি সমস্ত বিশ্বজগতের মধ্যে দাঁড়াইয়াছি ...।

(*চিঠিপত্র* ১৩, পৃ. ১৬৭।)

রাজার দেখা থেকে ব্যাহৃতি পর্যন্ত এক টানে দেখতে পারলে রবীন্দ্রভাবনার প্রতিমান পেয়ে যেতে পারি না আমরা।

১৯১৬-র যে বক্তৃতামালা *Personality* নামে গ্রন্থাকারে সংকলিত সেই বক্তৃতা সফর মোটের উপর সফল বলেই চিহ্নিত। যদিও কৃষ্ণ কৃপালনীর ভাষায় 'feted and lionized as few other foreign writers in America have been', এ ব্যাপারটা যেমন ছিল তেমনি বিপরীত প্রতিক্রিয়াও একেবারে বিরল ছিল না। ওখানকার সংবাদপত্রের বর্ণনায় বলা হয়েছিল 'the poet who looked like a poet'। আর অতটাই যাঁকে কবি কবি দেখতে তিনি কতটাই-বা আর ঠিকঠাক কবি হবেন। অভিযোগ উঠেছিল যে তিনি এমন 'sickly saccharine mental poison' প্রচার করছেন যে 'that would corrupt the mind of the youth of our great United States'। তা দেখা যাক কী ছিল এই স্যাকারিন-মাখানো রুগ্ন বিষের প্রকৃতি। আমি *Personality*-র অন্তর্গত দুটি মাত্র বক্তৃতাকে ছুঁয়ে থেকে ছোটো একটা কথা তোলবার চেষ্টা করব। কেন এবং কীভাবে রবীন্দ্রনাথকে আমাদের সময়ে প্রাসঙ্গিক করে দেখা যায় তার কিছু ইঙ্গিত আশা করি এখান থেকে পাওয়া যাবে। এই দুটি রচনার একটির নাম 'The World of Personality' এবং অন্যটি 'The Second Birth'। এই দুটি লেখাতেই রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের সঙ্গে তর্কে নিজেকে জড়িয়েছেন। তর্কে জড়ানো মানে যে বিজ্ঞানকে অস্বীকার করা হচ্ছে তা মোটেই নয়। সে প্রশ্নই উঠছে না। এমনকি বিজ্ঞানের ভূমিকাকে খাটো করে দেখার চেষ্টাও বিন্দুমাত্র নেই। বিজ্ঞান কী ভূমিকা নিতে পারে তা বুঝে নেবার চেষ্টা করছেন নিজের মতো, এবং নিজেরই মধ্যে। বিজ্ঞান প্রসঙ্গে এই নিজের মধ্যে বুঝে নেবার কথাটার দিকে আমাদের মন দেওয়া দরকার। কেননা প্রচলিত ধারায় বিজ্ঞান আমরা নিজের মধ্যে বুঝে নিই না, তাকে বাইরে দেখি, হয়ত পরীক্ষাগারে। ব্যক্তিতার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে অকলুষিত রাখতে চাই সে বিজ্ঞানকে। তা-ই তার শুদ্ধতা। জ্ঞানের দরবারে সে শুদ্ধতার জন্যই যেন তার জিৎ। সে বিজ্ঞানকে রবীন্দ্রনাথ টেনে আনতে চাইবেন তার 'শুদ্ধতা' থেকে, মানবস্বভাবস্পর্শে তাকে তিনি অন্য মাত্রায় মহিমান্বিত করে তুলতে চাইবেন। ১৯১৬-র পৃথিবীতে, একটা বিশ্বযুদ্ধের ঠিক মাঝখানে, লোলুপ ক্ষমতার রক্তচক্ষুর দিনে এই দৃষ্টিকে যদি মনে হয় 'sickly saccharine mental poison', তাহলে গোটা বিশ-শতক-পেরোনো আজকের অভিজ্ঞতায় ওই বিষের মধ্যেই অমৃতসন্ধান কি একেবারে অসংগত প্রস্তাব?

ব্যক্তিতার জগতে পৌঁছোবার জন্য তারা-ভরা রাত্রির আকাশের একটা ছবি নিয়ে কথা শুরু করছেন। আমাদের শাদা চোখে তারাদের দেখি স্থির দাঁড়ানো। বিজ্ঞান বলবেন, তারারা দ্রুত ধাবমান। মাটির পৃথিবীর মানুষ আমরা তারাদের দেখছি দূর থেকে। আর যন্ত্রপাতির সাহায্যে বিজ্ঞান তারাদের দেখছেন খুব কাছের থেকে। দূরের দৃষ্টিতে যা স্থির, কাছের দৃষ্টিতে তা ধাবমান। এর কোন্‌টা ঠিক? বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোনো কুসংস্কার পোষণ না করলে আমাদের শাদা চোখের সহজ দেখাকে অত সহজে বাতিল করা যাবে না। আর বিজ্ঞান যা দেখছেন তাকেই বা আমরা এক কথায় ভুল বলব কোন্ যুক্তিতে? এই দ্বিধার সামনে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান :

Therefore let us bodly declare that both facts are equally true about the stars. Let us say that they are unmoved in the plane of the distant and they are moving in the plane of the near. The stars in their one relation to me are truly still and in their other relation are truly moving. The distant and the near are the keepers of two different sets of facts, but they both belong to one truth which is their master. Therefore when we

take the side of the one to revile the other, we hurt the truth which comprehends them both.

('The World of Personality', *Personality*, Macmillan Edition, pp. 43-44.)

দূর ও নিকট। তথ্যের স্তরের এই দুই পটেই তাহলে সত্যের ছায়া পড়তে পারে। নিশ্চিতভাবে একদিকে ভর দিতে গিয়ে অন্যদিক ত্যাগ করার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। একই সঙ্গে দুদিকেই ভর রাখা সম্ভব। এই দৃষ্টি থেকে রবীন্দ্রনাথ আস্তে আস্তে কীভাবে ব্যক্তিতার জগতে পৌঁছে যাবেন সেই যাত্রাপথ লক্ষণীয়। আত্মতার পুনরুদ্ধারের যে কথা দিয়ে গোড়ায় কথা শুরু করেছিলাম, ব্যক্তিতার জগতে পৌঁছোতে পারলে তার কিছু হদিশ হয়ত মিলবে।

এখান থেকে রবীন্দ্রনাথ এবার *ঈশোপনিষদ*-এর জগতে প্রবেশ করছেন। যে শ্লোকটির উল্লেখ করে তিনি কথা সাজাচ্ছেন মূলে সে শ্লোকটি এই রকম :

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥ ৫ ॥

রবীন্দ্রনাথের উল্লেখে আমরা পাচ্ছি : 'It moves. It moves not. It is distant. It is near.' রবীন্দ্র-ব্যাখ্যায় এই শ্লোকের অর্থ এই যে, নিকট থেকে সত্যকে খণ্ড টুকরো করে দেখলে মনে হবে তা চঞ্চল, ধাবমান। দূর থেকে সত্যকে গোটাটা একসঙ্গে দেখলে মনে হবে তা অচঞ্চল, স্থির। রূপকের আশ্রয়ে রবীন্দ্রনাথের এই প্রসঙ্গের-ব্যাখ্যার মধ্যে এ কথা অবশ্যই লক্ষণীয় যে, তিনি একবারের জন্যও ব্রহ্মের ধারণার দ্বারস্থ হচ্ছেন না। *ঈশোপনিষদ*-এর অধিবিদ্যক দৃষ্টির মধ্য থেকে নিহিত এক দ্বন্দ্বময়তার সন্ধান করছেন তিনি। এই দ্বান্দ্বিক পাঠের সাহায্যে তিনি পৌঁছে যাবেন 'অস্তিত্বের রহস্যে'র সেই বিন্দুতে যাকে বলা যেতে পারে পরস্পর অসংগতির মিলনবিন্দু। তা কিন্তু অসংগতির নিরসনবিন্দু নয়। সেই বিন্দু থেকে দূরের দিকে বা নিকটের দিকে আমরা যত এগোব ততই দেখা যাবে যে একটা বিন্দুর পরে বস্তুর চেনা বস্তুত্বই বিলীয়মান। এখানে রবীন্দ্রনাথ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে-রাখা গোলাপ-পাতার এক চমৎকার উদাহরণ ব্যবহার করছেন। আমাদের সাধারণ চোখে (দূরের দৃষ্টিতে) যা গোলাপের পাতা বলে প্রতীয়মান, তা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে (নিকট দৃষ্টিতে) মনে হবে অচেনা কোনো কিছু। ওই যন্ত্রের নিচে বস্তুটি যে পরিসরে ব্যাপ্ত থাকে তা আমাদের সাধারণ দৃষ্টিকালীন পরিসরের তুলনায় অনেক ব্যাপ্ত। ওই পরিসরকে আরো ব্যাপ্ত করে দিতে থাকলে বস্তুটিকে গোলাপের পাতা বলে চিনে নেবার আর কোনো অবকাশই থাকে না। আবার ওই পরিসরকে সংকুচিত করতে থাকলে একটা বিন্দুতে, হয়ত অণুবীক্ষণ যন্ত্র থেকে চোখ সরিয়ে নেবার পরে, বস্তুটি আবার তার পরিচিত গোলাপ পাতার স্বরূপে দেখা দেবে। অর্থাৎ বস্তুর বস্তুত্ব ওই অনন্ত আর সান্তর এক নির্দিষ্ট মিলনবিন্দুতে বিধৃত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'It only becomes a rose leaf where the infinite reaches finitude at a particular point.' (*Personality*, Macmillan, p. 45.). তাই বস্তুতা ও বাস্তবতা এমন একটা বর্গের পদার্থ যা আমাদের মন ও বোধের সঙ্গে জড়িত। তাই বস্তুজগৎ তা-ই যেভাবে আমি তাকে আমার পরিগ্রহণে পাই : 'What we perceive it to be.' এই যাত্রাপথেই একদিন পৌঁছোনো সম্ভব হবে : 'আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, / চুনি উঠল রাঙা হয়ে।' যে 'আমি'র গহনে আলো-আঁধারের সংগম একদিন তিনি দেখবেন, যেখানে রূপ দেখা দেবে, রস জেগে উঠবে সে 'আমি'র ভুবন দীর্ঘদিন ধরে প্রসারিত হচ্ছিল তাঁর মননে।

বস্তুদৃষ্টি বা বিজ্ঞানদৃষ্টি বলে যে জিনিসকে আমরা বুঝি তার মধ্যে মানুষের অবস্থানকে এতে করে নিশ্চয়ই খুব বড়ো জায়গা দেওয়া হল। আমাদের এখনকার কালের যে সমস্যার অনুষঙ্গে একটি হাতের ছাপের কথা দিয়ে প্রসঙ্গ শুরু করেছিলাম সে সমস্যার মোকাবিলায় বিষয়ীর প্রতিষ্ঠা অবশ্যই এক বড়ো দায়। সেই দায় পালনে বস্তুদর্শনে ব্যক্তির ভূমিকা স্থাপন এক জরুরি পদক্ষেপ। আমাদের মন এই বস্তুজগৎ গড়ে তুলছে, কথাটা এই রকম শাদামাটাভাবে বলে ফেললে অনেক ভুল বোঝার অবকাশ থেকে যাবে। বস্তুজগৎকে আমরা

যেমনভাবে দেখছি বা পাচ্ছি তা সম্ভব হয়ে উঠছে মানব মনের সমবায়ে। এ সব কথা প্রচলিত ভাববাদী বা বস্তুবাদী ছাঁদে ফেলে দেখতে গেলে নানা বিপত্তির সম্ভাবনা দেখা দেবে। বরঞ্চ আধুনিক কালের বিজ্ঞান দর্শনের রিয়ালিস্ট ও অ্যান্টিরিয়ালিস্ট বিতর্কের আঙ্গিকে রবীন্দ্রনাথের অবস্থানের নিবিষ্ট বিচারের প্রয়োজন আছে। মানবসমবায়ে বস্তুবিশ্বের অস্তিত্ব নিয়ে ভাবতে বসলেই যে ব্যাপারে আমাদের গা ছমছম করে তা এই যে তবে কি মানুষের অনুপস্থিতিতে এই বস্তুবিশ্বের বস্তুগত কোনো অস্তিত্ব নেই। প্রশ্নটা এইভাবে না তুলে একটু অন্যভাবে দেখা সম্ভব। মানুষের ইন্দ্রিয়গোচর নয় এমন অনেক জিনিসের যে অস্তিত্ব আছে তা অতি সহজেই দেখা যায়। কুকুরের ঘ্রাণশক্তির প্রশ্নটা ভাবলেই বোঝা যাবে যে মানবসমবায়ে সিদ্ধ নয় বলেই মানুষের ঘ্রাণেন্দ্রিয়োত্তর ওই পদার্থ আমাদের বস্তুবিশ্বের অন্তর্গত হতে পারছে না। তার জন্য ওই পদার্থের অনস্তিত্ব ঘোষণা করার দরকার পড়ে না। বিভিন্ন বস্তুকে দেশ ও কালের বিভিন্ন বিন্দুতে মানুষের মন তাকমতো দেখতে পায় বলেই মানুষ তার বস্তুজগৎকে যেভাবে পায় তা তা-ই। রবীন্দ্রনাথের কথায় আমরা যে লোহাকে লোহা দেখি আর জলকে জল ও মেঘকে মেঘ তা এইজন্য যে আমরা বিভিন্ন বস্তুকে দেশ ও কালের বিভিন্ন সংগমবিন্দুতেই দেখে থাকি। বিষয়ীর মনের প্রেক্ষার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার জগৎটাও কিন্তু বদলে বদলে যাবে। তাহলে বিষয়ীর মনই জগৎ রচনার কর্তা। এই রচিত জগতের জন্য রবীন্দ্রনাথ এখন এক কেন্দ্রীয় ব্যক্তিতার কল্পনা করছেন। তাঁর বক্তব্য এই যে, প্রচলিত বিজ্ঞানে এ রকম কোনো কেন্দ্রীয় ব্যক্তিতার জায়গা নেই। প্রচলিত বিজ্ঞান সেই অর্থে ব্যক্তি নিরপেক্ষ। এই নৈর্ব্যক্তিক বিজ্ঞান কেবলমাত্র বহিরঙ্গ নিয়েই ব্যাপৃত থাকতে পারে। এই নৈর্ব্যক্তিকতায় সেই অন্তর্বেদী দৃষ্টি অনুপস্থিত যার জোরে মানবিক ও অ-মানবিক দুরকম পদার্থের সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা সম্ভব। এই যে অ-মানবিক পদার্থ তা-ও এখন মানব-অর্থে রঞ্জিত।

*পার্সোনালিটি* প্রবন্ধমালা থেকে 'দ্য সেকেণ্ডে বার্থ' নামের যে প্রবন্ধের উল্লেখ করেছি আগে, সেখানে এই অর্থের প্রশ্নে মন দিচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। 'অর্থ', 'তাৎপর্য', 'জানা', এই সব শব্দই এখন অনেক নিহিত অনুষঙ্গে সমৃদ্ধ। এই পথে মানুষের সঙ্গে পৃথিবীর নিবিড়তর সম্বন্ধ আবিষ্কারের দিকে এগোবেন এখন রবীন্দ্রনাথ। শুরুতেই তিনি জরুরি একটা তফাত নির্দেশ করে নিচ্ছেন। অস্তিত্বের দিকে বাইরে থেকে তাকানো, আর অস্তিত্বকে জানা, এ দুটো নিতান্ত ভিন্ন প্রকৃতির জিনিস। এর একটাকে রবীন্দ্রনাথ বলছেন 'outside view of existence' আর অন্যটা '[to] know what it is'। কোনো বস্তুর উপরে আমাদের মননদৃষ্টি নিবদ্ধ করে যখন আমরা বস্তুটিকে দেখি তখনই বিশ্বপ্রকৃতির অন্য সব কিছু থেকে তাকে আমরা আলাদা করে দেখতে পাই। একটা গাছকে এইভাবে যখন দেখি তখন তার গাছের বিশিষ্ট সত্তায় তাকে চিনে নিতে পারি। চরাচরের অন্য আর সব কিছু থেকে সে ভিন্ন। এই তার সত্তার বিশিষ্টতা। বিশ্বের অন্য সব কিছু যেমন আছে, গাছ তার বিশিষ্ট সত্তাতেও তেমন আছে। বোধের এই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে মানুষ ও তার বিশ্বের সম্বন্ধের কথা ভাবতে গেলে এক চমৎকার দ্বিস্তর পরিচয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। মানুষ এই পৃথিবীকে তার নিজের করে নিতে পারে দুই স্তরেই— পৃথিবীতে বেঁচে থেকে আর সেই বেঁচে থাকাকে জানবার চেষ্টা করে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'by living in it and by knowing it'। এই জানা অবশ্যই প্রচলিত বিজ্ঞানের বাইরের দিককার জানা নয়। অর্থতত্ত্বের পথে এই জানায় ভিতর দিকে যেতে হয়, অস্তিত্বের অন্তরের সন্ধান নিতে হয়। এই অন্তরযাত্রার কলাকৌশল ও বিপদ আপদ সম্বন্ধে আধুনিকেরা আজ মগ্ন চর্চায় নিরত। রবীন্দ্রনাথ সেখানে অনেক দূর পর্যন্ত আমাদের অগ্রণী সহযাত্রী।

মানবসমবায়ে বস্তুবিশ্বের এই বীক্ষাই রবীন্দ্রনাথের মানবতার দার্শনিক প্রস্থান। এই প্রস্থান থেকে আত্মতার বিকাশের পথে যে কতদূর যাওয়া সম্ভব তার পরিচয় রবীন্দ্ররচনায় আমাদের জন্য অনেকদিন ধরেই ছড়ানো ছিল। *ছিন্নপত্র*-এর ৬৭ নং চিঠির মধ্যে এ রকম কথা ছিল :

> আমি বেশ মনে করতে পারি, বহু যুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নতুন মাটিতে কোথা থেকে

> এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলছে এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলছে। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সমস্ত সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম, নবশিশুর মতো একটা অন্ধজীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম।

এই অনুভব তখনো সবার কাছে বোধহয় খুব সহজপাচ্য ছিল না। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে কুড়ি বছর পরে আবার একবার কথা বলতে হয়েছিল। ১৩১৮-র ১৭ ফাল্গুনে লেখা এক চিঠিতে এই কথায় ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ আবার বলছেন :

> আমি সূর্য্যচন্দ্র নক্ষত্র এবং মাটি পাথর জল সমস্তের সঙ্গে একসঙ্গে আছি এই কথাটা এক এক শুভমুহূর্ত্তে যখন আমার মনের মধ্যে স্পষ্টসুরে বাজে তখন একটা বিপুল অস্তিত্বের নিবিড় হর্ষে আমার দেহমন পুলকিত হইয়া উঠে। ইহা আমার কবিত্ব নহে, ইহা আমার স্বভাব। এই স্বভাব হইতেই আমি কবিতা লিখিয়াছি গান লিখিয়াছি, গল্প লিখিয়াছি।

(*চিঠিপত্র* ১৫, পৃ. ৭২; দ্র. পত্রপরিচয়, পৃ. ২২০।)

এ সব চিঠি গোটাটাই উদ্ধৃত করতে লোভ হয়। তা সব সময়ে সম্ভব হয় না। তবে সংবেদী মন ছাপা অক্ষরের শীতলতার মধ্যেও তাপটা টের পেয়ে যাবেন ঠিকই। কিন্তু আমি যে কথার জন্য এত কথা তুললাম সে কথায় ফিরে এসে শেষ করি। সেই একটি হাতের ছাপ। ইউ এন ডি পি-র ওই হাতের ছাপ বাঁচানোর দায় যাঁরা স্বীকার করে নেবেন, রবীন্দ্রনাথের এইসব কথায় তাঁদের কোনো প্রয়োজন নেই? এই রবীন্দ্রনাথ কি সত্যিই সুদূরবিলাসী হাওয়া। *

---

* ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেসের শান্তিনিকেতন সমাবেশে (২০০৬) প্রদত্ত ইংরেজি ভাষণের পরিমার্জিত পাঠ।

# মুখের কথা লেখার ভাষায়

বিশ্বজিৎ রায়

নিত্যপ্রিয় ঘোষের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখের কথা লেখার ভাষায়*। এই প্রথম খণ্ডটিতে রয়েছে একুশটি 'বক্তৃতা-প্রবন্ধ'। রচনাগুলির সময়সীমা ১২৮৮ থেকে ১৩০৯ বঙ্গাব্দ। প্রবন্ধ / বক্তৃতাগুলির গোড়ায় শ্রীঘোষের ভূমিকা *মুখের কথা লেখার ভাষায়*-এর পাঠকদের দরবারে অনিবার্য গৌরচন্দ্রিকা হিসেবে উপস্থিত। রবীন্দ্ররচনার ওপর বিশ্বভারতীর আইনানুগ অধিকার ঘুচে যাওয়ার পর সেই সব রচনা যে ভিন্ন বিন্যাসে গ্রন্থায়িত হওয়া উচিত, এ বোধ অনেকের মধ্যেই কাজ করেছে। নিত্যপ্রিয় রবীন্দ্ররচনাকে নতুন বিন্যাসে ভিন্নতর অর্থে এর আগেও সাজিয়েছেন। তাঁর সংকলিত *হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক / রবীন্দ্ররচনার সংগ্রহ* (জানুয়ারি ২০০৩) এর আগেই পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। সেই রচনা-সংকলনটির জন্য নিত্যপ্রিয় কোনো 'গৌরচন্দ্রিকা' রচনা না-করলেও *রবীন্দ্রনাথের মুখের কথা, লেখার ভাষায়* বইতে কেন সাজিয়ে দিচ্ছেন তা কিন্তু পাঠকদের জানাতে ক্যার্পণ্য করেন নি। 'রবীন্দ্রনাথের অনেক প্রবন্ধই প্রথমে ছিল বক্তৃতা, তার পরে ছাপা হয় প্রবন্ধ হিসেবে। তাঁর অন্তত ৮০টি প্রবন্ধই প্রথমে ছিল বক্তৃতা। এই উপলক্ষটা মনে না-রাখলে ছাপা প্রবন্ধের শৈলির মূল লক্ষণ আমরা ধরতে পারব না।— এই হল সম্পাদকের মূল যুক্তি। এই ধরতাইটুকু খেয়ালে রেখেই গৌরচন্দ্রিকায় তিনি নানা তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মুখের কথা শ্রোতাদের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া তৈরি করত, তার হিসেবপত্তর সেখানে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রকাশ্য বিরোধিতা করায় জনতা মারমুখী হয়ে উঠেছিল। আসলে *রবীন্দ্ররচনাবলী*-র প্রচলিত সংস্করণে পাঠকরা 'বক্তৃতা-প্রবন্ধ' লেখার ভাষাতেই পড়েন। এই লেখাগুলির সঙ্গে মুখের কথার যোগসূত্র কী এবং কতটা, তার কোনো তথ্যনিষ্ঠ উল্লেখ সেখানে প্রায়ই থাকে না বলে সাধারণ পাঠকদের কাছে লেখাগুলি নির্জীবভাবে ধরা দেয়। এই লেখাগুলি মুখের কথা হিসেবে কতটা উত্তেজনাবাহী ছিল এবং সেই মুখের কথার উত্তেজনা বক্তা-শ্রোতা উভয়পক্ষে কীভাবে সঞ্চারিত প্রতিসঞ্চারিত হত *রবীন্দ্ররচনাবলী*-র প্রচলিত সংস্করণ পড়ে তা বোঝার উপায় নেই বলেই নিত্যপ্রিয়ের এই আয়োজন। নিত্যপ্রিয়ের গৌরচন্দ্রিকা পড়ে মুখের কথার সচেতনতায় দীক্ষিত হয়ে পাঠক এই লেখাগুলি পড়ে ফেলবেন, আর সেটাই তো সংকলক / সম্পাদক চান। গৌরচন্দ্রিকার কাজই তাই। কীর্তনের আসরে যে বিষয়ের পদ গাওয়া হবে, সেই বিষয়ানুগ গৌরচন্দ্রিকার মাধ্যমে কীর্তনকার শ্রোতাদের প্রস্তুত করে নিয়ে তবে তো কীর্তনের মূল অঙ্গে প্রবেশ করবেন। সহৃদয় শ্রোতাদের চিত্ত যেহেতু সংস্কৃত / মার্জিত হয়ে গেছে গৌরচন্দ্রিকার গুণে সেহেতু উজ্জ্বল রসসঞ্চারী পদগুলিকে ভিন্নার্থে / অনভিপ্রেতার্থে আস্বাদন করার অধিকার তাদের নেই। এই বইটির নাম ও সংকলকের ধরতাই / প্রারম্ভিক প্রবন্ধের নাম অভিন্ন— মুখের কথা ও লেখার ভাষা এই সংযোগেই রচনাগুলি বুঝতে / পড়তে হবে, তা প্রাক্‌নির্দিষ্ট। কিন্তু গৌরচন্দ্রিকাবৎ প্রারম্ভিকের প্রাক্‌নির্দেশ যদি কেউ অস্বীকার করেন? 'মুখের কথা' 'লেখার ভাষা' এই নির্মিত বর্গ দুটিকেই কেউ যদি 'আপেক্ষিক' বলে মনে করেন, তখন? বিশেষ করে এই খণ্ডে ১২৮৮ থেকে ১৩০৯ পর্যন্ত কালপর্বের মধ্যবর্তী যে পাঠ্যগুলি (text) তুলে ধরা হয়েছে সেগুলির মধ্যে কি বাচন ও লিখন

বহুমাত্রিক সম্ভাব্যতায় আদান-প্রদানরত নয়? যদি তাই হয় তাহলে কিন্তু মুখের কথা লেখার ভাষায় বড়ো একরৈখিকভাবে নির্ধারিত প্রকল্প বলে মনে হবে। আর সে ক্ষেত্রে গৌরচন্দ্রিকাবৎ প্রারম্ভিকটিকে' ভুলে গিয়ে সরাসরি ঢুকে পড়তে হবে 'পাঠ্য' ও 'পাঠ্যপ্রতিবেশে'। না, কোনো 'অভিপ্রেত অর্থের' খোঁজে পাঠ্য ও প্রতিবেশে 'নিজেকে' নিযুক্ত করবেন না পরিপ্রশ্নশীল, অর্থ ও অর্থান্তরের কোঠায় পরিভ্রমণের এ এক নিরন্তর খেলা।[২]

এই সম্পাদিত গ্রন্থের প্রথম রচনাটি 'সংগীত ও ভাব'— বেথুন সোসাইটির উদ্যোগে 'মেডিক্যাল কলেজ হল্'-এ ৮ বৈশাখ ১২৮৮ (১৯ এপ্রিল ১৮৮১) তারিখে রবীন্দ্রনাথ এই বক্তৃতা প্রদান করেন। সম্পাদক-প্রদত্ত ধরতাই তথ্য অনুসারে সেই বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ 'গান গেয়ে গেয়ে সুর ও ভাব বুঝিয়েছিলেন'। এই বক্তৃতা-প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'মোদ্দা' বক্তব্য, 'ভাবপ্রকাশকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া, সুর ও তালকে গৌণ উদ্দেশ্য করিলেই ভালো হয়।' অর্থাৎ কলেজ হল্-এর বক্তৃতায় গান গেয়ে সুর করে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু কোনো বহির্মুখী উপদেশ প্রদান করছেন না, ভাবের অন্তর্মুখে শ্রোতাদের টেনে আনতে চাইছেন। এই বহির্মুখ-অন্তর্মুখ প্রসঙ্গ উঠে পড়ল. কারণ ঔপনিবেশিক বঙ্গভূমে বাক / বাচন এই সংযোগ-মাধ্যমটির সঙ্গে কতগুলি শর্ত / উদ্দেশ্য যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। প্রাক্-ঔপনিবেশিক বাক্‌সংস্কৃতির সঙ্গে এই ঔপনিবেশিক বাক্‌সংস্কৃতির গোত্রগত পার্থক্য আছে। এই গ্রন্থে সংকলিত বক্তৃতা-প্রবন্ধগুলি কোনো-না-কোনো সোসাইটি, অ্যাসোসিয়েশন, সমিতি, পরিষদ, থিয়েটার, লাইব্রেরি হল্, ক্লাব-জাতীয় গণপরিসরে পঠিত। এই গণপরিসরগুলি নির্মিত হয়েছিল ঔপনিবেশিক বঙ্গভূমে— জাতিসত্তানির্মাণের তাগিদ থেকে, সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠাপ্রেরণা থেকেই এই পরিসরগুলি গড়ে তোলা হয়। য়ুরোপের বাক্ ও গণ যে রাষ্ট্রনৈতিকতার সাপেক্ষে অন্বিত, বঙ্গবাসীরা সেই রাষ্ট্রনৈতিকতারই বঙ্গীকরণ ঘটাতে চাইছেন। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ডিরোজিওর ছাত্ররা যে বক্তৃতা-সংস্কৃতি / বাক্-বিপ্লব ঘটান, তার থেকে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সোসাইটি, অ্যাসোসিয়েশন, সমিতির বাক্‌পরিধি বিস্তৃততর— কোনো-না-কোনোভাবে নেশনের সঙ্গে অন্বিত।

বঙ্কিমচন্দ্র কবুল করেছিলেন, 'যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজের চিত্তভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম— স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা ইহা কাহাকে বলে, তাহা হিন্দু জানিত না।' 'ভারতকলঙ্ক' প্রবন্ধের পাদটীকায় বঙ্কিম জানিয়েছিলেন, 'এই প্রবন্ধে জাতি শব্দে Nationality বা Nation বুঝিতে হইবে।' বঙ্কিমচন্দ্র ও *বঙ্গদর্শন*-গোষ্ঠী 'জাতিপ্রতিষ্ঠা'র কাজে ব্রতী। এই জাতিপ্রতিষ্ঠা কেমন করে করা উচিত / উচিত নয় তা নিয়ে বঙ্কিম য়ুরোপের সঙ্গে তর্ক করছেন। বঙ্কিমের কমলাকান্ত জানিয়েছে, 'আর ইহাই এখনকার ইউরোপের International law। যদি সভ্য এবং উন্নত হইতে চাও, তবে কাড়িয়া খাইবে।' বঙ্কিমের *ধর্মতত্ত্ব*-এর গুরু জানিয়েছেন, 'ইউরোপীয় Patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ।' য়ুরোপের পদ্ধতির সঙ্গে বঙ্কিম বৈমত্য পোষণ করেন, কিন্তু 'জাতিপ্রতিষ্ঠা' নামক বর্গটিকে কোনো প্রশ্ন করেন না। কাজেই বঙ্কিমের *বঙ্গদর্শন*-এ জাতিপ্রতিষ্ঠার প্রকরণ ও পদ্ধতি বহু আলোচিত। *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল অক্ষয়চন্দ্র সরকারের প্রবন্ধ 'উদ্দীপনা'। অক্ষয়চন্দ্র লিখেছেন, 'আমাদের এই একটি ভাল বস্তু ছিল না। উদ্দীপনা শক্তি ছিল না। ডিমস্থিনিস, কাইকিরো, আমাদের একজনও ছিল না। যে বাক্‌শক্তি ইউরোপ[পে] এলোকোয়েন্‌স্ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত, তাহা আমাদের ছিল না।' (নিম্নরেখা সংযোজিত।) অক্ষয়চন্দ্র এই 'এলোকোয়েন্‌স্'-এর সূত্রে কবিতাকে দুভাগে ভাগ করেছেন। 'কবিতা রসাত্মিকা আত্মগতা কথা। উদ্দীপনা রসাত্মিকা অন্যোদ্দিষ্টা কথা। (নিম্নরেখা সংযোজিত।) এই যে অন্যোদ্দিষ্টা কথা তা 'রোপন করাও এ সময়ে [ পরাধীন ভারতবর্ষে / ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে ] বিশেষ আবশ্যক।' 'অন্যোদ্দিষ্টা কথা' অন্যকে / গণকে শোনানোর উপায় কী? কথা শোনানোর জন্যই তো জাতিপ্রতিষ্ঠাবাদীরা ঔপনিবেশিক গণপরিসরগুলি ব্যবহার করতে চাইছেন।

রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'বক্তৃতা-প্রবন্ধে'র জন্য ঔপনিবেশিক বঙ্গভূমিতে সদ্যনির্মিত গণপরিসরগুলি ব্যবহার করছেন, তবে 'জাতিপ্রতিষ্ঠা' ও জাতিপ্রতিষ্ঠার জন্য 'অন্যোদ্দিষ্টা কথা' এই দুটি বিষয়কে প্রশ্নহীনভাবে তিনি

মেনে নিচ্ছেন না। ১২৮৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে সভাস্থলে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ পড়া। আবার এই ১২৮৮ বঙ্গাব্দেই জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনি কবিতায় বক্তৃতাবাজির বিরোধিতা করছেন। *মানসী* কাব্যগ্রন্থের তিনটি কবিতা পাশাপাশি রাখা যেতে পারে—'দুরন্ত আশা', 'দেশের উন্নতি', 'বঙ্গবীর', এই তিনটি কবিতাতেই বাঙালির বাক্‌সংস্কৃতির সমালোচনা চোখে পড়ে। 'অন্নপায়ী বঙ্গবাসী / স্তন্যপায়ী জীব'— জন দশেকে মিলে তক্তপোষে বসে জটলা করাই তাদের স্বভাব। ঘরের জটলা কখনো-কখনো সভাতল পর্যন্ত সম্প্রসারিত। 'আর কিছু তবে নাহি প্রয়োজন, / সভাতলে মিলে বারো-তেরো জন / শুধু তরজন আর গরজন / এই কারো অভ্যাস।' এই যে সভা-কাঁপানো বাক্‌বাহুল্য সেই বাক্‌বাহুল্যের পক্ষপাতী যাঁরা তাঁদের নিয়ে তির্যক ঠাট্টাও কবিতায় রয়েছে :

'ওজস্বিতা' 'উদ্দীপনা'[৩]<br>
ছুটাও ভাষা অগ্নিকণা<br>
আমরা করি সমালোচনা<br>
জাগায়ে তুলি দেশ!<br>
বীর্যবল বাঙ্গালার<br>
কেমনে বলো টিঁকিবে আর,<br>
প্রেমের গানে করেছে তার<br>
দুর্দশার শেষ।<br>
যাক-না দেখা দিন-কতক<br>
যেখানে যত রয়েছে লোক<br>
সকলে মিলে লিখুক শ্লোক<br>
'জাতীয়' উপদেশ।

ওজস্বিতা / উদ্দীপনাবাহী জাতীয় উপদেশের বাহুল্য নিয়ে বিরক্ত রবীন্দ্রনাথ। গণপরিসরে প্রদত্ত বাচনে / লিখনে এই বাহুল্যের বিরোধিতাও তিনি করছেন। 'আমাদের দেশের বাগীশবর্গ বলেন, Agitate করো, অর্থাৎ বাক্‌যন্ত্রটাকে এক মুহূর্ত বিশ্রাম দিয়ো না।' ('হাতে কলমে'।) 'চারিদিকে একটা আওয়াজ ভোঁ ভোঁ করিতেছে মাত্র, কিন্তু তাহা মানুষের কণ্ঠস্বর নহে, হৃদয়ের কথা নহে, ভাবের ভাষা নহে। ('অকাল কুষ্মাণ্ড'।) 'এখন কি 'সভা' নামক একটা প্রকাণ্ডকায় যন্ত্রের মধ্যে আমাদের সমস্ত কাজকর্ম ফেলিয়া দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইব?' ('হাতে কলমে'।) 'আজকালকার অধিকাংশ আন্দোলন গূঢ় মনঃক্ষোভ হইতে উৎপন্ন। ... হয়তো যেখানে পাঁচটা নরম কথা বলিলে উপকার হয় সেখানে আমরা তীব্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াইতে থাকি ...।' ('ইংরাজ ও ভারতবাসী'।) সভা ও সভা-কাঁপানো বাগীশবর্গ যে আওয়াজ তুলছেন সেই আওয়াজের অন্তঃসারশূন্যতার, যান্ত্রিকতা ও অভ্যাসসর্বস্বতা নিয়ে প্রকাশ্য জনসভায় মন্তব্য করা কিন্তু নিতান্ত সহজসাধ্য কাজ নয়। মিশেল ফুকো তাঁর 'Fearless Speech' নামক বক্তৃতা-প্রবন্ধে সত্যবাচনের শর্ত ও প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। গ্রিসদেশের নগর-সমাজের প্রেক্ষিতে সত্য বাচনের / কথনের 'সমস্যা'ই তাঁর প্রতিপাদ্য। বিশেষ দেশ-কালের প্রেক্ষিতে এই সত্যবাচন (ফুকো[৪] যাকে বলেছেন Parrhesia) প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তা জানতেন। অসহযোগ আন্দোলনের বৈমত্য পোষণ করতেন তিনি। অসহযোগের জনপ্রিয়তার কথা জেনেও সেই বৈমত্য যুক্তির ভাষায় প্রকাশ করতে দ্বিধা করেন নি। 'সত্যের আহ্বান' ও 'শিক্ষার মিলন' রবীন্দ্রনাথের পক্ষে প্রাণঘাতী হতে পারত। *ঘরে বাইরে* উপন্যাসের নিখিলেশ যেভাবে 'জনপ্রিয়' সন্দীপের বিরোধিতা করে, সেভাবে বিরোধিতা করলে যে গুলি চলতে পারত রবীন্দ্রনাথের তা অজানা নয়। তবু ঔপনিবেশিক পরিমণ্ডলে নেশনবাদী বক্তৃতাসভার ওজস্বিতা / উদ্দীপনা-র লোক-দেখানোপনাকে তাঁর 'fearless speech' দিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রতিরোধ করতে চান। নিত্যপ্রিয়ের সংকলনের অনেককটি বক্তৃতা-প্রবন্ধেই ঔপনিবেশিক 'অন্যোদ্দিষ্টা কথা'র বিরোধিতা রয়েছে। কাজেই তা শুধু মুখের কথা লেখার ভাষা রূপান্তর-নির্দেশক শিরোনামে / প্রকল্পে ধরা যাবে না, ধরলে অতিব্যাপ্তি দোষদুষ্ট হবে। মুখের কথা লেখার ভাষার অধিকরণে ধরা পড়লে 'মুখের

কথা'র উদ্বৃত্তটুকু হারিয়ে যায়, শুধু এটুকু জানানোই কিন্তু যথেষ্ট নয়— ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে / বঙ্গভূমে 'বাক্'-নামক কাণ্ডজ্ঞানকে বর্গগতভাবে সমস্যায়িত করা জরুরি। আর সেটা করলে দুটি ভিন্ন বিষয়ের উত্থাপন জরুরি হয়ে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ সভা, বাগীশতা এ সবের পিছনে যে agitation, political agitation, constitutional agitation, gentleman, public, practical-জাতীয় বিজাতীয় ভাব ও শব্দ আছে, সেগুলিকে তাঁর স্বদেশের প্রেক্ষাপটে অব্যবহার্য এবং ব্যবহৃত হলেও প্রাণহীন নকলনবিশিমাত্র বলে সমস্যায়িত করছেন। এখান থেকে একটা প্রশ্ন উঠে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ যে স্বদেশ বা যে সমাজভুক্ত সেই স্বদেশে / সমাজে বাক্‌প্রতিরোধ কীভাবে / কোন্ অর্থে সিদ্ধ। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বিস্তৃত অর্থে দুটি 'রাজনৈতিক' নাটকের কথা মনে পড়বে— একটি *মুক্তধারা*, অন্যটি *রক্তকরবী*। *মুক্তধারা*-র ধনঞ্জয় 'পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায়', সে বলে, 'জগৎটা বাণীময় রে, তার যেদিকটাতে শোনা বন্ধ করবি সেইদিক থেকেই মৃত্যুবাণ আসবে।' ঔপনিবেশিক গণপরিসরে উচ্চারিত / প্রযুক্ত / ব্যবহৃত বাক্‌সংস্কৃতির থেকে ধনঞ্জয়ের এই বাণীময় জগৎ গোত্রে আলাদা, নেশনের ভূত বা দৈশিকতার অধিকারবোধ তার ওপর ভর করে নি। *রক্তকরবী* নাটকে 'মৃত্যুর মধ্যে' রঞ্জনের 'অপরাজিত কণ্ঠস্বর' বেঁচে থাকে— এই কণ্ঠস্বর সভার কণ্ঠস্বর নয়।

নেশন আর নেশনবাদী সভার বাইরে যে সমাজ, সেই সমাজের কণ্ঠস্বর / ইতিহাস রবীন্দ্রনাথ অনুসরণ / অনুধাবন করতে চান। এই অনুধাবন / অনুসরণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়, 'ইতিহাস সকল দেশে সমান হইবেই, এ কুসংস্কার বর্জন না করিলে নয়।'[৩] আর এই কুসংস্কার বর্জন করতে পারেন বলেই তো রবীন্দ্রনাথ লেখেন, ঐক্য বিস্তারের চেষ্টা ভারতবর্ষকে 'চিরদিন রাষ্ট্রগৌরবের প্রতি উদাসীন করিয়াছে।' ('ভারতবর্ষের ইতিহাস'।) নিত্যপ্রিয়ের সম্পাদিত গ্রন্থের এই যে শেষ বক্তৃতা-প্রবন্ধ, 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', সেই প্রবন্ধে এই রাষ্ট্রগৌরব-বিরোধিতাই রবীন্দ্রনাথের 'মুখের কথা'র অন্যতম প্রতিপাদ্য। এই রাষ্ট্রগৌরববাদ যে ইতিহাসবোধ, ব্যাকরণচিন্তা, লোকসংস্কৃতিবাদের আধিপত্যকামী পরম্পরার জন্ম দেয় রবীন্দ্রনাথ তারও বিরোধী। কাজেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রবীন্দ্রনাথকে মনে করিয়ে দিতে হয় 'বস্তুত প্রত্যেক ভাষার নিজের একটা ছাঁচ আছে। ... বাংলা ভাষা বাংলা ব্যাকরণের নিয়মে চলে এবং সে ব্যাকরণ সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত ব্যাকরণের দ্বারা শাসিত নহে।' ('বাংলা ব্যাকরণ'।) রবীন্দ্রনাথকে এ-ও জানাতে হয়, 'বাংলা ভাষায় ছেলে ভুলাইবার জন্য যে-সব মেয়েলি ছড়া প্রচলিত আছে' তিনি তা সংগ্রহে প্রবৃত্ত। এর পিছনে ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস-নির্ণয়ের প্রেরণার চাইতেও স্বাভাবিক কাব্যরসের আকর্ষণ তাঁর মনে প্রবলতর। সংস্কৃত ব্যাকরণের শাসনে ইংরেজ-উপনিবেশের প্রভুরা, কেরি থেকে ম্যাক্সমুলরের মতো প্রাচ্যবিদ্‌রা বাংলা ভাষাকে নির্ধারিত করতে চাইছিলেন। এই নির্ধারণের পিছনে যে যুক্তিবোধ কাজ করছিল তা আদিরূপসন্ধানী, ক্রমবিবর্তনবাদী, পুনর্গঠনমূলক।[৪] বস্তুতপক্ষে ঔপনিবেশিক-পর্বে ভাষা ও রাষ্ট্র এই দুই বর্গকেই এই উল্লম্ব পুনর্গঠনবাদী বিন্যাসে 'নির্মাণ' করা হচ্ছিল। এই 'বহুকালিক' মাত্রাটি আনুভূমিক জায়মান বহুত্বকে অস্বীকার করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর *ছেলেভুলানো ছড়া*-র কাব্যরসে প্রত্যেক ভাষার আলাদা আলাদা ব্যাকরণের স্বীকৃতিতে এই ক্রমজায়মান নবায়িত বহুত্বকেই ঠাঁই দিচ্ছিলেন।

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামোকে নানা দিক থেকে সমালোচনা করছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ প্রাক্-ঔপনিবেশিক কোনো অতীতকে আদর্শ বলে দাগিয়ে[৫] দিচ্ছেন তা কিন্তু নয়। বরং ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের উৎপাত যখন ছিল না, তখন যে সমাজ ছিল সেই সমাজের 'কারাগার'টির কথাও তিনি জানাতে ভোলেন নি। ('বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'।) তবে তার মানে এই নয়, কোনো নৈরাশ্য / নৈরাজ্যকে তিনি বড়ো করে তুললেন। মজুমদার লাইব্রেরির আলোচনা-সমিতিতে প্রদত্ত এই বক্তৃতার শেষে কবির বক্তব্য, 'একটি নূতন আশার যুগ চাই। সেই আশার যুগে মানুষ নিজের সীমা দেখিতে পায় না, সমস্তই সম্ভব বলিয়া বোধ করে।' ('বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'।)

*মুখের কথা লেখার ভাষায়* শিরোনাম-খচিত বইটিকে এইভাবেই হয়ত উপনিবেশের প্রেক্ষাপটে এক রকম ভাবে পড়া যায়। বইয়ের একুশটা বলা বা লেখাকেই এই ধরতাইতে আঁটানো যাবে না, আঁটানো উচিতও নয়। কাজেই *মুখের কথা লেখার ভাষায়* নামক অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থটি বহুদর্শী পাঠক কিনবেন, পড়বেন নিজের

মতো করে বুঝবেন এটাই অভিপ্রেত। তবু যে শ্রীনিত্যপ্রিয় ঘোষের সৌজন্যে রবীন্দ্রনাথের বলা-লেখা নিয়ে ভাবনা-চিন্তার অবকাশ জুটল তার জন্য পাঠকসাধারণ শ্রীঘোষকে অবশ্য ধন্যবাদ দেবেন।

প্রসঙ্গ-নির্দেশ

১. শ্রীনিত্যপ্রিয় ঘোষ তাঁর লেখাটিকে মোটেই কোথাও গৌরচন্দ্রিকা বলেন / লেখেন নি। তাঁর প্রারম্ভিক প্রবন্ধটিকে অবস্থানগত কারণেই আমরা গৌরচন্দ্রিকা বলেছি। বৈষ্ণবশাস্ত্রের 'গৌরচন্দ্রিকা' আর দেরিদার 'The Question of the preface' দুয়ের বর্গগত পার্থক্য নির্দেশই আমাদের উদ্দেশ্য। Signifier/signified-এর মধ্যে যে-খেলা চলে, যে খেলা অর্থের নানান সম্ভাব্যতাকে জায়মানতা দেয়, ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে সেটুকু খেয়াল করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

২. 'খেলা' শব্দটি তো নানা সময়ে নানা অর্থে ব্যবহৃত। রবীন্দ্রনাথের সমকালে শিলারের খেলা-তত্ত্বের সূত্রে প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যে খেলার অবতারণা করেছিলেন। এখানে আমরা দেরিদার 'Structure, Sign and Play in the Discourse of the Human Sciences' লেখাটির কথা স্মরণে রেখেছি। দ্র. Jacques Derrida, *Writing and Difference*, London and New York: Routledge 2001.

৩. ওজস্বিতা আর উদ্দীপনা কিন্তু সমদেশীয় নয়। অক্ষয়চন্দ্রের প্রবন্ধের সাক্ষ্যে বলা চলে উদ্দীপনা আমাদের ছিল না, ইউরোপ থেকে এটি এসেছে। 'ওজস্বিতা' নামক বর্গটির প্রয়োগ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সাংখ্যদর্শনের সূত্রে তিনি ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে রজোগুণের জাগরণ নিয়ে চিন্তিত। রজোগুণের সঙ্গে তিনি ওজস্বিতার যোগসাধন করেছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, *উদ্বোধন* পত্রিকার আষাঢ় ১৪১৩ সংখ্যায় প্রকাশিতব্য আমার ধারাবাহিক প্রবন্ধ 'বিবেকানন্দের সাধু-চলিত'।

৪. মিশেল ফুকোর *Fearless Speech* বইটর প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন শ্রীগৌতম ভদ্র। *দেশ* পত্রিকার গ্রন্থসমালোচনা বিভাগে ফুকোর বইটির একটি মনোজ্ঞ সমালোচনাও শ্রীভদ্র করেন।

৫. ইতিহাস যে সব দেশে সমান হয় না রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধি নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদ্‌দের নানাভাবে আন্দোলিত করেছে। শ্রীদীপেশ চক্রবর্তী ইতিহাসের এই বৈশ্বিক ও স্থানিক মাত্রা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেছেন। শ্রীরণজিৎ গুহের *History at the Limit of World History* বইতে অনেকখানি অংশ রবীন্দ্রনাথ-সম্বন্ধীয়। এই গ্রন্থের 'Epilogue: The Poverty of Historiography— A Poet's Reproach' অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য।

৬. এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। বিষয়টি নিয়ে চমৎকার আলোচনা করেছেন মিশেল ফুকো। ফুকোর *The Order of Things / An Archaeology of the Human Sciences* গ্রন্থের 'Labour, Life, Language' অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য।

৭. 'মুখের কথা' আর 'লেখার ভাষা' এ দুয়ের সম্পর্ক নিয়ে নান্দনিক আলোচনা হয়ত অভিপ্রেত ছিল। সমালোচনা-প্রবন্ধের স্বীকৃত অবয়বে এই বাক্‌বিস্তার বাহুল্য হতে পারে, এটা মনে করেই সে আলোচনা করা হল না। শুধু খেয়াল করিয়ে দেওয়া যেতে পারে, ঔপনিবেশিক বঙ্গভূমে 'যা বলছি' 'যা বলা হয়' তাই 'অবিকল' লেখা যায় কিনা এ নিয়ে প্রায়োগিক ও নান্দনিক তর্ক কিছু কম হয় নি।

৮. একটি প্রশ্ন কেউ উত্থাপন করতেই পারেন। নেশন ও নেশন-নির্ধারিত গণপরিসরের বাইরে যে কণ্ঠস্বরের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ ব্রতী সেই অনুসন্ধানে মেয়েদের ভূমিকা কী? ছেলেভুলানো ছড়া সংগ্রহ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের দ্বারস্থ হচ্ছেন। আর রবীন্দ্রনাথের পুরুষরা 'Manly Englishman'দের থেকে আলাদা। 'Colonial masculinity'র সমস্যা রবীন্দ্ররচনায় কেমনভাবে এল তা পৃথক আলোচনার বিষয়। Colonial Masculinity নিয়ে আলোচনা করেছেন শ্রীআশিস নন্দী, শ্রীমৃণালিনী সিন্‌হা। দ্রষ্টব্য, শ্রীনন্দীর *The Intimate Enemy*. New Delhi: OUP, 1983 আর Mrinalini Sinha, *Colonial Masculinity / The 'Manly Englishman' and the 'Effeminate Bengali' in the Late Nineteenth Century*', Manchester: University Press, 1995। শ্রীসিন্‌হার বইটি সংগ্রহ করে দিয়েছেন শ্রীঅশোক সেন।

নিত্যপ্রিয় ঘোষ-সম্পাদিত *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখের কথা লেখার ভাষায়*। ১ম খণ্ড।
কলকাতা : বুকফ্রন্ট পাবলিকেশন ফোরাম, ২০০৬। ১০০ টাকা।

# দুশ বছরের বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য

১৬০ টাকা

(প্রথম খণ্ড)

সম্পাদনা : অলোক রায় □ পবিত্র সরকার □ অভ্র ঘোষ

রামমোহন রায় □ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত □ প্যারীচাঁদ মিত্র □ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর □ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ □ অক্ষয়কুমার দত্ত □ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর □ রাজেন্দ্রলাল মিত্র □ ভূদেব মুখোপাধ্যায় □ রাজনারায়ণ বসু □ কেশবচন্দ্র সেন □ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় □ কালীপ্রসন্ন সিংহ □ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য □ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর □ কালীপ্রসন্ন ঘোষ □ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর □ গিরিশচন্দ্র ঘোষ □ চন্দ্রনাথ বসু □ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় □ যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ □ অক্ষয়চন্দ্র সরকার □ মীর মশারফ হোসেন □ শিবনাথ শাস্ত্রী □ রমেশচন্দ্র দত্ত □ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় □ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর □ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী □ প্রিয়নাথ সেন □ স্বর্ণকুমারী দেবী □ বিপিনচন্দ্র পাল □ জগদীশচন্দ্র বসু □ যোগেশচন্দ্র রায় □ বিজয়চন্দ্র মজুমদার □ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় □ শরৎকুমারী চৌধুরাণী □ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় □ স্বামী বিবেকানন্দ □ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী □ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় □ সখারাম গণেশ দেউস্কর □ চিত্তরঞ্জন দাশ □ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর □ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর □ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

**সাহিত্য একাদেমি**
আঞ্চলিক দপ্তর
জীবন তারা
২৩এ/৪৪এক্স, ডায়মন্ড হারবার রোড
কলকাতা ৭০০ ০৫৩
দূরভাষ : ২৪৭৮ ১৮০৬

## শান্তি নিকেতন

আমাদের শান্তি নিকেতন।
সে যে সব হতে আপন।

তার আকাশভরা কোলে
মোদের দোলে হৃদয় দোলে,
মোরা বারে বারে দেখি তারে নিত্যই নূতন।
মোদের তরুমূলের মেলা,
মোদের খোলা মাঠের খেলা,
মোদের নীল গগনের সোহাগমাখা সকাল সন্ধেবেলা
মোদের শালের ছায়াবীথি
বাজায় বনের কলগীতি,
সদাই পাতার নাচে মেতে আছে আমলকি কানন।
আমাদের শান্তি নিকেতন।

আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে,
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে।
মোদের প্রাণের সঙ্গে প্রাণে
সে যে মিলিয়েছে এক তানে,
মোদের ভাইয়ের সঙ্গে ভাইকে সে যে করেছে একমন।
আমাদের শান্তিনিকেতন।।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭ই জ্যৈষ্ঠ
১৩২৩